মাসুদ রানা
ড্রাগ লর্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

আপনাদের প্রিয় ওয়েবসাইট Banglapdf.net এখন ডোমেইন নেইম পরিবর্তন করে BanglaPdfBoi.Com এ রুপান্তরিত হয়েছে। আপনারা সবাই নিজ নিজ বুকমার্কস পরিবর্তন করে নিবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

ড্রাগ লর্ড

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

এক

প্যারিসের এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা। ল্যাটিন কোয়ার্টারের বৃক্ষশোভিত প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট বাড়িগুলোর টালির ছাতে একনাগাড়ে আঘাত হেনে চলেছে বৃষ্টির ফোঁটা। ডি লা কনকর্ডের কালো-রূপালী মস্ত খোলা জায়গাটা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে চকচক করছে। ক্রিলন ও জর্জ ফাইভ রেস্তোরাঁ দুটোর ডোরম্যানরা একটু পর পরই গিয়ে অন্ধকার থেকে ট্যাক্সি ডেকে আনছে, তারপর ছাতা নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিচ্ছে ফারের দামি পোশাক পরা অতিথিদের।

শহরের উত্তরতম প্রান্তে, ওঅকওয়ে ধরে হেঁটে চলেছে করিম মোল্লা। মাথার ওপরে ছাউনি থাকায় বৃষ্টি লাগছে না গায়ে। কিশোর বয়েসেই ভয়ে ভয়ে অপরাধ জগতে ঢুকে পড়েছিল ও আর ওর তিন ভাই। সেটা বহু বছর আগের কথা। এখন কাউকে ভয় পায় না করিম।

সোডিয়াম আলোয় আলোকিত রাস্তার দুপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছাউনির নীচ থেকে বৃষ্টিতে বেরিয়ে এল ও। ধূসর-বাদামি মুখের চামড়া, বসা চোয়াল, কালো ঘন ভুরুর মাঝখান থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে অনেক বড়, বাঁকা নাকটা। পরনের নীল ট্রাউজারের ফুলে থাকা পিছনের পকেটে চাপ দিল ও, নিশ্চিত হয়ে নিল পলিথিন ব্যাগে রাখা কড়কড়ে নতুন পঁচিশ হাজার ফ্র্যাঙ্কের নোটগুলো ঠিকঠাক আছে কি না। একসঙ্গে এত টাকা জীবনে এই প্রথম হাতে পেয়েছে।

ছায়া থেকে সরে এসে হাতঘড়ির দিকে তাকাল করিম। এবার নিয়ে পাঁচ-ছয়বার ঘড়ি দেখা হয়ে গেছে। কাকে দেখতে পাবে জানে না, কারণ, কখনোই এক লোককে দুবার দেখে না। যে লোক *মাল* সরবরাহ করে সে ভীষণ সতর্ক থাকে, ধরা পড়ার ভয়ে এক লোককে দুবার পাঠায় না। করিমও খুব সতর্ক। এসব কাজে সামান্যতম অসতর্কতার খেসারতও যে অনেক সময় প্রাণ দিয়ে দিতে হয়, জানা আছে ওর।

গলোয়া সিগারেটের হালকা নীল প্যাকেটের এক পাশ খুলে ওটা ঠোঁটের কাছে ধরল করিম। জিভ আর ঠোঁটের সাহায্যে একটা শলা টেনে বের করে নিল। সস্তা লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরাচ্ছে, অন্ধকার থেকে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ। লাফিয়ে ছায়ায় সরে গেল করিম। অসতর্ক হওয়ার জন্য, ওর ওপর যে নজর

রাখা হচ্ছিল, বুঝতে না পারার জন্য মনে মনে গালি দিল নিজেকে। ট্রাউজারের পাশের পকেটে ঢুকে গেল এক হাত—চেপে ধরল ছোরাটা। অনেক ছোটবেলায় অ্যালজিয়ার্সের নোংরা বস্তিতে যখন থাকত, তখন থেকেই এই অস্ত্রটা ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী।

সোডিয়াম আলোর নীচে এসে দাঁড়াল আর্মি গ্রেটকোট পরা খাটো একটা মূর্তি। মাথায় পুরানো কেপি, ফরাসি সামরিক বাহিনীর লোকেরা সাধারণত এ ধরনের টুপি পরে থাকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ছে কেপির কিনারা থেকে। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে না করিম। মোলায়েম চাপা খসখসে কণ্ঠে ইংরেজিতে বলল, 'ফ্ল্যাণ্ডারের মাঠে পপির ফুল ফুটেছে।'

সাঙ্কেতিক কথার জবাবে করিম বলল, 'সারি সারি ফুলে ছেয়ে গেছে মাঠ।'

সিঁড়ির ধাপে একটা বাদামি ক্যানভাসের ব্যাগ নামিয়ে রেখে পিছিয়ে গেল লোকটা দুই হাত কোটের পকেটে ঢোকানো। এক হাতে যে একটা পিস্তল চেপে ধরেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই করিমের। নীল ট্রাউজারের পকেট থেকে পলিথিনে মোড়ানো টাকাগুলো বের করল ও, ব্যাগটার পাশে নামিয়ে রেখে পিছিয়ে গেল। সবসময় এ ভাবেই কাজ করে—ছোঁয় না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। নিচু হয়ে টাকা তুলে নিল আগন্তুক। গোনার প্রয়োজন বোধ করল না। টাকার প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে মাথা সামান্য কাত করে ঝাঁকি দিয়ে কোটের পকেটে গুঁজে রাখল। তারপর সরে গিয়ে করিমের নড়ার অপেক্ষা করতে লাগল।

এগিয়ে এসে ঝুঁকে ব্যাগ তুলে নিল করিম। ওজনটা ঠিকই আছে, ভিতরে বালি ভর্তি মনে হলো না। ওপরে-নীচে ঝাঁকি দিল, নিঃশব্দে নড়ল ভিতরের জিনিসগুলো, শুকনো পাউডারের মতই। কাজ শেষ। এখন অন্য লোকটার যাওয়ার অপেক্ষায় রইল ও। এটাই নিয়ম। মাল নিয়ে কোন্‌দিকে যায় ও, এমনকী কোন্‌দিকে যেতে চায়, সেটাও বুঝতে দিতে চায় না।

নড়ছে না লোকটা। ওর দিকে তাকাল করিম। হঠাৎ করেই যেন লক্ষ করল ব্যাপারটা—আশপাশের যানবাহনের শব্দ কানে ঢুকল, ওঅকওয়ে থেকে নীচে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল।

কোথাও কী একটা যেন গোলমাল হয়েছে। গিরগিটির মত নিঃশব্দে দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করল করিম, হারিয়ে যেতে চাইছে রাতের অন্ধকার নিরাপত্তায়। দুই লাফে কাছে চলে এল লোকটা। প্রচণ্ড শক্তি লোকটার গায়ে—করিমের ঘাড় চেপে ধরে নাক-মুখ ঠুকে দিল দেয়ালে। ভর্তা হয়ে গেল নাকটা। প্রায় ছুঁড়ে ফেলল কংক্রিটের ফুটপাথে। দক্ষ, অভ্যস্ত, দ্রুতহাতে ওর হাত দুটো পিঠের ওপর নিয়ে এসে হাতকড়া লাগিয়ে দিল লোকটা। নিশ্চয় পুলিশ, ভাবছে করিম, কিন্তু ওরা কীভাবে...

হ্যাঁচকা টানে তুলে ওকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। কানের পিছনে পিস্তলের নল চেপে ধরা হলো। সেফটি ক্যাচ রিলিয করার শব্দ শুনল করিম। একটা সিঁড়ির গোড়ায় করিমকে টেনে নিয়ে গেল লোকটা। দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে পকেট থেকে একটা কাঠের গোঁজ বের করল। ওটার এক মাথা করিমের মুখে বসিয়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে বাড়ি মারল অন্য মাথায়। অনেকগুলো দাঁত ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেল গোঁজটা। এবার পকেট থেকে বড় একটা প্লায়ার্স বের করল লোকটা। করিমের মুখের ওপর ঝুঁকল ও।

এই প্রথম লোকটার মুখের হলদেটে চামড়া পলকের জন্য দেখতে পেল করিম। 'যারা মুখ বন্ধ রাখতে পারে না,' অশুদ্ধ ফরাসিতে বলল লোকটা, 'তাদের এই ব্যবস্থাই করি আমরা।'

মুখের ভিতর ঢুকিয়ে প্লায়ার্স দিয়ে করিমের জিভ চেপে ধরল লোকটা।

ডা ভোজেস-এর কাছে ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্টে মিস্ট্রেসকে নিয়ে ডিনার করছে ফ্রাঁ থিয়াখি। তামার রেইলে লাগানো জালের পর্দায় জানালার নীচের অংশটা ঢাকা, ওপরের অর্ধেকটা দিয়ে স্কয়ারের একটা কোণ চোখে পড়ছে, সারি সারি স্তম্ভের ওপর বসানো ছাউনি থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ছে।

আজ শুক্রবার। ওর নিয়মিত একঘেয়ে কাজের মধ্যে একমাত্র আকর্ষণ। ডুক্সেমের অফিসে কাজ থেকে উঠে, পাতালরেলে করে মেট্রোর সেইন্ট পল-এ এসেছে, এখানে ম্যারাই-এর ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকে ওর মিস্ট্রেস। কসাইপট্টির ধার দিয়ে সরু গলি ধরে হাঁটার সময় সতর্ক থেকেছে ও, সারাক্ষণ লক্ষ রেখেছে কেউ পিছু নিল কি না, তারপর পুরানো বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আদিম বেল-পুল টেনে ঘণ্টা বাজিয়েছে।

সিক্রেট এজেন্টের জন্য ব্যভিচার কত সহজ, ভেবে মনে মনে এক ধরনের শান্তি পেয়েছে ও, বার বার রাস্তার দুই পাশ দেখেছে চঞ্চল দৃষ্টিতে। বাড়ির ভিতর থেকে পায়ের আওয়াজ শোনা গেছে, দরজা খুলে দিয়েছে বাড়ির মালিক মাদাম ক্রিন্ত। মস্ত ভুঁড়িওয়ালি প্রৌঢ়া মহিলা, পুরু লেন্সের ওপাশ থেকে ওর সদাসন্দিহান চোখ দুটো যেন সার্বক্ষণিক ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সবার দিকে, থিয়াখির বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে, চিনতে পেরে নেহায়েতই অনিচ্ছার সঙ্গে যেন পথ ছেড়ে দিয়েছে। মাদামকে আবারও এক বাক্স ভায়োলেট ফুলের গন্ধওয়ালা চকলেট উপহার দেয়ার সময় হয়েছে, ভেবেছে ও। চত্বর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সোজা কোরির দরজার কাছে চলে এসেছে। কোরির বয়েস চল্লিশের কোঠার মাঝামাঝি। বিধবা হয়েছে বহুদিন আগে। এই বয়েসেও ফিগারটা ঠিক রেখেছে ও। চর্বিহীন পেট, সোনালি চুল, আকর্ষণীয় চেহারা।

ওর ভেজা কোটটা নিয়ে ঝাড়া দিয়ে পানি ফেলেছে কোরি। দুটো গ্লাস, এক বোতল রিকার্ড, এক জগ পানি টেবিলে রেখে দিয়েছিল আগেই। থিয়াখি ঢুকতে একটা প্যাকেট থেকে টোস্ট বিস্কিট বের করে মাখন মাখিয়ে প্লেটে রেখেছে। পানি মেশানো রিকার্ড দিয়ে একটা টোস্ট খেয়ে নিয়ে প্রথমে বেডরুমে ঢুকেছে ওরা। তারপর বাথরুমে ঢুকে একসঙ্গে গোসল সেরে রেস্টুরেন্টে এসে ডিনারে বসেছে।

কথা বলতে বলতে খাচ্ছে দুজনে, এই সময় পকেটে রাখা থিয়াখির মোবাইলটা বেজে উঠল। বিরক্ত ভঙ্গিতে যন্ত্রটা বের করে, কে ফোন করল নাম দেখে নিয়ে কানে ঠেকাল। ওর ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেকশন হেড। নীরস কণ্ঠে থিয়াখি বলল, 'বলুন।'

'একটা খুন হয়েছে, ফ্রাঁ,' ডেপুটি বলল।

'তো আমি কী করব? পুলিশকে জানান।'

'পুলিশই ফোন করে জানিয়েছে আমাকে। ওরা খুব উদ্বিগ্ন। আগের একটা খুনের সঙ্গে এর মিল আছে।'

'তা-ই।'

'তোমাকে একবার দেখতে যেতে হবে।'

'এখন?'

'হ্যাঁ। গাড়ি পাঠাচ্ছি। কোথায় আছো?'

'সেইন্ট পল মেট্রোতে আসতে বলুন ড্রাইভারকে।'

ভাগ্যিস, ঘরে ঢুকে আগেই কাজটা সেরে নিয়েছিল—ভেজা, স্যাঁতসেঁতে কোট গায়ে দিতে দিতে ভাবছে থিয়াখি। হাত বাড়িয়ে হুক থেকে হ্যাটটা তুলে নিল। ফোনকলটা আর একঘণ্টা আগে এলে দিনটাই বরবাদ হয়ে যেত।

রিয়ো ডা রিভোলিতে স্টেশনের প্রবেশ মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কালো রঙের একটা সিত্রোঁ গাড়ি। ইঞ্জিন চলছে। বছরের এ সময়টায় সাধারণত সুইচ অফ করে না এখানকার ড্রাইভাররা, বন্ধ করে দিলে ইঞ্জিন এত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, হাইড্রোনিউম্যাটিক সাসপেনশন পাম্প করে আবার গরম করতে হয়, আর তাতে অনেক সময় লাগে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল থিয়াখি। স্প্রিং লাগানো সিটে বসতেই অনেকখানি দেবে গেল পুরু গদি। গিয়ার দিয়ে এত দ্রুত হুইল ঘোরাল ড্রাইভার, ইঞ্জিনের সঙ্গে সমতা রাখতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল চাকার রাবার।

একটা আমেরিকান সিগারেট ধরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল থিয়াখি। তীব্র গতিতে সরে যাচ্ছে মস্ত বুলেভার্ডের পাশের দোকানগুলো, দ্য গ্যালারিস

লাফায়েত, দ্য মনোপ্রি, ইত্যাদি। গ্যারি দু নর্ড পেরিয়ে এসে পাশের সরু গলিতে নামল ড্রাইভার। এখানে রয়েছে কতগুলো ইন্দো-চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আর সেকেণ্ড হ্যাণ্ড আসবাবপত্রের দোকান।

পুরানো শহরের অসংখ্য খালের ওপরের ব্রিজ ও জালের মত বিছিয়ে থাকা ট্র্যাফিক সিসটেমের মধ্য দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল, পেরিয়ে এল পোর্টে দ্য ক্লিজন্যানকোর্ট ও সেইন্ট ডেনিস; এমন একটা রাস্তায় পড়ল যেটাকে দেখে মনে হয় দুপাশের টাওয়ারের মত উঁচু বাড়িগুলোর মাঝখানে নাক ঢুকিয়ে দিয়েছে। শেষ মাথায় অন্ধকার, প্যারিস শহরের পরিচিত বাতি নেই এখানে, কালো একটা মস্ত বদ্ধ ঘরের মত লাগছে জায়গাটাকে।

সাঁই সাঁই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে এন-১ থেকে নেমে এসে একটা সরু রাস্তায় নামল ড্রাইভার, দুই-তিন মিনিট জটিল রাস্তায় যেন হাবুডুবু খাওয়ার পর আর্ক এন সিয়েল-এর পাশে গাড়ি থামাল।

সিত্রোঁর হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল, অতিরিক্ত পুরানো, রংহীন একটা বড় বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় পাহারা দিচ্ছে ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশম্যান।

আশপাশে তাকিয়ে অন্য কোন মানুষ চোখে পড়ল না থিয়াখির, ওই একজন পুলিশ ছাড়া যেন পুরো এলাকায় আর কেউ নেই, ছিল না কোনও দিন।

গাড়ি থেকে নেমে, রাস্তা পেরিয়ে পুলিশম্যানের সামনে দাঁড়াল ও। কার্ড বের করে দেখাল। 'লাশটা কোথায়?'

'মর্গে নিয়ে গেছে, মঁসিয়ে।'

'পরিচয় জানা গেছে?'

নোটবুক বের করল পুলিশম্যান।

'করিম মোল্লা। বয়েস সাঁইত্রিশ। আর কিছু জানি না।'

'পুলিশের খাতায় রেকর্ড আছে?'

'না, মঁসিয়ে। তবে তাতে কিছু বোঝা যায় না। এই এলাকায় প্রচুর অপরাধী আছে, যাদের কোনোই রেকর্ড নেই। এদিকে খুব একটা আসিও না আমরা।'

'তারমানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে ওরা।'

'অনেকটা সেরকমই।'

'কীভাবে মারা গেল?'

'খুব কাছ থেকে গুলি খেয়েছে। এই সিঁড়ির নীচে পড়ে ছিল।'

'জায়গাটা দেখব।'

'নিশ্চয়, মঁসিয়ে।' একটামাত্র দড়ি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে সিঁড়ির মুখ, সেটা উঁচু করে ধরল পুলিশম্যান।

অস্পষ্ট রক্তের দাগ ছাড়া নীচে দেখার তেমন কিছু নেই। সিঁড়ি বেয়ে দু'পা

উঠতেই নাকে এসে ধাক্কা মারল তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ। নাক কুঁচকে দম নিতে নিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে লম্বা বারান্দা ধরে এগোল। দুই পাশে সারি সারি দরজা, এত বেশি ময়লা লেগে আছে, কতকাল পরিষ্কার করা হয়নি বোঝার উপায় নেই। হেঁটে চলল ও। মাঝেসাঝে একআধটা দরজার ওপাশে শোনা যাচ্ছে রেডিও কিংবা টেলিভিশনের শব্দ, আবার কোনও কোনওটার ভিতর থেকে ভেসে আসছে কথার শব্দ। দুর্গন্ধ চিরস্থায়ী হয়ে ভেসে রয়েছে বাতাসে।

এ কোন্ নরকে এলাম, ভাবছে থিয়াখি। এখানে যারা বাস করে, তাদের সবাই দরিদ্র ফরাসি কিংবা অ্যালজিরিয়ান। জন্তু-জানোয়ারের মত থাকে। এই পৃথিবীর ওপর যেন কোন অধিকার নেই ওদের। এরকম একটা জায়গায় খুনখারাপিটা খুব সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু ডুক্সেম বিউরোর আকৃষ্ট হওয়ার কারণটা বুঝতে পারছে না ও। লাশটা দেখার পর হয়তো নিশ্চিত হতে পারবে।

ঢোকার আগেই অন্ধকারে যতটা দেখা সম্ভব, বাড়িটা দেখে নিয়েছে ও। খুনী কোন পথে কোনদিক থেকে এসেছে বোঝার চেষ্টা করেছে।

ভিতরটাও দেখে নিয়ে । সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে সিগারেট ধরাল, দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলল । পুলিশম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার রাস্তা পেরিয়ে গাড়িতে উঠল। সিত্রোঁর ইঞ্জিন আগের মতই চলছে। ড্রাইভারকে বলল থিয়াখি, 'মর্গে যাও।'

বড় গাড়িটা ঘোরার সময় মুহূর্তের জন্য হেডলাইটের আলো পড়ল গ্রাউণ্ড-ফ্লোরের দরজার কাছে দাঁড়ানো একটা মূর্তির ওপর। লোকটার মাথায় সামরিক বাহিনীর কেপি। সিত্রোঁটা রাস্তায় এগিয়ে অন্য গাড়ির সারিতে ঢুকে যেতেই নড়ে উঠল ও। যা দেখার দেখে নিয়েছে, আর কিছু নেই এখানে।

মর্গে এসে অপেক্ষা করতে হলো থিয়াখিকে। লাশ দেখানোর অনুমতি নিতে গেল অ্যাটেনডেন্ট। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলল থিয়াখি।

মুখটাকে নির্বিকার করে রেখেছে ড্রাইভার। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে, 'ঠিক আছে, মঁসিয়ে,' বলে গাড়ির কাছে ফিরে গেল।

সঙ্গে করে একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে নিয়ে এল অ্যাটেনডেন্ট। তিনি প্যাথোলজিস্ট, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, নিখুঁত করে ছাঁটা কালো গোঁফ। থিয়াখির সঙ্গে হাত মেলালেন। নিজের নাম জানালেন, দাঁন্তে।

অ্যাটেনডেন্টের তালিকা দেখে ফ্রিজ ড্রয়ারের নম্বর মিলিয়ে নিলেন। তারপর ধাতব একটা মোটা হ্যাণ্ডেল দুই হাতে চেপে ধরে টেনে বের করলেন ভারি লম্বা ড্রয়ারটা।

এসব মুহূর্তে উত্তেজিত না হয়ে পারে না থিয়াখি। লাশের দিকে তাকাল।

ইতিমধ্যেই ধূসর হয়ে গেছে চামড়ার রঙ। বরফের মত ঠাণ্ডা শরীর। ভালমত পরিষ্কার করা হলেও বীভৎস দেখাচ্ছে মুখটা।

আরও হাজার হাজার অ্যালজিরিয়ান তরুণের মতই শেষ পরিণতি হয়েছে করিম মোল্লারও। তবে এতটা খারাপ অবস্থা অনেকেরই হয় না।

'মৃত্যুর কারণ?' জিজ্ঞেস করল থিয়াখি।

'বুলেট। মুখের ভিতর পিস্তলের নল ঢুকিয়ে মগজে গুলি করা হয়েছে।'

'কিন্তু নাকের এই অবস্থা কেন?'

'প্রথমে নিশ্চয় পিটানো হয়েছে,' দাঁন্তে জবাব দিলেন। 'শুধু নাকই ভর্তা করেনি। ওর ডান হাতের দিকে তাকান।'

করিমের মুঠোবদ্ধ ডান হাতটা ধরে উঁচু করল থিয়াখি। আঙুলের ফাঁকে এক টুকরো রক্তাক্ত মাংসখণ্ড বেরিয়ে থাকতে দেখল। 'কী ওটা?'

'ওর জিভ,' দাঁন্তে বললেন।

হাতটা নামিয়ে রাখল থিয়াখি। 'মারার পর ওরকম ক্ষতবিক্ষত করল কেন? কোনও ধরনের সঙ্কেত কিংবা মেসেজ দিতে চেয়েছে?'

'মারার পর নয়, আগেই এসব করেছে, জ্যান্ত রেখে। প্লায়ার্স দিয়ে টেনে ছিঁড়েছে জিভটা।'

'গড!'

'এরকম কাণ্ড জীবনেও দেখিনি।'

'দেখেননি?' থিয়াখি বলল, 'আমি দেখেছি। সেজন্যেই আমাকে দেখতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোথায় দেখেছি... কোথায়? যাই হোক, থ্যাংক ইউ, ডক্টর। নিন, ঢুকিয়ে ফেলুন। আমি যাই। আমার আরও কাজ আছে।'

গটগট করে করিডোর দিয়ে হেঁটে এল ও। বিল্ডিঙের লবি পেরিয়ে বেরিয়ে এল বাইরের বৃষ্টিতে। গাড়িতে উঠে বলল, 'জঘন্য ওই হট্টগোল বন্ধ করো। অফিসে নিয়ে চলো আমাকে।'

চুপচাপ হাত বাড়িয়ে রেডিওর সুইচ অফ করে দিল ড্রাইভার। থেমে গেল বাজনা। গিয়ার দিয়ে এত জোরে হুইল ঘোরাল, আরও একবার আর্তনাদ করে উঠল চাকার রাবার। ঘড়ি দেখল থিয়াখি। রাত দুটো বেজে তিন মিনিট।

দুই

রোববারের এক রোদ ঝলমলে সকালে, পোপের ভাষণ শোনার জন্য হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এসে জড় হয়েছে সেইন্ট পিটার্স স্কয়্যারে।

দুর্গের ওপরতলার একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন পোপ। অলস ভঙ্গিতে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান শ্রোতাদের মাঝখানে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল মাসুদ রানা, তারপর বেরিয়ে এল ওখান থেকে। ক্যাসল স্যান্ট অ্যাঞ্জেলোর পাশ দিয়ে এসে টিবার পেরিয়ে ভিয়া জেনারডেলিতে পড়ল। এখানে একটা বারে কফি খেয়ে আবার নেমে এল রাস্তায়।

অনেক দিন পর দীর্ঘ একটা ছুটি পেয়েছে ও। দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াবে বলে ঠিক করেছে রানা। শুরুটা করেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপদেশ বার্বেডস থেকে। একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছিল কয়েকটা দিন দারুণ কেটেছে ওখানে। দিনের বেশির ভাগ সময় সাগরে সাঁতার কেটে আর স্নরকেলিং করে কাটিয়েছে, সন্ধ্যায় কটেজের চওড়া বারান্দায় বসে ডিনার খেয়েছে। চমৎকার রান্না করে বাড়ির মালিক মোটাসোটা প্রৌঢ়া মহিলা, বিশেষ করে সাগর থেকে তাজা ধরে আনা মাছের গ্রিল। সেই সঙ্গে সরু চালের ভাত। তারপর বাড়িতে তৈরি আইসক্রিম। সবশেষে প্রচুর আম আর পেঁপে, যত খুশি। ডাক্তার বলে দিয়েছেন উচ্ছৃঙ্খলতা একেবারেই চলবে না। মদ স্পর্শ করতে, রাত জাগতে নিষেধ করেছেন। তাই ডিনার শেষে খানিকক্ষণ টেনিস খেলে রাত দশটা নাগাদ ঘুমের বড়ি খেয়ে একটা পেপারব্যাক বই নিয়ে বিছানায় গেছে ও।

কিছুদিন পর দ্বীপের জীবনে একঘেয়েমি আসায় প্লেনে চেপে বসেছে। মে'র এক উষ্ণ বিকেলে প্লেন থেকে নেমেছে ফ্রান্সের দক্ষিণে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বন্দরনগরী মার্সেই-এ। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলেছে উপকূলের ভাল কোনও হোটেলে নিয়ে যেতে যেখান থেকে ঘরে বসেই জেটিতে নোঙর করা জাহাজগুলো দেখা যায়।

কেউ যদি একা হয়, আর হাতে কোন কাজ না থাকে, প্রচুর দেখার সুযোগ থাকে। রানার বেলায়ও সেটাই হলো। সেদিন রাতে রাস্তার পাশে ডিনার খেতে বসে দুজন লোকের ওপর চোখ পড়ল ওর। কালো রঙের একটা হুডখোলা মার্সিডিজ ৩০০ডি ক্যাব্রিওলেতে করে এসেছে। এখানকার বাণিজ্যিক এলাকায় যেখানে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রচুর লোক সমাগম হচ্ছে, সেখানেও কেমন যেন বেমানান এই দুজন মানুষ।

ডকের কিনার ঘেঁষে থামল গাড়িটা। দুজনের মধ্যে খাটো লোকটা গাড়ি থেকে নামল। খাটো-হাতা বুশ শার্ট গায়ে, মাথায় ফরাসি সোলজারদের মত কেপি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে সামনে নোঙর করা জাহাজগুলোকে দেখল, তারপর পা বাড়াল একটা জাহাজের দিকে। গ্যাংওয়ে দিয়ে জাহাজে উঠে ভিতরে চলে গেল।

লোকটার গাড়িতে বসা সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ওরই বয়েসী।

.চোয়ালের ঠেলে বেরোনো উঁচু হাড় আর সরু চোখ দেখে অনুমান স্লাভিক হতে পারে, কিংবা পূর্ব ইয়োরোপের লোক। প্রচুর তেল দেয়া খ পিছন দিকে টেনে আঁচড়ানো। পরনে বাদামি ট্রপিকাল সুট, এয়্যার কিংবা হুইলারের মত নামকরা দর্জির দোকান থেকে বানানো, হালকা নীল শার্ট; গলায় টকটকে লাল টাই, নিশ্চয় কেনা হয়েছে জার্মিন স্ট্রিটের সবচেয়ে অভিজাত দোকান থেকে। গাড়িটার বডি এতটাই চকচকে যেন তেল চুইয়ে পড়ছে, কুচকুচে কালোর মধ্যে যথেষ্ট যত্ন দিয়ে বার্গাণ্ডি লেদারে তৈরি লাল রঙ করা চামড়ায় মোড়া সিটগুলো যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে রানার লোকটার হাতে পরা কনুই পর্যন্ত ড্রাইভিং গ্লাভ—শুধু একটা হাতেই পরেছে।

এমনকী পকেট থেকে সোনার কেস বের করে, সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে যখন দেশলাই জ্বেলে ধরাল ওটা, তখনও হাত থেকে দস্তানাটা খুলল না ও। নিজের কল্পনা, না দস্তানা পরা হাতটা সত্যিই অন্য হাতটার তুলনায় বড়, ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

আরেকটা ব্যাপার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না, লোকটার গা থেকে যেন আভা ফুটে বেরোচ্ছে। হয়তো টাকার ভাপ। তবে তাতে আভিজাত্য যতটা না আছে, তারচেয়ে বেশি রয়েছে ঔদ্ধত্য ও আকাশছোঁয়া অহঙ্কার। সামনে যা পড়বে অবলীলায় দলে যেতে দ্বিধা করবে না ও। আশেপাশের সমস্ত মানুষের দিকে কেমন এক ধরনের তাচ্ছিল্য আর বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে আসছে ওর সঙ্গী। আজব কেপির আড়ালে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে মুখটা। চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা রয়েছে ওর নড়াচড়া, হাঁটায়। ড্রাইভিং সিটে বসে, হাতের ছোট ক্যানভাসের ব্যাগটা আলগোছে ছুঁড়ে ফেলল পিছনের সিটে। পাশে বসা লোকটার প্রতি সামরিক ভঙ্গিতে আনুগত্য দেখাচ্ছে।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ও। অ্যাক্সিলারেটরে জোরে চাপ দিয়ে স্টিয়ারিং কেটে সাঁই করে ঘুরিয়ে ফেলল মস্ত গাড়িটাকে। ডকে বসা সীগাল তাড়া করতে পাশের কাফে থেকে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে বেরোল ছোট একটা কুকুর, গাড়ির সামনের একটা চাকায় বাড়ি খেয়ে নীচে পড়ে গেল। সামান্যতম গতি কমাল না লোকটা। কর্ণপাতও করল না মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকা চাকায় পিষ্ট ছোট্ট প্রাণীটার করুণ আর্তনাদে।

ফ্রান্সের কয়েকটি শহরে কদিন করে কাটিয়ে ইটালির রোমে চলে এসেছে রানা। কাজকর্ম ছাড়া এভাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে আর ভাল লাগছে না ওর। কিন্তু জোর করেই ওকে ছুটি কাটাতে বাধ্য করেছেন ওর বস্, যেন ডাক্তারের সঙ্গে

যোগসাজশ করেই। ডাক্তার বলেছেন এই ছুটিটা ওর স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি, তা না হলে ওর দেহ-মনে নাকি মস্ত বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। ব্যস, বুড়োমিয়া সিরিয়াস!

ঘুরে ফিরে রোমে আসার পর একটা ঘটনা ঘটল; একঘেয়েমি কাটল ওর কিছুটা। রোববার, পোপের ভাষণ শুনে হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সেরে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ভাবল: কোথায়, ক্লান্তির ছিটে ফোঁটাও তো নেই ওর ভিতর, যেমন ছিল তেমনি তরতাজা আছে শরীর—তবু বিশ্রামের জন্য জোর খাটানো কেন? সেদিন বিকেলে উলের জ্যাকেট, কয়লা রঙের ট্রাউজার আর কালো লোফার পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল ও। চলে এল স্প্যানিশ স্টেপস-এর কাছে ভিয়া কোরেজ-এর একটা অভিজাত রোমান রেস্টুরেন্টে। লবি পেরোনোর সময় পাশ কাটাচ্ছিল দামি ডিয়ো সুট পরা এক সুন্দরী তরুণী, ধাক্কা লেগে ওর হাতের ব্যাগটা মাটিতে পড়ে গেল। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওটা তুলে নিতে গেল রানা, চোখে পড়ল নাইলনের মোজা পরা ছিপছিপে পা ও অভিজাত কোর্ট শু।

'উঁহুঁ, আমি একটা...' বলতে গেল তরুণী।

'দোষটা আমারই,' রানা বলল।

'না না, আমার দোষ। দেখে চলা উচিত ছিল...'

'বেশ,' রানা বলল, 'আপনার দোষ মেনে নিতে পারি, যদি আমার সঙ্গে একটা ড্রিংক খান... আমার খরচে।'

ঘড়ি দেখল তরুণী। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল, বাদামি চোখ। 'বেশ। তবে শুধু একটা। ও, আমার নাম জেনিফার কেন্টম্যান, জেনি।'

'আমি রানা। মাসুদ রানা।' তরুণীর বাড়িয়ে দেয়া হাতটা আলতো করে ধরল রানা।

মার্বেলের মেঝেয় পা ফেলে এগিয়ে চলল দুজনে। বারে ঢুকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, কী খাবেন।'

'ড্রাই মার্টিনি। খুব ভাল বানায় এখানে। খেয়ে দেখতে পারেন।'

বিষণ্ণ হাসি হাসল রানা। নিজের জন্য একটা টমেটো জুসের অর্ডার দিল। জানাল, ডাক্তার কিছুদিন সফট ড্রিংকস ছাড়া অন্য কিছু খেতে নিষেধ করেছেন।

গ্লাস দুটো নিয়ে, পিয়ানোর কাছ থেকে দূরে ঘরের কোণে একটা টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। ঈর্ষান্বিত চোখে জেনিকে ককটেইল স্টিক দিয়ে গ্লাসের তরলে জলপাই নাড়তে দেখছে রানা। চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট নিয়ে প্যাকেটটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল জেনি। মাথা নাড়ল রানা।

জেনি সিগারেট ধরাচ্ছে, রানা জিজ্ঞেস করল, 'রোমে কি বেড়াতে এসেছেন, মিস... নাকি মিসেস জেনিফার?'

'শুধু জেনি। হ্যাঁ, স্বামীর সঙ্গে এসেছি। ভিয়া ভেনিটোতে বড় বড় বীমা কোম্পানির অফিসগুলো নিশ্চয় চোখে পড়েছে আপনার, আমার স্বামী ওগুলোরই একটার ডিরেক্টর।' শুনে মনে হচ্ছে ইংরেজিটা মাতৃভাষা নয় জেনির, তবে খুব ভালমত উচ্চারণ খেয়াল না করলে বোঝাই যায় না সেটা। শিক্ষিত, মার্জিত কণ্ঠস্বর।

'আজ সন্ধ্যার জন্যে স্বামী আপনাকে ত্যাগ করেছেন নিশ্চয়?'

'ইয়ে... মনে হচ্ছে। আপনিও কী বেড়াতে, মিস্টার রানা?'

'রানা, শুধু রানা। হ্যাঁ, আমিও বেড়াতে এসেছি। এক্সপোর্ট-ব্যবসা করি। এখন ছুটিতে।'

'ছুটিতে একা?'

'একা মানুষ, একাই তো থাকব।'

একটা ভুরু উঁচু করল জেনি। পা নেড়েচেড়ে একটার ওপর আরেকটা রেখে বসল। রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না, ইচ্ছে করেই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে মেয়েটা। পুরুষকে দেখানোর মতই পা, জেনিকে দোষ দিতে পারল না।

এক ঘণ্টা পর ভিয়া ক্যারোজে ডিনার খেতে বসল ওরা। ইতিমধ্যে পাবলিক বুদ থেকে একটা ফোন করে এসেছে জেনি। রানাকে বলেছে, স্বামীকে ফোন করতে গিয়েছিল। রানা লক্ষ করল, মোবাইল ব্যবহার করেনি মেয়েটা। কোনও অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে মিশনে বেরোলে রানা নিজেও যতটা সম্ভব মোবাইল পরিহার করে, নিরাপত্তার খাতিরে। মোবাইল জিনিসটা ওর পেশার লোকের জন্য যেমন কাজের, তেমনি ঝামেলার, এবং বিপজ্জনক।

তেল চকচকে র‍্যাভিয়োলি খেতে খেতে কথা বলছে জেনি, অনর্গল। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, স্বামীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে উত্তেজনায় ফুটছে। জানাল, ওর বাবা রাশান, মা ইংরেজ। ও পড়ালেখা করেছে প্যারিস আর জেনেভাতে, তারপর কাজ করতে গেছে ওয়াশিংটনে। সেখানেই স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়। বাচ্চাকাচ্চা নেই।

'কাজের তাগিদে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হয় আমার স্বামীকে,' অরভিয়েটোর গ্লাসে চুমুক দিল জেনি। 'প্যারিসে আমাদের বাসা। কিন্তু থাকিটাকি না বিশেষ। আমিও বেশির ভাগ স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। তবে ভাল ভাল শহরগুলোতে...'

বাধা দিয়ে রানা বলল, 'নিশ্চয় রোম, নিউ ইয়র্ক, সিঙ্গাপুর, হং কং...'

'নাহ্, হং কং-এ যাই না, ওই জায়গাটা আমার সহ্য হয় না। ও যখন হং কং-এ যায়, আমি বাড়িতে থাকি। গৃহিণী হয়ে বসে থাকতেই ভাল লাগে আমার।'

'তাই বুঝি,' রানা বলল।

'আপনাকে অন্যমনস্ক লাগছে, রানা।'

'উঁ! ও, সরি। আসলে, একেবারে কাজকর্মহীন হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে বোর হয়ে গেছি।'

'বকবক করে তো শুধু আমার কথাই বলে যাচ্ছি। আপনার কথাও শুনি... কিছু বলুন।'

'আমি একা মানুষ, আমার কথা আর কী শুনবেন? তারচেয়ে আপনার কথাই বলুন, শুনতে ভাল লাগছে।'

উৎসাহিত হয়ে বকবকানি চালিয়ে গেল জেনি।

খাওয়া শেষে বাইরে বেরোল দুজনে। ট্যাক্সিতে করে জেনিকে ওর হোটেলে পৌঁছে দিতে চলল রানা।

হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থামল। হঠাৎ রানার বাহুতে হাত রেখে জেনি বলল, 'আজ রাতে আর ফিরবে না আমার স্বামী, নেপলসে যেতে হবে ওকে।' পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে ও। অস্বস্তি ভরে জিভ বোলাল ঠোঁটে। 'ওই যে ফোন করেছিলাম, তখন বলেছে। আসুন না আমার সুটে, এক গ্লাস কোকই না হয় খেয়ে যান। টমেটোর জুসও আছে।'

বড় বড় বাদামি চোখ দুটোর দিকে তাকাল রানা। অজানা উত্তেজনায় সামান্য ফাঁক হয়ে গেছে জেনির সুন্দর ঠোঁটজোড়া। ঘোরের মধ্যে যেন নিজেকে বলতে শুনল রানা, 'নো, থ্যাংক ইউ।'

'কী?' যেন শুনতে পায়নি জেনি।

'না, বললাম। আজ থাক, জেনি...'

আচমকা ঝুঁকে এসে টুক করে রানার গালে চুমু খেল জেনি। 'ঠিক আছে, রানা। সুন্দর একটা সন্ধ্যা উপহার দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' বলে, দরজা খুলে নেমে গেল।

লম্বা লম্বা পায়ে ওকে হোটেলের সদর দরজার দিকে এগোতে দেখল রানা। তারপর ফিরে তাকিয়ে ড্রাইভারকে ওর নিজের হোটেলের ঠিকানা দিয়ে এগোতে বলল।

হোটেলে ফিরে ডেস্ক থেকে রুমের চাবি নিতে গিয়ে মেসেজটা পেল ও। ডেস্কক্লার্ক একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল। তাতে লেখা: লণ্ডনের এজেন্সিতে ফোন করো। জরুরি।

চাবিটা দোলাতে দোলাতে ফোন বুদে ঢুকল রানা। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। লণ্ডনের কোড টিপে এজেন্সির নম্বর টিপল। লং রেঞ্জ কল, লাইনের ভিতর কয়েক মুহূর্ত সাঁই সাঁই, ফোঁসফাঁস শব্দ হওয়ার পর কিট করে একটা শব্দ হলো। শোনা গেল ভারি কণ্ঠ, 'রানা?'

রাহাত খানের কণ্ঠ চিনতে পেরেই মেরুদণ্ড সিধে হয়ে গেল রানার। 'জী, সার। আপনি লণ্ডনে?'

'হ্যাঁ। আজই দেশে ফিরছি। শোনো, তোমার বিশ্রাম শেষ।'

'জী?'

'লণ্ডনে গিয়ে মারভিন লংফেলোর অফিসে তার সঙ্গে দেখা করো। খুব জরুরি। কাল ভোরের ফ্লাইট ধরবে।'

'কিন্তু সার...'

'আমাদের একটা সেলস ফোর্সে অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে।'

'কোথায়, সার?'

'প্যারিসে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানীর খবর ভাল।'

'আমার স্বাস্থ্যের কী হবে, সার? আরও তো কিছুদিন ছুটি...' অর্থাৎ রানা আরও কিছু তথ্য চায়।

'আগে কাজ, পরে খেলা!' গম্ভীর সুরে বললেন মেজর জেনারেল। 'শুনলাম তো চরকির মত নাকি খামোখা পাক খেয়ে বেড়াচ্ছ দুনিয়াময়। কাজে ফিরে যাও, বুঝলে।'

মুচকি হাসল রানা। মনে মনে বলল, 'হিংসে হচ্ছে তোমার, বুড়ো ভাম।' নিরীহ স্বরে জবাব দিল, 'জী, সার। কালকেই দেখা করব।'

'রাখলাম।'

তিন

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এসে লণ্ডনে নিজের ভিলায় উঠল রানা। বেল বাজাতে দরজা খুলে দিল ওর হাউসকিপার মিসেস ট্যানার। বসার ঘরে ঢুকে, কুমিরের চামড়ায় তৈরি সুটকেসটা ধুপ করে মেঝেতে ফেলে সোফায় বসল রানা।

মিসেস ট্যানার বলল, 'আপনি কাপড়চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নিন, সার। ততক্ষণে লাঞ্চ রেডি করে ফেলব।'

'নাহ্, খিদে নেই, আন্টি। গোসল করেই বেরিয়ে পড়ব। জরুরি কাজে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, গোসল সেরে আসুন। আমি কফি বানাচ্ছি।' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'আর কিছু না খান, এক গ্লাস কমলার রস তো খেতে পারেন।'

'তা দিতে পারেন। দশ মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে আমার।'

গোসল সেরে এসে পরিষ্কার শার্ট গায়ে দিল রানা। নেভি ব্লু রঙের সুট আর হাতে বোনা কালো টাই। অদ্ভুত এক ধরনের স্বস্তি বোধ করছে, মনে হচ্ছে, সেনাবাহিনীতে থাকার সময়কার ইউনিফর্ম পরেছে আবার। সকাল ছ'টায় রোম থেকে রওনা দেয়ার আগে শেভ করেছে, তাই এখন আরেকবার শেভ করার প্রয়োজন বোধ করল না। চুল ছাঁটিয়েছে সাত দিন আগে।

বসার ঘরে ঢুকে দেখল ছোট্ট ট্রে-র উপর এক গ্লাস কমলার রস রাখা, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে গ্লাসের গায়ে। এক চুমুকে ঢক ঢক করে রসটুকু খেয়ে নিল ও। তারপর টেনে নিল টেবিলে রাখা আজকের খবরের কাগজ। তা-ই দেখে মিসেস ট্যানার বলল, 'দারুণ খবর আছে, সার। পঁচানব্বই বছরের বুড়োটা ঠিকই পালতোলা নৌকায় করে সারা দুনিয়া ঘুরে ফিরে এসেছে।'

'রবার্টসন?'

'আপনি জানেন নাকি?'

'না, আপনার মুখে শুনেই বুঝলাম। ওর বেরোনোর খবরটা জানতাম, টিভিতে দেখেছি।'

'পারল কী করে, বলুন তো? এই বয়েসে এত এনার্জি!'

'কিছু কিছু মানুষ ওরকম এনার্জি নিয়েই জন্মায়। আপনারও তো কাছাকাছি বয়েস। কিন্তু দেখে বোঝা যায়? সারাটা দিন যা খাটনি খাটেন, জোয়ান মেয়েগুলো পারবে?'

খুশি হলো মিসেস ট্যানার। 'জানেন, ওই পপ সিঙ্গার দুটো ড্রাগ নেবার অভিযোগে অ্যারেস্ট হয়েছে।'

'বিটলস?'

'আরে না। বিটলস কী এখন আছে নাকি—ও তো বহু পুরানো—কসমিক সোলজার। ওই যে, দুটো ছোকরা, পিঠ পর্যন্ত মেয়েদের মত চুল রাখে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচায়। বিচ্ছিরি।'

'কী ড্রাগ? মারিজুয়ানা?'

'কী জানি, ওসব জানি না। ড্রাগ, ব্যস, ওটুকুই জেনেছি।'

'হুঁ, ইদানীং ড্রাগের ব্যবহার অতিরিক্ত বেড়ে গেছে।' কাগজে হালকা ভাবে চোখ বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

'যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ?'

'কখন ফিরবেন?'

'জানি না।'

'একটা ফোন করে জানিয়ে দিলে ভাল হতো। খাবার রেডি করে রাখতে পারতাম।'

'আচ্ছা, জানাব।'

গ্যারেজে রানার অপেক্ষায় চুপচাপ বসে রয়েছে ওর বেণ্টলি কণ্টিনেণ্টাল। কেনার পর কারখানায় নিয়ে গিয়ে কিছু বিশেষ পরিবর্তন করিয়েছিল, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা হয়নি ফলাফলটা। এ-ই সুযোগ। গ্যারেজ থেকে ওটা বের করে রাস্তায় নামল।

ক্যারিবিয়ান আর ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে ঘুরে এসে লণ্ডন শহরটাকে মোটেও ভাল লাগল না ওর। ধূসর হয়ে আছে আকাশ, রোদ নেই, মন খারাপ করে দেয়া কালচে একটা ভাব। রাস্তায় অতি ব্যস্ততা। আরেকটা জিনিস লক্ষ করে মেজাজ খারাপ লাগল। কিং'স রোডটা যেন বোঝাই হয়ে আছে মেয়েদের মত করে রাখা লম্বা চুলওয়ালা কমবয়েসী ছেলেদের ভিড়ে। রাস্তা পেরোচ্ছে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে জটলা করছে, কেউ কেউ রাস্তায় পা রেখে ফুটপাতের কিনারে বসে গল্প করছে। হুডখোলা গাড়িতে করে চলার সময় বাতাসে মাদকের গন্ধ পেল রানা। ইদানীং পৃথিবীর অনেক জায়গার মত লণ্ডন শহরেও মাদকের ব্যবহারটা অতিরিক্ত বেড়েছে।

এক্সেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল ও। গতি বেড়ে গেল গাড়ির। টুইন টু-ইঞ্চ এগজস্টের ভারী শব্দ কানে আসছে। হাইড পার্ক ছাড়ানোর সময় স্পিডোমিটারের কাঁটা নব্বই আর একশো কিলোমিটারের ঘরে ওঠানামা করতে থাকল।

রিজেণ্ট পার্কে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের পার্কিং লটে থামল রানার বেণ্টলি। লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বোতাম টিপতে গিয়েও কী ভেবে সরিয়ে নিল হাতটা। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করল। অ্যাসাইনমেণ্টের গন্ধ পাচ্ছে। যতটা সম্ভব শরীরটাকে চালু রাখা দরকার, পেশিগুলোকে আরও সক্রিয় করা দরকার।

ছয় তলায় চিফ মার্ভিন লংফেলোর দপ্তর। ওর আগমনের সংবাদ জেনে গেছে সবাই। অফিসের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় স্যালুট করল চেনা সিকিউরিটি গার্ড। মাথা ঝুঁকিয়ে মৃদু হাসল রানা, আউটার অফিসে পা রাখল। ওকে দেখে ঝলমল করে উঠল অ্যাডমিরাল লংফেলোর সুন্দরী সেক্রেটারি জুলিয়া লোগান। 'আরে, রানা যে! স্বপ্ন দেখছি না তো? কত দিন পর এলে!' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ও। 'আগের চেয়ে আরও স্মার্ট লাগছে!'

'পছন্দ হয়েছে তা হলে?'

'পছন্দ তো সেই কবেই হয়ে বসে আছে। কিন্তু তোমার তো নাগালই পাওয়া

যায় না...'

'এবার তা হলে একটা ডেট পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে! আজ সন্ধ্যায় কি ফ্রি আছো? ভাল কোনও রেস্টুরেন্টে ডিনার...'

'রানা, এসে গেছ,' কখন যে ভারি দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেছে, টেরই পায়নি ওরা। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান মারভিন লংফেলো।

মুখ লাল হয়ে গেছে জুলিয়ার। মিস্টার লংফেলো বললেন, 'জুলি, দু' কাপ কফি পাঠিয়ে দিয়ো আমাদের জন্যে।' রানার দিকে ফিরলেন। 'এসো।'

ভিতরে চলে গেলেন মিস্টার লংফেলো।

জুলিয়ার বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল রানা। 'কী, ডিনারের দাওয়াতটার জবাব দিলে না যে?'

'নেগেটিভ!' বলল জুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে। বসের কামরার দিকে চোখের ইশারা করে বলল, 'গিয়ে দেখো কী আছে কপালে! গতকাল অনেক গুজুর-গুজুর করেছে তোমার বসের সঙ্গে।'

মুচকি হেসে ওক কাঠের দরজাটার দিকে এগোল রানা। ভিতরে ঢুকল। বসতে ইঙ্গিত করলেন মিস্টার লংফেলো। ডেস্কে মুখোমুখি চেয়ারে বসল রানা। খসাৎ খসাৎ করে ঘষে দিয়াশলাইয়ের অনেকগুলো কাঠি নষ্ট করে অবশেষে পাইপ ধরিয়ে সন্তুষ্ট হলেন মিস্টার লংফেলো। রানার ছুটি বাতিল হতে চলেছে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর দাঁতে পাইপ চেপে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত ব্যস্ত রাস্তার দিকে তাকিয়ে যেন ভয়ঙ্কর সব অপরাধীদের খুঁজে বেড়াল তাঁর চোখ।

'তোমার সাহায্য দরকার আমাদের, রানা,' বলতে বলতে চেয়ারে এসে বসলেন তিনি। 'ব্যাপারটা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে, খুব বড় কিছু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ড. অ্যালফ্রেড পিটসেনের নাম শুনেছ?'

'কোনও বিখ্যাত ডাক্তার, সার?'

'না, এ লোক চিকিৎসক নয়, এটা ওর অ্যাকাডেমিক টাইটেল। সরবন থেকে নিয়েছে, আমার যদ্দূর মনে হয়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি আর পূর্ব ইয়োরোপের সবচেয়ে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াস থেকেও ডিগ্রি নিয়েছে লোকটা। অক্সফোর্ড থেকে পলিটিকস, ফিলোসফি আর ইকোনমিক্সে ডিগ্রি নিয়েছে। তারপর কেমিস্ট্রির দিকে ঝুঁকেছে। অবাক লাগে না?'

জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল রানা। শোনার অপেক্ষা করছে।

কাশি দিলেন মিস্টার লংফেলো। 'আর এসব ডিগ্রি নিতে ওকে সামান্যতম

বেগ পেতে হয়নি। বছরখানেক হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলেও পড়েছে, বিষয়টা নিজের উপযুক্ত মনে না হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে। প্রথমে ইসটোনিয়ায় ছোটখাট ওষুধের ব্যবসা করেছে, তারপর প্যারিসের কাছে কারখানা খুলেছে।'

'কী ধরনের ওষুধ?'

'অ্যানালজিযিক। সোজা কথায় বেদনানাশক। তারপর একে একে নিউরোলজিকাল ওষুধ, এই যেমন, পার্কিনসন্স ডিযিয, মাল্টিপল স্ক্লেরসিস, এসব রোগের জন্যে। এ কাজে ফাইযার, জনসন অ্যাণ্ড জনসনের মত বড় বড় কারখানাগুলোর সহায়তা নিয়েছে। তারপর সুযোগ বুঝে সরে এসেছে তাদের কাছ থেকে। তাতে কোনই অসুবিধে হয়নি ওর। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ, নিম্ন ব্যয় আর স্ট্রং-আর্ম সেলস টেকনিক দ্রুত উন্নতির শিখরে তুলে দিয়েছে ওকে, পৌঁছে দিয়েছে বিগ মার্কেটে। তারপর একদিন, পপির দিকে নজর গেছে ওর।'

'পপি?'

'হ্যাঁ, ঘুমের ওষুধ আর বেদনানাশক ড্রাগগুলোর উৎস। হাসপাতালগুলোতে দেহ অবশ করার কাজে হরদম ব্যবহার হয়। তোমার নিশ্চয় জানা আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর লোকেরা পকেটে মরফিন রাখত, শেলের আঘাতে হাত-পা উড়ে গেলে দ্রুত ব্যথা কমানোর জন্যে। হেরোইন নামটা শুনলেই এখন মাদকাসক্তদের কথা মনে আসে, অথচ কাশির ওষুধে এই জিনিসটাকে প্রথম ব্যবহার করেছিল বিখ্যাত জার্মান ওষুধ কোম্পানি বেয়ার। মাদক হিসেবে ব্যবহার করা হবে ভেবে এখন অবশ্য এ ধরনের জিনিস ওষুধে মেশানো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে আফিমকে এখনও বৈধভাবে ওষুধ বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়, আবার এর অবৈধ ব্যবহারেরও কমতি নেই।'

'আমাদের এই বিশেষ লোকটি কোনটিতে জড়িত?'

'খোলাখুলিভাবে, অবশ্যই, প্রথমটিতে। তবে আমাদের সন্দেহ, পরেরটি থেকেও পিছিয়ে তো নেইই, বরং অনেকের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে। সেটা কতখানি, সঠিকভাবে জানার প্রয়োজন আছে আমাদের।' উঠে দাঁড়িয়ে আবার জানালার কাছে চলে গেলেন অ্যাডমিরাল লংফেলো। তারপর বললেন, 'শুধু আমাদেরই নয়, তোমাদেরও। যাই হোক, ধাপে ধাপে এগোতে হবে তোমাকে। প্রথমে পিটসেনকে খুঁজে বের করো। ওর সঙ্গে কথা বলো। জানার চেষ্টা করো, কীসে বেশি ক্ষিপ্ত হয়।'

'মানসিক রোগী মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করল রানা।

'হ্যাঁ।'

'হয়তো ভাবছ, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কোনও এজেন্টকে পাঠাচ্ছি না কেন। ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছি, কিন্তু তেমন কোনও অগ্রগতি নেই। ড. পিটসেনের

ব্যাপারে তোমার বস্ রাহাত খানও সমান আগ্রহী। সে-ই আমাকে ফোন করে খোঁজ নিচ্ছিল। আমরাও এ-ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় রয়েছি বুঝে তোমাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ লংফেলোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

পরের কথাটা বলার আগে একটু বিরতি নিলেন মিস্টার লংফেলো। 'পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তো আছেই, বাংলাদেশের জন্যেও একটা মস্ত হুমকি এই লোকটা। এত বেশি ড্রাগ ঢুকছে তোমাদের দেশের ভিতর, শঙ্কিত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সরকার—রাহাত আমাকে জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই তরুণ প্রজন্মের অসংখ্য ছেলেমেয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে, সংখ্যাটা চমকে দেয়ার মত। মাদকসেবী আগেও ছিল সারা দুনিয়ায়, তবে হঠাৎ করে এতটা বেড়ে যায়নি আর কখনও। কোনমতেই আর ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। আমেরিকাও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ওদের সমাজে তো ড্রাগ নেয়াটা স্মার্টনেসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, বিশেষ করে শো-বিজের লোকেদের কাছে, আমাদের দেশেও সেটা সংক্রমিত হচ্ছে, বাংলাদেশেও তাই।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এই ড. পিটসেনকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'সবখানেই তো দেখা যায় ওকে। এভিয়েশন ওর হবি। দুটো প্রাইভেট প্লেন আছে। ওগুলো উড়িয়ে যেখানে-সেখানে চলে যায়। তবে প্যারিসেই বেশি দেখা যায় ওকে। তা ছাড়া ওকে চিনে নিতে খুব বেশি অসুবিধে হবে না তোমার। কারণ, ওর একটা হাত,' ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলেন মিস্টার লংফেলো, সরাসরি রানার দিকে তাকালেন। 'ওর বাঁ হাতটা, মাংকি'য পোঅ। একটা দুর্লভ জন্মবিকৃতি। বানুরে হাত বলে এটাকে, বুড়ো আঙুলটা আলাদা থাকে, কিন্তু বাকি আঙুলগুলো জোড়া লাগা। কিছু ধরতে অসুবিধে হয়। যেমন ধরো পেন্সিল—ধরতে পারে, কিন্তু খুবই কষ্ট করে, স্বাভাবিক আঙুলওয়ালা মানুষের মত পারে না। তার ওপর আরও বিকৃতি রয়েছে ওর হাতটায়, স্বাভাবিক হাতের চেয়ে লম্বা, শিম্পাঞ্জির মত। কনুই পর্যন্ত গোটা হাত ঘন কালো রোমে ঢাকা।'

কী যেন একটা খচখচ করছে রানার মনে, স্মৃতি থেকে বের করে আনার চেষ্টায়। বিড়বিড় করল, 'ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাতটা লম্বা।'

'হ্যাঁ। তবে দুর্লভ হলেও অসম্ভব নয়, এ রকম বিকৃতি ঘটে।'

'সঙ্গে কি কেপি পরা একজন লোক থাকে?'

'জানি না।'

'আমার মনে হয় ওকে আমি দেখেছি, সার। মার্সেই-এ।'

'ডকের কাছে?'

'হ্যাঁ।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন মিস্টার লংফেলো। 'তাই? আশ্চর্য!'

'ও কী আমার বয়েসী, শক্ত গড়ন, তেল দেয়া লম্বা চুল পিছন দিকে আঁচড়ানো, স্লাভিক...'

'দেখো,' একটা ছবি টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলেন মিস্টার লংফেলো। 'এই লোকটা?'

'হ্যাঁ। এই লোক।'

'তা হলে তো পেয়েই গেছ,' হাসলেন মিস্টার লংফেলো, হাসিতে চাপা উত্তেজনা। 'মিশন শুরু করার আগেই এক ধাপ এগিয়ে রয়েছ। যাই হোক, ড. পিটসেনের ব্যাপারে সাবধান, রানা, লোকটা খুবই ভয়ঙ্কর। সাধারণ মাদক ব্যবসায়ী ভেবো না ওকে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ও। সত্যি কথাটা হলো, তোমাকে পাঠাতে ভয়ই লাগছে আমার।'

রানার মনে হলো মিস্টার লংফেলোর দৃষ্টি যেন ধারাল ছুরির ফলার মত কেটে ঢুকে যাচ্ছে ওর চোখের ভিতর দিয়ে।

'ডুক্সেম বিউরো কি জানে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'জানে। প্যারিসে পৌঁছেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রাঁ থিয়াখির সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। তোমার টিকেট আর হোটেলের রুম বুক করে রেখেছে জুলিয়া।'

'থ্যাংক ইউ, সার,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমার কাজ ওকে থামানো, এই তো?'

'হ্যাঁ। তবে আবারও বলছি, রানা, সাবধানে থাকবে। বার বার সাবধান করার কারণ, ড্রাগ শুনতে খুব বেশি ভয়ঙ্কর শোনায় না, আর্মস পাচারের মত তো নয়ই, হীরা পাচারের মতও নয়। কিন্তু ড. পিটসেন লোকটার ব্যাপারে একটা আজব অনুভূতি হচ্ছে আমার—খারাপ, খুব খারাপ। ইতিমধ্যেই হাতে অনেক রক্ত লাগিয়ে ফেলেছে ও।'

রানাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন মিস্টার লংফেলো।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। 'এবার প্যারিস থেকে ফিরে যদি লণ্ডনে আসি, প্রথমেই তোমার সঙ্গে দেখা করব, যাও, কথা দিলাম।'

'ঠিক আছে। আমিও আমার হাসব্যাণ্ডকে ফাঁকি দিয়ে...'

'তওবা, তওবা!' বলল রানা। 'কবে, জুলিয়া? বিয়ে করেছ, বলোনি কেন?'

'বলার সময় পেলাম কই?' হাসল জুলিয়া। 'তুমি ফিরতে ফিরতে হয়ে যাবে বিয়েটা। আর একান্তই যদি না হয়, চিন্তা কী, তুমি তো আছোই!'

চার

হোটেলটা মোটামুটি ভালই পছন্দ করেছে জুলিয়া, একজন স্পাইয়ের উপযুক্ত। দ্রুত বেডরুম, বাথরুম, আর ছোট সিটিং রুমটায় তন্ন তন্ন করে *ছারপোকা* খুঁজল রানা। পেল না।

আরও একবার ভালমত খোঁজার পর নিশ্চিত হলো, কোথাও মাইক্রোফোন লুকানো নেই। তারপর জানালার শাটার লাগিয়ে দিয়ে সুটকেসটা বিছানায় ফেলে গোপন কুঠুরি থেকে গুলি বের করল। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা খুলে ম্যাগাজিন পূর্ণ করে আবার স্প্রিং লোডেড হোলস্টারে ভরে রাখল সাবধানে, যাতে কোটের হাতার নীচ থেকে ফুলে না থাকে। তারপর ফোন করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অপারেটরকে নম্বর দিয়ে টেবিলে বসে আঙুলের মাথা দিয়ে একটা কয়েন ঘোরাতে ঘোরাতে মনে পড়ল, সকালে রোম থেকে নাস্তা সেরে বেরোনোর পর আর ভারি কিছু খায়নি। খাওয়ার সময়ই পায়নি। ফোনটা সেরেই খেতে যাবে। ফোনে পাওয়া গেল না থিয়াখিকে। প্যারিসে এখন রাত ন'টা। ও নিশ্চয় এখন ওর মিসট্রেসের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে, ভাবল রানা। বাধ্য হয়ে ডুক্সেমের টেলিফোন অপারেটরের কাছে একটা মেসেজ রেখে উঠে এল ও।

বৃষ্টি হচ্ছে। তাই ভাল কোনও রেস্টুরেন্টে আর যাওয়া হলো না, বৃষ্টির মধ্যে বেরোতে মন চাইল না। রুমে ফিরে চলল ও। বাটারটোস্ট আর ওমলেট দিয়েই কাজ সারতে হবে। ঘরে ফিরে রুম সার্ভিসকে ফোন করে অর্ডার দেবে। খেয়ে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়বে।

মার্বেলের লবি পার হয়ে লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল ও। বোতাম টিপেও লিফট আসার অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়াল। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠল ওপরে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জেলে, চাবিটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে, বেডসাইড টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। রিসিভার তুলে 'জিরো' টিপল। হঠাৎ করেই ঘুরে তাকিয়ে দেখতে পেল এক অপূর্ব দৃশ্য।

একটা নকল লুই ফিফটিন আয়নার নীচে সোনালি ফ্রেমের আর্মচেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে প্রশান্ত মুখে বসে রয়েছে এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী। বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি রাখা। লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা কালো লম্বা চুল ঘাড়ের কাছে নেমেছে। গায়ে সাদা ব্লাউজ, পায়ে কালো মোজা আর নিচু

হিলওয়ালা কালো জুতো। লাল লিপস্টিক লাগানো ঠোঁটে কৈফিয়তের হাসি।

'আপনাকে চমকে দেয়ার জন্যে দুঃখিত, রানা,' মেয়েটা বলল। 'আপনার সঙ্গে দেখা করাটা খুব জরুরি ছিল আমার জন্যে। আবার আমাকে *না* বলে দেয়ার সুযোগটা দিতে চাইনি।' আলোর দিকে ঝুঁকে এল ও।

'জেনিফার,' পিস্তল নামাল রানা।

'আসলে, মাপ চাওয়ার ভাষা নেই আমার। আপনার সঙ্গে দেখা করাটা এতই জরুরি ছিল...: মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনার চুল। এখন অনেক লম্বা।'

'হ্যাঁ। রোমে পরচুলা পরেছিলাম। এখন যা আছে, সবই আসল।'

'আপনার স্বামী...'

'বিয়েই করিনি এখনও, মিস্টার রানা। আর যদি করতামও, বীমা কোম্পানির কোনও লোককে তো নিশ্চয়ই নয়। এখন আরেকটা কথা বলি—লজ্জাই লাগছে বলতে—আমার নামটাও আসলে জেনিফার নয়।'

'হতাশ করলেন। জেনিফারকে নিয়ে অনেক কিছুর পরিকল্পনা ছিল আমার।'

'এবার আশা করি আমার বিজনেস কার্ডটা দেখানোর সুযোগ দেবেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। ওর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। পর্দার আড়ালে দেখে নিল, আরও কেউ আছে কি না। মেয়েটার হাত থেকে কার্ডটা নিল না। সরে এসে বাথরুমের দিকে পিস্তল তাক করে রেখে পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা খুলে ভিতরে তাকাল। কেউ নেই।

চুপচাপ তাকিয়ে আছে মেয়েটা। রানা যা করছে, সেটা ওর জন্য অপমানজনক, কিন্তু না-বলে চুপি চুপি ঘরে ঢোকার কারণে এই অপমানটুকু মেনে নিতেই হলো।

ঘরে আর কেউ নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কার্ডটা নিল রানা। 'মিস নোভা ল্যাপটেভ। ইনভেস্টমেণ্ট ম্যানেজার। প্যারিস স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংক। ১২ বিস রু দ্যু ফোবো স্যাঁ অনর।'

'একটা ব্যাখ্যা চাইবেন নিশ্চয়।'

'দিলে তো ভালই হয়।' কৌতূহল বোধ করছে রানা। মনে মনে প্রশংসা না করেও পারছে না: ইস্পাতের স্নায়ু মেয়েটার। 'কথা শুরু করার আগে রুম সার্ভিসকে একটা ড্রিংক আনতে বলি। কী খাবেন?'

'কিছু না, থ্যাংক ইউ... ঠিক আছে, এক গ্লাস পানি।'

দু'পেগ বুরবন আর এক বোতল ভিটেলের অর্ডার দিল রানা। রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'যা বলতে এসেছেন, বলার জন্যে ঠিক তিন মিনিট সময় দিলাম। শুরু করুন, ঝটপট।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে আবার শক্ত আর্মচেয়ারটায় বসল মিস নোভা ল্যাপটেভ ওরফে জেনিফার কেন্টম্যান। চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল।

যাক, সিগারেটের ব্র্যাণ্ডটা তা হলে আসল, ভাবল রানা।

'আপনি কী কাজ করেন জানতে কিছুটা সময় লেগেছিল আমার,' নোভা বলল।

'কতদিন ধরে ব্যাংকে কাজ করছেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'ছয় বছর। সত্যি বলছি কি না ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। চিপসাইড-এ আমাদের হেডঅফিস।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মনে হলো, রাশান বাবা আর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে যা যা বলেছে ওকে *জেনিফার*, তার বেশির ভাগই সত্যি। বিয়ে করেনি, স্বামী নেই, শুনে কিছুটা হতাশই হলো। কোনও দেশের সিক্রেট এজেন্ট কি না ভেবে অস্বস্তি বোধ করছে।

'কী, বিশ্বাস করছেন না তো?' নোভা বলল। 'যেখানে যতভাবে খুশি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

'রোমে গিয়েছিলেন কেন?'

'প্লিজ, মিস্টার রানা। আমার তিন মিনিট সময় তো আপনিই প্রশ্ন করে খেয়ে নিচ্ছেন।'

'খেয়ে নিচ্ছি?' হাসল রানা। 'ঠিক আছে, বলুন।'

'রোমে আপনাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। আপনার সাহায্য দরকার, আমার বোনকে উদ্ধার করার জন্যে। একটা খুব বাজে লোকের সঙ্গে থেকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে হচ্ছে ওকে। আমার বোনকে বন্দি করে রেখেছে লোকটা।'

'দেখুন, আমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নই,' তীক্ষ্ণ হলো রানার কণ্ঠস্বর। 'দুর্দশায় পড়া বোনদের সাহায্য করা বা উদ্ধার করে আনা আমার কাজ নয়। প্যারিসে অনেক বড় বড় গোয়েন্দা সংস্থা আছে, ওদের কাছে যান।'

হাসি মুছল না নোভার মুখ থেকে। 'গিয়েছিলাম।'

দরজায় টোকা পড়ল। বুরবন ও ভিটেল নিয়ে ঘরে ঢুকল বেলবয়। একটা গ্লাসে বোতল থেকে ভিটেল (মিনারেল ওয়াটার) ঢেলে দিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল।

কথা না বলে একটা ভাঁজ করা নোট ট্রেতে রাখল রানা। অপ্রত্যাশিত বকশিশ পেয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল লোকটা।

'গিয়েছিলেন?' নোভার দিকে তাকিয়ে বলল ও।

'হ্যাঁ,' নোভা বলল। 'প্যারিসের রানা এজেন্সির অফিসেও গিয়েছি। ওখানকার ইনচার্জ মিস্টার সলিল সেনের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বললেন, তিনি আপাতত

কোন লোক দিতে পারবেন না, আপনার নাম বললেন। আপনি নাকি ছুটিতে আছেন। ছোটখাট এই কাজটা করে দিতে কোনও অসুবিধে হবে না আপনার।' শ্রাগ করল ও। 'তবে আপনি কোথায় আছেন, সেটা বলতে পারলেন না। সবশেষ খবর জানালেন, আপনি রোমে যাবেন। কোন্ কোন্ হোটেলে ওঠার সম্ভাবনা আছে আপনার, সেগুলোর নামও জানালেন। হোটেলগুলোতে ফোন শুরু করলাম তখন থেকে।'

'বহুত কাজ করেছেন দেখছি।'

'থ্যাংক ইউ। রোমে পৌঁছতে দেরি করে ফেলেছিলেন আপনি। প্রতিদিন কয়েকবার করে ফোন করেছি আমি, অনেক টাকা বিল দিতে হয়েছে।'

'অফিস থেকে করেছেন?'

'উঁহুঁ। আমার অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে। ব্যক্তিগত কাজের খরচ আমি অফিসের ওপর চাপাই না। সত্যি বলছি, মিস্টার রানা, এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'তাই।' চিন্তিত ভঙ্গিতে নোভার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। রাশান স্পাই কি না বোঝার চেষ্টা করছে। মাদক পাচার আর ড. পিটসেনের সঙ্গে রাশিয়ার কী সম্পর্ক?

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, বুঝতে পারছি,' শান্তকণ্ঠে বলল নোভা। 'তাতে অবশ্য আমার অনুযোগ করবার কিছু নেই। তবে একটা ব্যাপার ঠিক, আপনার বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।'

রানা কিছু বলল না। চুমুক দিয়ে গ্লাস থেকে অর্ধেকটা বুরবন শেষ করে পানির গ্লাসটা এগিয়ে দিল মেয়েটির দিকে। ছোট্ট এক ঢোক গিলে নিয়ে কথার খেই ধরল আবার।

'শুনুন, ড. পিটসেনকে খুঁজে বের করতে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি,' নোভা বলল। 'শনিবার সকালে ও কোথায় থাকে, আমি জানি। একটা টেনিস ক্লাবে।'

'আমার মনে হয় আপনার তিন মিনিট সময় পার হয়ে গেছে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা।

রানার চোখে পড়ানোর জন্যই যেন পায়ের ওপর থেকে পা সরিয়ে বসল নোভা। রোমেও এমন করেছিল। আকৃষ্ট তো হলই না রানা, আরও বেশি উদ্বিগ্ন হলো। আগেরবারের চেয়ে এবার বয়েস আরও অন্তত চার বছর কম দেখাচ্ছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

ওর চোখে চোখ রেখে হাসল নোভা। 'বুঝলাম, ভণিতা করে লাভ নেই। সোজাসুজিই বলি, আমি জানি, আপনি ড. পিটসেনের খোঁজে এসেছেন।'

'কীভাবে?'

'আমার বোন বলেছে। ফোন করেছিল। আপনাকে সাবধান করে দিতে বলেছে যাতে পিটসেনের কাছ থেকে দূরে থাকেন।'

'আপনার বোন শুনল কার কাছ থেকে?'

'ঘোড়ার মুখ থেকে,' বিলেতি প্রবাদটা বলে হেসে উঠল নোভা।

বুক ভরে দম নিল রানা। চোখকান খোলা রেখেই নিশ্চয় কাজ করে পিটসেন, আর কে ওর পিছনে লাগছে কিংবা লাগতে পারে, সেটা আগাম জেনে যাওয়ার মত ব্যবস্থাও নিশ্চয় আছে ওর।

'আপনার বোন জানে আমি প্যারিসে আসছি?'

'জানে। আজ সকালেই ফোন করেছিল।'

'কোন হোটেলে উঠব তা-ও জানে?'

'না। আমি এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিলাম, আপনার ট্যাক্সির পিছু নিয়ে চলে এসেছি। সরি। আপনার রুমে ঢোকার জন্যে... আসলে, প্যারিসে, মেয়েদের লিফটে ওঠা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মিষ্টি হাসি দিয়ে রিসেপশন ক্লার্কের কাছ থেকে আপনার রুম নম্বর জেনে নিলাম। লিফট দিয়ে উঠে করিডোরে রুম-সার্ভিস বয়কে কিছু টাকা দিতেই দরজাটা খুলে দিল। ওকে বলেছি, আমার চাবি হারিয়ে ফেলেছি। কারও রুমে ঢোকা একেবারেই সহজ, তাই না?'

'হুঁ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল রানা। 'জুলিয়া লোগানের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমার। একটা জঘন্য হোটেলে রুম বুক করেছে।'

মুখে রক্ত জমল নোভার। 'কাজগুলো অন্যায় হয়ে গেছে, আমি জানি, তারজন্যে আরও একবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করে কথা বলাটা খুবই জরুরি ছিল আমার জন্যে। আমি জানি, ফোন করলে সবিনয়ে সরি বলে ফোনটা রেখে দিতেন, কিছুতেই দেখা করতেন না। আসলে, প্রথমবারেই আপনাকে সব খুলে বলা উচিত ছিল। কিন্তু, এতই শীতল হয়ে ছিলেন, বলার সাহস পাইনি।'

'এখন দ্বিতীয় সুযোগটা নিলেন চুরি করে ঘরে ঢুকে, এবং এ কাজটা করার সাহস হলো। তারপর এমন একটা লোকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন, যাকে খুঁজে বের করার জন্যে অফিস থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।'

হাসল নোভা। 'আপনি কি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন?'

কিছু বলল না রানা। পা ঝাড়া দিয়ে কালো লোফার দুটো খুলে নিয়ে ঝপ করে বসল বিছানায়। পিস্তলটা টেলিফোনের পাশে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে ভাবল। বিমূঢ় হয়ে গেছে ও। নিঃসঙ্গ গৃহবধূ, ব্যস্ত ব্যাংকার, রাতের রানী... নাহ্,

মেয়েটাকে নিয়ে কৌতূহলী না হয়ে পারা যায় না। ওই যে চুপচাপ বসে আছে, সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা লাল ঠোঁট, আত্মবিশ্বাসী হাসি, চোখে পড়ার মত ভঙ্গি। ওর স্বামী বীমা কোম্পানির লোক হতে পারে, এ মুহূর্তে ওকে দেখে তা ভাবাই যায় না। কিন্তু রোমে নিঃসঙ্গ গৃহিণীর এত দুর্দান্ত অভিনয় করেছিল, অবিশ্বাস করা যায়নি। রেস্টুরেন্টে বোনের কথাটা বলেনি তার কারণ হয়তো খোলাখুলি বলতে চায়নি, ঘরে গেলে নিশ্চয় বলত। নাকি ঘরে নিতে চাওয়ার অন্য কোনও কারণ ছিল, একান্ত ব্যক্তিগত কোনও কিছু?

যাই হোক, এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না। ওকে এখন নিজের সহজাত প্রবৃত্তি আর অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করতে হবে। গল্পটা সত্যি হোক বা মিথ্যে, এমনভাবে বলেছে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। তবে মেয়েটা বিপজ্জনক, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'বেশ, নোভা,' অবশেষে মনস্থির করে নিয়ে রানা বলল, 'যা যা করতে পারি, বলি আপনাকে। আজ বৃহস্পতিবার। আগামীকাল একজন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব আমি। পরশু দিন, শনিবার সকালে টেনিস ক্লাবে যাব আপনার সঙ্গে। কাল সন্ধ্যা ছ'টায় এই নম্বরে ফোন করব আপনাকে।' নোভার কার্ডটা তুলে ধরল ও। 'আপনি আমার সঙ্গে পিটসেনের পরিচয় করিয়ে দেবেন...'

'না, পরিচয় করাতে পারব না। পিটসেনের সামনে যাওয়া একদম উচিত হবে না আমার। তাতে নিনার বিপদ বাড়বে। আমি আপনাকে ওর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ওই ক্লাবে আপনাকে থাকতে হবে। আমি চাই, আপনি থাকুন। আমি চলে না আসা পর্যন্ত থাকবেন।'

'আপনার নিরাপত্তা হিসেবে?'

'যা খুশি ভাবুন। আপনাকে থাকতে হবে, ব্যস।'

'থাকব। এই কথাই রইল তা হলে।' হাত বাড়িয়ে দিল নোভা।

ধরল রানা।

'জেনিফার আপনার গালে চুমু খেয়েছিল,' হেসে বলল নোভা।

'থাক, নোভার আর ওসব খাওয়ার দরকার নেই।' হাতটা ছেড়ে দিল রানা।

বেরিয়ে গেল নোভা। দরজা দিয়ে তাকিয়ে রইল রানা। করিডোর দিয়ে লিফটের দিকে এগোল মেয়েটা। দামি স্কার্টের ঝুল উরুর অর্ধেক নেমেছে। দেখা যাচ্ছে লোভনীয়, সুন্দর পা দুটো।

লিফটে ওঠার আগে আর ফিরে তাকাল না নোভা। দরজা বন্ধ হওয়ার আগে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি টেনিস কেমন খেলেন জানি না। তবে ভাল হলেই ভাল হয়।'

দিনের বেলাতেই দেখা করার জন্য ব্যস্ত হলো ফ্রাঁ থিয়াখি। 'শুক্রবারের সন্ধ্যায় আমি অন্য কোনও কাজ করতে চাই না, রানা। অফিসে বসে সারা সপ্তাহের অসমাপ্ত কাজগুলো জোড়াতালি দিই। তোমার চিন্তা নেই, দুপুরের আগেই চলে এসো, লাঞ্চটা আমিই খাওয়াব।' একটা রেস্টুরেন্টের ঠিকানা দিল ও।

নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে গেল রানা। জানালার কাছ থেকে দূরে এমন একটা জায়গায় বসল যাতে সারা ঘরে চোখ রাখতে পারে। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকতে দেখল থিয়াখিকে, অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে, ট্র্যাফিক জ্যামকে দেরি হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে গজগজ করতে থাকল।

'জায়গাটাকে দেখে আহামরি কিছু মনে হচ্ছে না তো? ঠিকই আছে। তবে খাবারের প্রশংসা না করে পারবে না। এখানে যারা আসে তাদের বেশির ভাগই পাবলিশার, লেখক, প্রফেসার এ-ধরনের লোক। তোমার দলে কেউই পড়বে না, এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

দ্রুত কথা বলে থিয়াখি। রানা বাধা দেয়ার আগেই ড্রিংকসের অর্ডার দিল।

'ড. অ্যালফ্রেড পিটসেনের ব্যাপারে কী জানো?' সরাসরি কাজের কথায় এল রানা।

'তেমন কিছু না। তুমি?'

যা যা জানে, বলতে লাগল রানা। কান পেতে শুনছে থিয়াখি, মাঝে মাঝে নীরবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

'তো, এখন কী করতে চাও? ওর কাছে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছ?' রানার কথা শেষ হলে থিয়াখি জিজ্ঞেস করল।

'সুযোগ একটা পেয়েছি। তবে খুবই পিচ্ছিল মনে হচ্ছে।'

হাসল থিয়াখি। 'আমাদের লাইনে পিচ্ছিল রাস্তা ছাড়া আর কী পাবে?'

ট্রেতে করে গ্লাস আর বোতল নিয়ে এল ওয়েইটার। ঢেলে দিতে গেল, আঙুলের ইশারায় নিষেধ করল থিয়াখি। চলে গেল ওয়েইটার।

'নোভা ল্যাপটেভ নামে কাউকে চেনো?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'রাশান মনে হচ্ছে,' থিয়াখি বলল।

'ওর বাবা বোধহয় রাশান। আমার একটা কাজ করে দেবে? রাশান স্পাই কি না, জানা দরকার।'

'আরআইএস? স্মার্শ? কেজিবি?'

'কোন্‌টা জানি না। সাবধানে খোঁজ করবে, কিছুই যাতে টের না পায়।'

'খুব জরুরি?'

'বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে অবশ্যই জানতে হবে আমাকে।' টেবিলের

ওপর দিয়ে নোভার কার্ডটা ঠেলে দিল রানা। ফোন নম্বরটা আগেই মুখস্থ করে নিয়েছে। 'এটা নিয়ে যাও।'

'নাহ্, তোমার সন্দেহ বাতিক কোনদিন যাবে না, রানা। দেখি, কী করতে পারি। সাড়ে পাঁচটায় অফিসে আমার সেক্রেটারিকে ফোন কোরো। আমি মেসেজ রেখে যাব। সহজ সঙ্কেত: লাল, কমলা, অথবা সবুজ। কী, গ্লাসে ঢালব এখন, নাকি আরও দেরি করবে?'

লাঞ্চের পর সেইন্ট জারমিন বুলেভার্ডের একটা স্পোর্টস শপ থেকে টেনিস খেলার উপযোগী কিছু কাপড়চোপড় কিনল রানা, আর একটা ডানলপ ম্যাক্সপ্লাই র‍্যাকেট। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে গেল। এবার রুমে ঢোকার আগে অনেক বেশি সাবধান হলো। কিন্তু আজ আর কেউ নেই ঘরে। সুটকেস খুলে সাথে করে আনা একটা ম্যাগাজিন বের করে মাদক চোরাচালানের ওপর লেখা একটা প্রতিবেদন পড়তে শুরু করল।

সাড়ে পাঁচটার পাঁচ মিনিট আগে নীচে নামল, ফোন করার জন্য। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ফোন করল থিয়াখির অফিসে। একবার রিং হতেই ওপাশ থেকে ধরল থিয়াখির সেক্রেটারি। রানা নাম বলতেই জবাব দিল, 'মসিঁয়ে থিয়াখি বলে গেছেন, সবুজ।'

মেয়েটাকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার রেখে দিল। ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজতে এখনও অনেক দেরি। হোটেলের লবিতে চামড়া মোড়া চেয়ারে বসে ভাবতে লাগল, সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে থিয়াখি, তারমানে সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পায়নি মেয়েটার ব্যাপারে। একবার ভাবল নোভাকে নিয়ে ডিনারে যাবে, পরক্ষণেই বাতিল করে দিল ভাবনাটা।

ঠিক ছ'টায় নোভাকে ফোন করল রানা। নোভা ধরতেই বলল, 'নোভা? মাসুদ রানা। কালকের প্রোগ্রামটা ঠিক আছে তো?'

'নিশ্চয়ই। আর কিছু?'

'ক'টার সময় যাচ্ছি আমরা।'

'সকাল দশটায় পৌঁছব। আপনাকে হোটেল থেকে তুলে নেব, এই ন'টা নাগাদ? তা হলে প্র্যাকটিস করার জন্যে কয়েক মিনিট সময় পাবেন।'

'ঠিক আছে।' দ্বিধা করছে রানা।

বুঝে ফেলল নোভা। 'আর কিছু বলবেন?'

'ইয়ে, না। মনে রাখবেন, আপাতত পর্যবেক্ষণে রয়েছেন আপনি।'

হাসল নোভা। 'বুঝতে পারছি।'

ওপাশে কেটে গেল লাইনটা।

নয় ঘণ্টা ঝাড়া ঘুম দিয়ে সকালে ঝরঝরে শরীর নিয়ে উঠল রানা। প্রথমে ব্যায়াম সেরে নিল, তারপর রুম সার্ভিসে ফোন করে নাস্তা আনতে বলে বাথরুমে ঢুকল। শেভ করে, শাওয়ার নিয়ে, কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোতেই দরজায় টোকা পড়ল। নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকল মেইড।

নাস্তা সেরে একটা সুতির শার্ট গায়ে দিল রানা। ট্রাউজার আর একটা খেলোয়াড়ি ব্লেজার পরে নিল। ফ্রান্সের অভিজাত ওই টেনিস ক্লাবে কী পোশাক পরে যেতে হয়, জানা নেই ওর। র‍্যাকেট সহ টেনিস খেলার পোশাকগুলো একটা ছোট হোল্ডঅলে ভরে, ঘর থেকে বেরোল।

ন'টা বাজার এক মিনিট আগে, সাদা সানবিম অ্যালপাইন গাড়িতে করে এল নোভা। গাড়ির হুড নামানো। ড্রাইভিং সিটে কালো সান গ্লাস পরা, লাল লিনেনের খাটো স্কার্ট পরা মেয়েটা যেন আগুনের মত জ্বলছে।

'উঠে পড়ুন।' বলল ও।

রানা উঠে সিটে বসতে না বসতেই ক্লাচ পেডাল ছাড়তে ছাড়তে এক্সেলারেটর পেডাল চেপে ধরল নোভা। লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করল ছোট্ট গাড়িটা দো লা কনকর্ডের দিকে।

হাসল রানা। 'এত তাড়াহুড়ো কীসের?'

'পিটসেনের সঙ্গে টেনিস খেলতে হলে ভালমত তৈরি হতে হবে আপনাকে,' নোভা জবাব দিল। 'অবশ্যই কিছুটা প্র্যাকটিস করে নেয়া দরকার। ও খুবই ভাল খেলে। আপনি?'

'মোটামুটি। নিয়মিত তো আর খেলতে পারি না।' একটু থেমে রানা বলল। 'গাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর। আপনার সঙ্গে মানিয়ে গেছে।'

'থ্যাংক ইউ,' হাসল নোভা। 'বাবা কিনে দিয়েছে।'

ইটোইয়ে যেখানে পনেরোটা রাস্তার মাথা একখানে মিশেছে, সেখানে এসে অন্য গাড়ির ভিড়ে প্রায় লড়াই করে এগোতে হলো ওকে, কিন্তু কিছুতেই পথ ছেড়ে দিল না অন্য কোনও ড্রাইভারকে, চতুর্দিক থেকে আসা গাড়ির হর্নকে পরোয়া না করে ছুটে চলল গন্তব্যের দিকে। অ্যাভিনিউ দ্যো নেউইলিতে এসে বিজয়ের হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে, জোর বাতাসে উড়ছে খোলা, কালো চুল।

টেনিস ক্লাবটা রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সরু একটা সুরকি বিছানো পথ ধরে এসে সেটার পার্কিং লটে গাড়ি রাখল নোভা। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে এগোল দুজনে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঢুকল মস্ত ক্লাবহাউসটায়।

'আপনি এখানেই থাকুন,' নোভা বলল। 'আমি আসছি।'

বোর্ডের নোটিশ দেখে সময় কাটাতে লাগল রানা।

কয়েক মিনিট পরেই নিজের নাম ধরে ডাক শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে নোভা ফিরে এসেছে। হাসিমুখে জানাল, 'কাজ হয়ে গেছে। সেক্রেটারি বলল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিটসেন চলে আসবে। আরও বলল: অন্য কারও সঙ্গে গেম বুক করেনি। আপনার ভাগ্য ভাল।'

'কী করে ম্যানেজ করলেন?'

এক মুহূর্তের জন্য বিব্রত দেখাল নোভাকে। 'নিনার কাছে শুনেছি, পিটসেন বাজি ধরতে পছন্দ করে। সেক্রেটারিকে বললাম, আপনিও বাজি ধরতে ভালবাসেন। ওকে বোঝাতে পেরেছি, আপনি ভাল খেলোয়াড় নন, জিততে পারবেন না; তবে নির্ভেজাল ভদ্রলোক, বাজিতে হারলে টাকাটা দিয়ে দেবেন বিনা প্রতিবাদে।'

'তার মানে হারতে পছন্দ করে না পিটসেন,' বিড়বিড় করল রানা।

'না, করে না। হারবেই, জানা কথা, তাই এখানকার কেউ আর এখন ওর সঙ্গে খেলতে চায় না।'

'কত গচ্চা দিতে হবে আমাকে?'

'বেশি না, মাত্র একশো পাউণ্ড। এখন আমি পালাই।'

'যান, তবে ক্লাব ছেড়ে কোথাও যাবেন না।'

'আরে নাহ্। কোনও কিছুর বিনিময়েই খেলাটা মিস করতে রাজি নই আমি। আশপাশেই থাকব। ওই যে, এসে গেছে।'

মস্ত কাঁচের দরজার ভিতর দিয়ে কালো মার্সিডিজটা দেখতে পেল রানা। চালাচ্ছে কেপি পরা একজন লোক। সিঁড়ির বাইরে এসে থামল। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে চাবিটা অ্যাটেনডেন্টের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে দরজা খুলে দিতে গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে প্যাসেঞ্জার সিটের দিকে এগোল ড্রাইভার।

প্যাসেঞ্জার সিট থেকে মাটিতে পা রাখল মিস্টার লংফেলোর দেখানো ছবির সেই লোকটা। একই লোক, মার্সেইতে যাকে দেখেছিল রানা। লম্বা হাতাওয়ালা একটা সাদা ফ্লানেলের শার্ট গায়ে, পরনে ধূসর রঙের স্ল্যাকস, আর ডান হাতের চেয়ে লম্বা বাঁ হাতে পরা সাদা একটা দস্তানা। লোকটা ওর পাশ কাটানোর সময় নোটিশবোর্ড দেখার ভান করল রানা। নোভা উধাও।

ক্লাবের অফিসের দিকে চলে গেল লোকটা।

মিনিটখানেক পর, এগিয়ে আসা পদশব্দ শুনে ফিরে তাকাল রানা। ওর কাছে এসে দাঁড়াল কেপি পরা লোকটা। 'এক্সকিউজ মি,' ইংরেজিতে বলল ও, 'মিস্টার রানা? আমার নাম লি টনকিন।'

ঘুরে লোকটার মুখোমুখি হলো রানা। ভালমত দেখল। হলদেটে চুল, চিনাদের মত সরু চোখ, চৌকোনা চ্যাপ্টা মুখ। চেহারাটা কেমন নিষ্প্রাণ, জ্যান্ত

লাশের মত মনে হলো রানার কাছে।

'আপনিই নিশ্চয় ড. পিটসেনের সঙ্গে খেলবেন?' কথার টানে লোকটা ঠিক কোন্ দেশি বোঝা না গেলেও এটুকু অনুমান করা গেল, চিনা অথবা থাই।

'যদি তিনি খেলেন আমার সঙ্গে।' খুব একটা গরজ দেখাল না রানা।

'না না, তিনি খেলবেন, নিশ্চয়ই খেলবেন। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই।'

রানাকে বিশাল ভিউইং এরিয়ায় নিয়ে এল লি।

জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে সবচেয়ে কাছের কোর্টটার দিকে চেয়ে ছিল পিটসেন। শব্দ শুনে ঘুরল। স্থির দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে তাকিয়ে দস্তানাবিহীন ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভীষণ-ভীষণ খুশি হলাম, মিস্টার রানা। এখন আমরা খেলা শুরু করতে পারি, কী বলেন?'

পাঁচ

চেঞ্জিং রুমটা গ্রাউণ্ড ফ্লোরের নীচে। সেখানে রয়েছে বড় একটা স্টিম রুম, চারটে সনা, আর এত বেশি কোলন ও আফটারশেভ লোশনের শিশি-বোতল-টিউব, লণ্ডনের মেফেয়ারের ট্রাম্পারদের মত বড় দোকানদারকেও বিক্রি করে শেষ করতে এক বছর লাগবে।

পর্দা দিয়ে আলাদা করে রাখা একটা ঘরে ঢুকল পিটসেন। একটু পর বেরিয়ে এল নতুন, সাদা ল্যাকোস্টি শর্টস পরে। তাতে ওর পায়ের পেশি আর রোদে পোড়া চামড়া চোখে পড়ছে। গায়ের লম্বা হাতাওয়ালা ফ্লানেলের শার্টটা খোলেনি। বাঁ হাতের দস্তানাও পরা আছে। ডান কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগে আধডজন নতুন উইলসন র‍্যাকেট।

রানা অনুসরণ করবেই, জানা কথা, এ রকম ভাব দেখিয়ে কোন কথা না বলে ওপরে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে উঠে গেল ও। বেরিয়ে গেল খেলার জায়গায়। এক ডজন গ্রাস কোর্ট রয়েছে এখানে, আর এক ডজন রয়েছে ঘাসবিহীন। মাটি পিটিয়ে সমান করে ফেলা হয়েছে, লাল পাউডারের মত হয়ে আছে ওপরের মাটি। এই কোর্টের জন্য বেশ গর্বিত ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ওরা বলে, বল এখানে ঠিকই লাফাবে, কিন্তু খেলোয়াড়ের গোড়ালি আর হাঁটুতে বাড়তি চাপ পড়বে না। প্রতিটি কোর্টে আম্পায়ারের জন্য উঁচু একটা করে চেয়ার, আর খেলোয়াড়দের জন্য স্বাভাবিক উচ্চতার চারটে করে কাঠের চেয়ার রয়েছে। আর

রাখছে অনেকগুলো সাদা তোয়ালে ও একটা করে ফ্রিজ। তাতে পানি, কোল্ড ড্রিংকস আর এক বাক্স নতুন সাদা স্লেযেনজার টেনিস বল। সবুজ ও চকলেট রঙের ডোরাকাটা পোশাক পরা ক্লাবের মার্শালরা ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করছে কোর্টের কাছে, মেম্বারদের দেখাশোনা করছে, তাদের সুবিধে-অসুবিধের খোঁজখবর নিচ্ছে।

একজন মার্শাল দৌড়ে এল ওদের কাছে। 'চার নম্বর কোর্টটা খালি আছে, ড. পিটসেন। আর যদি গ্রাস কোর্ট চান, তো ষোলো নম্বর।'

'না, আমি দু'নম্বরটাই নেব।'

'সব সময় যেটাতে খেলেন?' উদ্বিগ্ন মনে হলো লোকটাকে। 'কিন্তু এখন তো ওটা খালি নেই, মঁসিয়ে।'

ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল পিটসেন, ওর চোখে খুনের নেশা দেখল রানা। তারপর বরফশীতল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি দু'নম্বরটাই চাই।'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ-হ্যাঁ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। এখুনি গিয়ে আমি দু'নম্বর কোর্টের ভদ্রলোকদের বলছি চার নম্বর কোর্টে চলে যেতে।'

'দু'নম্বরের সারফেসটা ভাল,' রানাকে বলল পিটসেন। 'তা ছাড়া রোদও কষ্ট দেয় না।'

'আপনি যা ভাল বোঝেন,' রানা বলল। সকালটা সুন্দর। রোদও বেশ চড়া।

ফ্রিজ থেকে এক বাক্স নতুন বল বের করল পিটসেন। তিনটে রানার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনটে নিজে রাখল। রানার সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই ফার এণ্ডে গিয়ে দাঁড়াল ও, যদিও ওখানে কোনরকম বাড়তি সুবিধে নজরে পড়ল না রানার। কিছুক্ষণ প্র্যাকটিস করল দুজনে। কড়া নজর রেখেছে রানা, পিটসেনের দুর্বলতা বোঝার চেষ্টা করছে। একটা ব্যাপার লক্ষ করল, পিটসেন ফোরহ্যাণ্ডে মারলেই জালে লাগে বল, হয় ভাল মারতে পারে না, নয়তো রানাকে ভুল বোঝাতে চাইছে। সময়মত ঠিকই মারবে।

'রেডি,' পিটসেন বলল, এবারও রানার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন মনে করল না।

জালের কাছে এসে ইয়ার্ডস্টিক দিয়ে উচ্চতা মাপল সে। 'আপনি হয়তো ভাবছেন, অকারণে সময় নষ্ট করছি আমি। তা নয়, মিস্টার রানা। জালের উচ্চতা ঠিক রাখা খুব জরুরি, আধ ইঞ্চি এদিক-ওদিকও খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।'

'কী জানি, হবে হয়তো,' বাতাসে কয়েকবার জোরে জোরে র‍্যাকেট চালাল রানা।

সেন্ট্রাল ভারটিকল টেপ টেনে জালের দড়ি সামান্য আঁটো করল পিটসেন। টেপটা লাগানো রয়েছে মাটিতে গর্ত করে বসানো একটা দণ্ডে আটকানো হুকের সঙ্গে। র‍্যাকেট দিয়ে দড়ির গায়ে তিনবার বাড়ি দিল ও। রানা লক্ষ করল, খুঁটিতে লাগানো জালটাকে উঁচুনিচু করার জন্য কোন হ্যাণ্ডেল নেই। পোস্ট বেয়ে নেমে দড়িটা চলে গেছে মাটিতে বসানো একটা ছোট ধাতব পাতের নীচে, নিশ্চয় চাকা লাগানো আছে ওখানে, এর সাহায্যে আগে থেকেই দড়িটাকে টান টান করে রাখে হয়তো ক্লাবের লোকেরা।

'গুড,' সন্তুষ্ট হয়ে পিটসেন বলল। 'আপনি স্পিন করবেন?'

হাতের তালুতে র‍্যাকেট ঘোরাল রানা। 'রাফ না স্মুথ?'

'স্কিন,' পিটসেন জবাব দিল। রানার র‍্যাকেটের দিকে তাকাল। 'স্কিন, মিস্টার রানা। আমি সার্ভ করব।'

কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে পজিশন নিল রানা। 'স্কিন'টা কী, ভাবছে। আর কখনও শোনেনি। যাই হোক, পিটসেনের আসল খেলাটা দেখতে পাবে এবার, ভেবে নিজেকে সাবধান করল।

তবে সাবধান থেকেও কিছু করতে পারল না। আধ মিনিটের মধ্যেই প্রথম পয়েণ্ট, অর্থাৎ 'ফিফটিন' পেয়ে গেল পিটসেন। আরও মনোযোগী হলো রানা। তা-ও কিছু করতে পারল না। 'থারটি,' ঘোষণা করল পিটসেন। তারপর 'ফোরটি' এবং 'গেইম'।

প্রথম খেলাটায় মাত্র এক পয়েণ্ট পেল রানা—'ফিফটিন'। ফ্রিজ থেকে এভিয়ানের বোতল বের করে একটা গ্লাসে খানিকটা ঢালল পিটসেন, চুমুক দিল একবার। বাঁ হাত তুলে রানাকে ফ্রিজটা দেখিয়ে খেতে ইঙ্গিত করল। মুহূর্তের জন্য কব্জির কাছ থেকে সরে গেল সাদা দস্তানাটা। তাড়াতাড়ি ঢেকে নিয়ে জালের কাছে চলে গেল লোকটা। দু'বার দড়িতে বাড়ি দিল র‍্যাকেট দিয়ে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, এ ভাবে বাড়ি দেয়াটাকে সৌভাগ্যের সূচনা ভাবে।

পিটসেনের চুলে ঢাকা কব্জির কুৎসিত দৃশ্যটা মন থেকে জোর করে সরাল রানা। সার্ভ করতে এগোল। ও জানে, যে প্রথম সার্ভ করে, ম্যাচের ভাগ্য অনেকখানি নির্ভর করে তার ওপর। কিন্তু তারপরেও কিছু করতে পারল না। দুই-দুইবার ওর বল জালের দড়িতে বাড়ি খেয়ে ওর নিজের কোর্টেই ফিরে এল।

পিটসেনকে ঠেকানো কঠিন হয়ে উঠল ওর পক্ষে। রানা পারছে না দেখছে, তারপরেও মিথ্যে বলছে পিটসেন। একবার তো স্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পেল রানা। বল পড়েছে কোর্টের দাগ দেয়া সীমানার তিন ইঞ্চি ভিতরে, লাল মাটিতে বলের দাগ দেখল রানা, কিন্তু পিটসেন চেঁচিয়ে বলল 'আউট'। এসব ছাড়া আরও নানাভাবে রানাকে প্রতারিত করতে থাকল ও। এমন চালাকির সঙ্গে করছে

কাজগুলো, বুঝেও কিছু করতে পারছে না রানা। তবে আরেকবার দাগের ভিতরে বল পড়ার পর যখন 'আউট' বলল পিটসেন, মেনে নিল না রানা, বলল, 'কই, দাগের ভিতরেই তো পড়েছে।'

এগিয়ে গিয়ে র‍্যাকেট দিয়ে মাটিতে বলের দাগটা দেখাল ও।

'পুরানো দাগ,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল পিটসেন। জুতোর সোল দিয়ে ডলে মাটি সমান করে মিশিয়ে দিল দাগটা। 'নিন, সার্ভ করুন আবার।'

মারল রানা। জালের দড়িতে বাধা পেয়ে ফিরে এল বল।

'এই যে দেখুন, ঠিক কথা না বলার খেসারত,' পিটসেন বলল। 'ভুল বলেছেন, তার বিচার হয়ে গেল—কী, ঠিক কি না?'

অনেকক্ষণ থেকেই রাগ দানা বাঁধছে রানার মধ্যে, ক্রমে বাড়ছে সেটা। কটু কথা বেরিয়ে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে, অনেক কষ্টে ঠেকাল। ভয়ানক নির্লজ্জ লোকটা, আর নির্লজ্জদের কোন কিছু বলেই নিরস্ত করা যায় না।

একবার জিততে চলেছে রানা, হঠাৎ খেলার মাঝখানেই 'আসছি, প্রকৃতির ডাক,' বলে র‍্যাকেট ফেলে রেখে ক্লাবহাউসের দিকে চলে গেল পিটসেন।

ফ্রিজ থেকে কোল্ড ড্রিংকের বোতল বের করে চুমুক দিল রানা। ওর মনে হলো হার দেখেই পালিয়েছে পিটসেন, ফিরে এসে না খেলার কোনও একটা ছুতোনাতা দেবে, কিংবা গেমটা বন্ধ করে নতুন গেম খেলার কথা বলবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে পিটসেন বলল, 'মাপ করবেন, মিস্টার রানা। কোথায় যেন ছিলাম আমরা? আমার কি সার্ভ করার কথা?'

'না। আমার। ফোরটি—থারটি। ফাইভ—ফোর।'

'ও, তাই তো, তাই তো। কী ভুলো মন আমার। তা হলে আপনার ফোরটি হয়ে আছে, তাই না? ভেরি গুড। দানের অংকটাকে কিছুটা বাড়িয়ে দিলে কেমন হয়, মিস্টার রানা?'

'কত করতে চান?'

'এই হাজার পাউণ্ড?'

লোকটার হাসি আর ন্যাকামি দেখে গা জ্বলে গেল রানার। এক চড় মেরে ব্যাটার দাঁতগুলো সব ফেলে দিতে ইচ্ছে করল। ঝালটা বলের উপর মেটাল। রানাকে অবাক করে দিয়ে জালের দড়িতে লেগে ফিরে এল বল।

বিশ্রাম করতে বসল দুজনে। চেয়ারে বসে পিটসেন বলল, 'আপনি খুব লড়াকু মেজাজের লোক, তাই না, মিস্টার রানা?'

'কেন, ভয় পাচ্ছেন নাকি?'

'না না, ভয় না।' উঠে দাঁড়াল পিটসেন। 'ভাবছি, বাজির দানটাকে আরও বাড়িয়ে দেব। যদি আপনি রাজি থাকেন।'

রানার দিকে তাকাচ্ছে না ও। র‍্যাকেটের স্ট্রিং পরীক্ষা করতে ব্যস্ত।

'এক হাজারকে কত করতে চান?'

'বেশি না, এই দশ গুণ। এক হাজারটাকে দশ হাজার করে ফেলা যেতে পারে।'

এখনও রানার দিকে তাকাচ্ছে না ও। ব্যাগ থেকে একটা নতুন র‍্যাকেট নিয়ে সেটা দিয়ে বাড়ি মেরে স্ট্রিঙের টান টান ভাবটা ঠিক আছে কি না দেখছে।

অস্বস্তি বোধ করছে রানা। যদিও জানে, এই অ্যাসাইনমেন্টের সমস্ত খরচখরচা বিএসএস বহন করবে। তারপরেও মুখটা বেজার করবেন কি না মেলভিন, কে জানে।

রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন খোঁচা মারল পিটসেন, 'টাকাটা কিন্তু নগদ দিতে হবে, এবং কড়কড়ে নতুন নোটে।' এমন ভঙ্গি করল, যেন এখনই পাওনা হয়ে গেছে রানার কাছে। এবং ভুলটা করল। ভীষণ রাগিয়ে দিল ওকে। যেন ঘোরের মধ্যেই বলে উঠল ও, 'আমি রাজি।' বিএসএস দিতে পারবে কি পারবে না সেটা নিয়ে ভাবছে না আর। ওর একটাই লক্ষ্য, জিততে হবে।

এবং আশ্চর্য! পরের খেলা শুরু হলে প্রথম থেকেই হারতে আরম্ভ করল পিটসেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে দুজনেই। রানার মনে হলো, ওর ফুসফুসে আগুন ধরে গেছে, বলের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে রাখতে চোখ ব্যথা হয়ে গেছে। সামনে-পিছনে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে হাঁপিয়ে গেছে পিটসেন।

'আপনার ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটেছে,' রানা বলল। ওর উদ্দেশ্য সফল হলো। এমনিতেই রেগে গিয়েছিল পিটসেন, এ কথা শুনে রাগে যেন অন্ধ হয়ে গেল।

ক্রমেই আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে রানার। নতুন উদ্যমে বল পিটিয়ে চলেছে ও।

খেলার শেষ পর্যায়ে এসে কায়দা করে কায়দা করে সার্ভিস করতে চাইল পিটসেন। দড়িতে বেধে গিয়ে ওর কোর্টেই পড়ল। আবার মারতে গেল। আবারও একই অবস্থা। দড়ির এক ইঞ্চি নীচে লেগে ফিরে গেল বল।

'অসম্ভব! এ হতে পারে না!' ফেটে পড়ল পিটসেন। জোরে বাড়ি মারল নেটের দড়িতে।

'আস্তে। শান্ত হোন। চেঁচামেচি শুনলে সেক্রেটারি বেরিয়ে আসবেন,' রানা বলল। 'হ্যাঁ, ফাইভ—ফোর। আমার সার্ভ।'

শেষ হয়ে এসেছে ম্যাচ। পরের কয়েক মিনিটেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগে জালের দিকে র‍্যাকেট ছুঁড়ে মারল পিটসেন। রানাকে লক্ষ্য করে মেরেছিল কি না বোঝা গেল না, তবে দড়ি পার হলো না, জালে লেগে মাটিতে পড়ল ওটা।

জালের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল পিটসেনের দিকে।

এগিয়ে এসে হাতটা ধরল পিটসেন। দ্বিতীয়বারের মত রানার চোখে চোখে তাকাল। ওর দু'চোখের তীব্র ঘৃণা যেন রানার চোখ ফুঁড়ে মগজে ঢুকে গেল। ওর বিজয়ের আনন্দ ও স্বস্তি যেন বাষ্প হয়ে উড়ে গেল ওই দৃষ্টির তাপে।

'আবার দেখা হবে আমাদের, মিস্টার রানা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল পিটসেন, 'খুব শীঘ্রি। পরের খেলায় ভাগ্য আর সহায়তা না-ও করতে পারে আপনাকে।'

আর কিছু না বলে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ক্লাবহাউসের দিকে।

ছয়

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে চেঞ্জিং রুমে পিটসেনকে দেখল না আর রানা, তবে ওর র‍্যাকেটের ওপর রাখা আছে একটা সাদা খাম, কড়কড়ে নতুন নোটে ভর্তি।

ওপরতলার একটা বারে নোভাকে খুঁজে পেল ও। জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে নিরীহ ভঙ্গিতে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে।

'খেলাটা কেমন লাগল, মিস্টার রানা?'

'ভাল।'

'জিতেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো সেলিব্রেট করার জন্যে নিশ্চয় আমাকে লাঞ্চের দাওয়াত দেবেন?'

ভেজা চুলে আঙুল দিয়ে চিরুনি চালাল রানা। নোভার উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আগে একটা ড্রিংক নেব।'

জানালার কাছে নোভার মুখোমুখি বসল ও। ড্রিংকের অর্ডার দিল।

পায়ের ওপর পা তুলে বসে রানার দিকে তাকাল নোভা। 'শেষ দিকে এসে সব ঠিক হয়েছিল আপনার।'

'দেখছিলেন নাকি?'

'দূর থেকে। পিটসেন কিংবা লির চোখে পড়তে চাইনি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আসলে,' হেঁয়ালিভরা হাসি ফুটল নোভার মুখে, 'শেষ তিনটে গেমের আগে

পাত্তাই পাননি আপনি।'

'ওটা তো যে-কোনও খেলার ব্যাপারেই ঘটতে পারে,' রানা বলল। 'গল্ফ, টেনিস...'

'কিন্তু আমার কাছে অনেক বেশি কাকতালীয় মনে হয়েছে ব্যাপারটা,' নোভা বলল। 'তাই তদন্ত করতে গিয়েছিলাম।'

'কী করতে?'

'যতবার আপনি দড়ি ঘেঁষে মারার চেষ্টা করেছেন, ততবার বল দড়িতে লেগে ফিরে এসেছে। পিটসেনের বল একবারও দড়িতে লাগেনি দেখে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলাম।'

সামনে ঝুঁকল রানা। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। 'তারপর?'

'লক্ষ করলাম একদিকের খুঁটি থেকে দড়ির এক মাথা নেমে গিয়ে মাটিতে একটা বাক্সে ঢুকেছে।'

'হ্যাঁ, মাটির নীচে নিশ্চয় চাকা-টাকা আছে।'

হাসল নোভা। 'এখনও আপনি বুঝতে পারেননি। লক্ষ করলাম, ইনডোর কোর্টের একপাশে একটা ছোট স্টোররুম আছে। ওটার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি লি টনকিন সাহেব বসে আছেন একটা টেলিভিশনের সামনে।'

'টেলিভিশন?'

'হ্যাঁ, ক্লোজ সার্কিট টিভি। দুই নম্বর কোর্টের খেলাটা দেখা যাচ্ছিল ওটা দিয়ে।'

'তারপর?'

'কংক্রিটের দেয়ালে তামার একটা হ্যাণ্ডেল ওয়ালা চাকা বসানো। চাকায় একটা দড়ি পেঁচানো। হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে দড়ি টেনে আর ঢিল করে দুই নম্বর কোর্টের জালটাকে ওঠাচ্ছিল-নামাচ্ছিল লোকটা। এবার বুঝলেন, কেন আপনার বল আটকে যাচ্ছিল আর পিটসেনের বল পার হয়ে যাচ্ছিল?'

'ও, এই জন্যেই দুই নম্বর কোর্ট ছাড়া আর কোথাও খেলতে রাজি হয়নি পিটসেন। আমি বল মারলে জাল উঁচু করে দিচ্ছিল লি, পিটসেন মারলে নিচু করে ফেলছিল। তারপর?'

'দৌড়ে চলে গেলাম ওপরে। একজন পরিচিত লোককে খুঁজে বের করলাম—বেকহ্যাম। ওর সঙ্গে আমার বেশ খাতির আছে। মনে হলো, ক্লাবের স্টাফরা সবাই পিটসেনের এই শয়তানির কথা জানে—সেক্রেটারির কাছে অভিযোগ করে কোনও লাভ হবে না। বেকহ্যামকে স্টোররুমে পাঠালাম। লিকে বলা হলো, ও যে কাজ করছে, সেটা গর্হিত অপরাধ। এখুনি ওটা বন্ধ না করলে বেকহ্যাম দুই নম্বর কোর্টে গিয়ে পিটসেনের সামনে ওর শয়তানির কথা আপনার

ছে ফাঁস করে দেবে। স্টোররুম থেকে লিকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করল রকহ্যাম। ও নিজেও বেরিয়ে গেল।'

'আর আপনি?'

লজ্জিত হওয়ার ভান করল নোভা। 'লির চেয়ারে বসে খেলায় সমতা আনার চেষ্টা করলাম।'

হাসল রানা। 'এই কারণেই দড়িতে বাড়ি মেরে মেরে সঙ্কেত দিয়েও কোন লাভ হচ্ছিল না পিটসেনের। ওর নির্দেশ মানার লোক তখন স্টোররুমের বাইরে।'

'হ্যাঁ। তবে ও যখন বল মারছিল, দড়ি আমি বেশি উঁচু করিনি, খুব সামান্য। লি তো রীতিমত পুকুরচুরি করছিল।'

'আপনি দেখছি সাংঘাতিক মেয়ে, নোভা!'

'এখন তা হলে লাঞ্চে নিয়ে যাবেন তো?'

'না নিয়ে আর উপায় আছে? বুঝতে পারছি জেতা টাকার অর্ধেক না খসিয়ে ছাড়বেন না।'

'গুড,' স্টুল থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নোভা। 'চলুন, প্রথমে সেইন্ট চ্যাপেলে যাই। পেটুকদের আড্ডায় ঢোকার আগে ওটা দেখতে যাওয়াই নিয়ম। গেছেন কখনও?'

'না, ব্যস্ততার জন্যে সুযোগ পাইনি,' রানা জবাব দিল।

'ঠিক আছে। আমি গাড়ি নিয়ে আসি। সিঁড়িতে দেখা হবে।'

সেইন্ট চ্যাপেলের বাইরে উইকএণ্ডে বেড়াতে আসা দর্শকদের ছোট্ট লাইন। দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর ভিতরে ঢোকার সুযোগ পেল রানা ও নোভা। গ্রাউণ্ড ফ্লোরের মস্ত হলঘরটা বৈচিত্র্যহীন। বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে সুভেনিয়ার স্টল।

'এখানে দেখার কিছু নেই,' নোভা বলল।

'হুঁ, সাধারণ একটা বাজার। দেখার জিনিস কোথায়?'

'আসুন আমার সঙ্গে।' বলে আগে আগে হাঁটতে লাগল নোভা। হল পেরিয়ে এসে পাথরের একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ও। পিছনে রানা।

ওপরতলার হলঘরটাতে ঢুকে চমকে গেল রানা। আগুন জ্বলছে যেন। চারপাশে রঙিন কাঁচ লাগানো। ওগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটার সময় দেহের রঙ বদলে বদলে যায়।

'আরে! দারুণ তো!' বিড়বিড় করল রানা।

হেসে ওর হাত ধরল নোভা। 'হয়েছে, আজকের মত আপনার নিয়মরক্ষা শেষ। এবার খেতে যাব, এই এলাকার সবচেয়ে নামীদামি রেস্টুরেন্টে। এখান

থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা। গাড়ি রেখে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাব।'

ইল স্যাঁ লুই'র যে রেস্টুরেন্টটা বাছাই করেছে ও, সেইন নদীর পাড়ে লম্বা একটা গ্যালারির মত করে তৈরি হয়েছে সেটা। টেবিলগুলোর পাশেই ফুটপাথ, তার ওপাশে নদী।

ওরা ঢুকতেই মেইত্র দোথেল [স্টুয়ার্ড] এসে স্বাগত জানাল। রানার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল নোভা, 'খেলাটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে বোঝার পর পরই এখানে ফোন করে টেবিল বুক করে রেখেছিলাম। নইলে সিট পাওয়া যেত না। উইকএণ্ডে এখানে প্রচণ্ড ভিড় হয়।'

মেইত্র মনে হচ্ছে নোভার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না, পথ দেখিয়ে একটা টেবিলের কাছে নিয়ে এল ওদের। এখান থেকে নদী এবং নদীর ওপারের তীরটা স্পষ্ট চোখে পড়ে।

'শেলফিশ পছন্দ আপনার?' নোভা জিজ্ঞেস করল। 'এখানে খুব ভাল রাঁধে ওরা। গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া, আরও নানারকম কাঁটাছাড়া ভোঁতামুখো মাছ, দেখলে লি টনকিনের কথা মনে পড়ে যায়... এখানকার ম্যায়োনেজটাও চমৎকার। গোটা প্যারিসের মধ্যে সেরা। অর্ডার দেয়ার ভারটা আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। ভরসা দিতে পারি, হতাশ হবেন না।'

'ভরসা রাখতে বলছেন? আপনার ওপর?... আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার কোনও আপত্তি নেই,' রানা বলল। 'খেতে খেতে কাজের কথাও হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

টেনিস খেলায় প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে, খিদে পেয়েছে রানার। এক বোতল ডম পেরিগনন আর কিছু জলপাই এনে রাখল ওয়েইটার। গ্লাস তুলে নিয়ে উইশ করল রানা, তারপর চুমুক দিল। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঠাণ্ডা বুদবুদগুলো হিসহিস শব্দ তুলে নেমে গেল গলা দিয়ে।

'বলুন, নোভা। ড. পিটসেনের ব্যাপারে সব শুনতে চাই আমি।'

'ওর কথা প্রথম শুনেছি বাবার মুখে,' নোভা বলল। একটা চিংড়ির লেজ টিপে ধরে ভিতরের মাংসটা দাঁতে চেপে খোসা থেকে টেনে খুলে আনল ও। 'আমার দাদার-বাবা ইংল্যাণ্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন রেভল্যুশনের সময়। সেইন্ট পিটার্সবার্গে একটা এস্টেট ছিল তাঁর, মস্কোতে একটা বাড়ি। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি। অনেক চালাকি করে কিছু টাকা রাশার বাইরে পাচার করতে পেরেছিলেন, একটা বাড়ি কিনেছিলেন কেমব্রিজের কাছে। রাশা থেকে যখন পালায় পরিবারটা, আমার দাদা তখন খুবই ছোট, জন্মভূমির কথা ভাল করে মনেই নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করেছেন, তারপর কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। আমার বাবা জন্মেছে পুরোপুরি ইংরেজি বুলি মুখে নিয়ে।

কেমব্রিজের কাছে একটা কলেজ থেকে ফেলোশিপ নিয়েছে, এখন অক্সফোর্ডে ইকনমিক্স পড়ায়। ওই কলেজেই বাবার ছাত্র ছিল পিটসেন।'

'হুঁ, তা হলে আপনার বাবা...'

'আচ্ছা, এই আপনি-আপনিটা আর ভাল লাগছে না। এটা বাদ দেয়া যায় না?'

'আমিও সেকথাই ভাবছিলাম। *মিস্টার রানা* শুনতেও আর ভাল লাগছে না আমার, বিশেষ করে আপনার মুখ থেকে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তোমার বাবা পিটসেনকে পড়িয়েছেন?'

'হ্যাঁ। যদিও শেখানোর তেমন কিছুই পেত না—বাবা অবশ্য সেটা স্বীকার করে না—আগে থেকেই সব জেনে বসে থাকত পিটসেন।'

'খুব বুদ্ধিমান ছাত্র?'

'বাবার মতে অক্সফোর্ডের সর্বকালের সবচেয়ে ভাল ছাত্র। বাবা ওকে পছন্দ করত। কিন্তু যখন কোনও গোলমাল বাধলেই বাবাকে দায়ী করতে আরম্ভ করল ও, তখনই শুরু সমস্যাটার।'

'কীসের গোলমাল?'

'ওর আচরণে নাকি ক্ষুব্ধ হতো সবাই। ভাল ইংরেজি বলতে পারলেও কথায় বলটিক টান থাকায় শুনতে ভাল লাগে না, কেমন কানে পীড়া দেয়... তার ওপর ওর ওই হাত। তবে ওসব সয়ে নিয়েছিল ওর সহপাঠীরা, বরং এক ধরনের মমতাবোধই তৈরি হয়েছিল ওর প্রতি। কিন্তু ওর আচরণ ভাল ছিল না। আর, কোনও প্রয়োজন না থাকলেও পরীক্ষায় নকল করত।'

'তারমানে অল্প বয়েস থেকেই ওর স্বভাব খারাপ।'

'হ্যাঁ, সব সময়ই জিততে চাইত। জানত, ভাল ভাবেই পাস করবে, তারপরেও ঝুঁকি নিত না।'

ওয়েইটারকে আসতে দেখে থেমে গেল নোভা। টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে, এঁটো প্লেটগুলো হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

'এবার ফ্রাই খেতে হবে,' রানাকে বলল নোভা। 'ওয়াইনের অর্ডার দেব?'

'দাও।' বুক পকেটে রাখা পিটসেনের দেয়া নোটভর্তি খামটায় চাপড় দিল রানা। 'নো চিন্তা।'

সিগারেট ধরাল নোভা। লাল গদিওয়ালা সিটের ওপর এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে দিল। উঁচু একটা বিল্ডিঙের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। চোখে আর রোদ লাগছে না দেখে সানগ্লাসটা ঠেলে তুলে দিলে কপালে। হঠাৎ করেই যেন বয়েস আরও কমে গেল ওর। ওর গাঢ় বাদামি চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

'পিটসেনের মনে হতে থাকল, কেউ ওকে দেখতে পারে না, ওকে পছন্দ করে না,' ওয়েইটার চলে গেলে নোভা বলল। 'জেনোফোবিয়া, অর্থাৎ বিদেশীদের সম্পর্কে অহেতুক ভয় ও ঘৃণা তৈরি হলো ওর। অক্সফোর্ডকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না ভেবে ইংরেজদের অভিজাত একটা ক্লাব ধরে নিল ও। ওর ধারণা হলো, ইচ্ছে করেই ওর সঙ্গে মিশতে চায় না কেউ। দু'একজন খারাপ ছেলে যে ছিল না তা নয়—সব জায়গাতেই এমন থাকে, কিন্তু ওর সহপাঠীরা বেশিরভাগই খুব ভাল ছিল—বাবা বলেছে। ওর সঙ্গে খুব ভদ্র আচরণ করত, আন্তরিকভাবেই সহানুভূতি দেখিয়ে মিশতে চাইত। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না পিটসেন। নিজের দোষটা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ওদের ঘৃণা করতে লাগল, ভয়ানক ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে উঠল। শেষদিকে তো খোলাখুলিই বলতে আরম্ভ করেছিল, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করে দেবে।

'বাবা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষকদের মাঝে বাবাই একমাত্র শিক্ষক, যার সঙ্গে বাড়িতে এসে মাঝেসাঝে দেখা করত পিটসেন। একদিন আমাদের বাড়িতে ওকে ডিনারের দাওয়াত দিল বাবা। আর সেদিনই সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসল।'

হাতের কাঁটা ও ছুরি নামিয়ে রাখল রানা। 'কী করেছিলেন?'

'ওর হাতের কথা জিজ্ঞেস করে বসেছিল। আসলে, আরেকজনের কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল, এ রকম হাত থাকে, জন্ম থেকেই হয়, এ নিয়ে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।'

ওয়েইটার এসে খাবারের প্লেট আর ওয়াইনের বোতল নামিয়ে রেখে চলে গেল।

বোতল থেকে গ্লাসে ওয়াইন ঢালতে শুরু করল রানা। 'পিটসেন কী বলল?'

'এমন রাগা রাগল ও,' নোভা বলল, 'আর খেতে পারল না। লাফিয়ে উঠে চলে গেল। সেদিন থেকে বাঁ হাতে লম্বা দস্তানা পরা শুরু করল ও। বাবাকে ইংরেজদের চেয়েও বেশি ঘৃণা করতে শুরু করল। ওর প্রচণ্ড ঘৃণার তালিকায় যুক্ত হলো আরেকটা নাম, ল্যাপটেভ পরিবার।'

নিজের গ্লাসটা তুলে নিল নোভা। 'বহু বছর পর একদিন নিনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। সুযোগটা কাজে লাগাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না ও। আটক করল নিনাকে।'

সেইনের দিকে চোখ ফেরাল রানা। বেশ কয়েকটা প্লেযার বোট চলছে নদীতে, কোন কোনওটা তীরে ভিড়ে যাত্রী নামিয়ে নতুন যাত্রী তুলছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় টুরিস্ট বোটটার নাম 'অ্যামাযন', মিসিসিপি থেকে আসা একটা প্যাডল স্টিমার। ওটার ব্যানারে লেখা রয়েছে, আমেরিকান কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে এক

...সের জন্য প্যারিস শহরে চালানোর জন্য আনা হয়েছে ওটাকে।

আবার নোভার দিকে চোখ ফেরাল রানা। 'নিনার কথা বলো।'

'নিনা...' এক টুকরো পনির কেটে রানার প্লেটে তুলে দিল নোভা। 'নিনা... হয়ে, ও দেখতে ঠিক আমার মত নয়... বয়েস আরও কম মনে হয়... পড়ালেখায় মন ছিল না...'

'তারমানে তোমার মত নয়।'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ স্কুলে পড়তে?'

'রোডিয়ান। পরে অক্সফোর্ডে গেছি।'

'আর নিশ্চয় ওখান থেকেই ফার্স্ট-ক্লাস ডিগ্রি নিয়েছ, পিটসেনের মত।'

সামান্য লাল হলো নোভা। 'ইউনিভার্সিটিতে যায়নি নিনা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে লণ্ডনে চলে গিয়েছিল, গা ভাসিয়ে দিয়েছিল তথাকথিত *ফাস্ট* ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ঘন ঘন পার্টিতে যেত। কী কারণে জানি না, এয়ার হোস্টেস হতে চাইল। ব্যাপারটাকে হয়তো গ্ল্যামারাস মনে করেছিল। আকাশে ওড়াটাকে এখনও মানুষ অন্য চোখে দেখে। আর হয়তো সে কারণেই পারিবারিক ঐতিহ্য অ্যাকাডেমিক শিক্ষাকে অবহেলা করেছিল; ধরতে গেলে বিদ্রোহই করেছিল শিক্ষার বিরুদ্ধে। আমার মা র‍্যাডক্লিফ হাসপাতালের একজন কনসালটেন্ট। মা-ও চেয়েছিল, আমরা দুই বোন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হই। যাই হোক, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এ যোগ দিল নিনা, তিন বছর চাকরি করল, এক পাইলটের প্রেমে পড়ে ওকে বিয়ে করল। ওই পাইলট সব সময় ওকে ছেড়ে চলে যাবার হুমকি দিত, কিন্তু যায়নি কখনও। ভীষণ অসুখী ছিল ওখানে নিনা। শেষে স্বামীর সঙ্গে মরক্কোতে গিয়ে থাকার সময় এমনই অবস্থা হলো, ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ল ও। প্রথমে খুব সামান্য। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল সেটা। ও বলত মজা করার জন্যে ড্রাগ নেয়, কিন্তু আমার ধারণা মানসিক অশান্তির কারণে এ কাজ করত। এ সময় হঠাৎ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর ওপর বিরক্ত হয়ে, একটা কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে ওকে নিয়ে ওর স্বামী প্যারিসে গেল পিটসেনের সঙ্গে দেখা করতে। পিটসেন ওর একটা প্রাইভেট প্লেনের জন্যে পাইলট খুঁজছিল। কথা বলার সময় খোঁজখবর নিতে নিতে এক সময় নিনার কথা জেনে গেল পিটসেন, কার মেয়ে জানল। সুযোগটা লুফে নিতে দেরি করল না ও, নিনার স্বামীকে বলল ওকে চাকরি দিতে পারবে না, তবে নিনার একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। মোটা মাইনে দেবে, প্রচুর বেড়ানো আর ছুটিছাটার ব্যবস্থা থাকবে, পোশাক, জুতো, সবই দেবে।'

'আর কিছু?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। আর একটা জিনিস।' ঠোঁট কামড়ে ধরল নোভা। 'ওকে ড্রাগ দেবে বলল পিটসেন।'

'নেশার প্রলোভন?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে।' নোভার চোখের কোণে পানি টলমল করছে। 'ওকে বলল, যত খুশি মাদক দিতে পারবে নিনাকে, উন্নত মানের জিনিস, রাস্তাঘাটে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেগুলোর মত বিষ-টিষ মেশানো থাকবে না তাতে। বিনা দ্বিধায় পিটসেনের ফাঁদে পা দিয়ে বসল নিনা।' এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল নোভার চোখের কোণ থেকে। রুমাল দিয়ে মুছল।

সবশেষে আনারস আর ক্রিম নিয়ে এল ওয়েইটার।

'তো, নোভা,' ওয়েইটার চলে গেলে রানা বলল, 'যদি ওকে খুঁজে পাই, আসতে রাজি হবে? নাকি ড্রাগের লোভে ইচ্ছে করেই পিটসেনের কেনা বাঁদিতে পরিণত হয়েছে ও?'

'দুই বছর ওর সঙ্গে দেখা হয় না, কাজেই কী ঘটেছে কিছুই জানি না। টেলিফোনে মাঝেসাঝে কথা হয়, তবে সেটা খুবই কম। শেষ কথা হয়েছে গত পরশু, তেহরানের একটা পোস্ট অফিস থেকে করেছিল।'

'তেহরান?'

'হ্যাঁ। ওখানে ব্যবসা আছে পিটসেনের। লোক দেখানো ব্যাপার হতে পারে ওটা, ব্যবসার আড়ালে হয়তো চলছে বিপুল হারে মাদক পাচার। জানি না। নিনা আমাকে যা বলল: মিথ্যে কথা বলে কোনমতে পিটসেনের কাছ থেকে সরে এসে ফোনটা করেছে। মাদকের নেশা থেকে বাঁচতে চাইছে এখন। কাজটা খুবই কঠিন, জানি। তবে আপনি যদি ওকে উদ্ধার করে আনতে পারেন, ক্লিনিকে ভর্তি করে দেব। সমস্যাটা হলো, পিটসেন কিছুতেই ছাড়বে না ওকে। ধীরে ধীরে ওকে খুন করছে লোকটা, আর এটা করতে গিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে রানা বলল, 'কেঁদো না, নোভা। আমি ওকে খুঁজে বের করব।'

শেষ এক কাপ কফি খাওয়ার পর রানাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে চলল নোভা। ওকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে।

'কোনও খোঁজ পেলে জানাবে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল নোভা। কাত হয়ে এসে চুমু খেল রানার গালে। সানগ্লাস পরা কালো কাঁচের আড়ালে ওর কেঁদে ফোলানো চোখ দুটো এখন আর দেখতে পাচ্ছে না রানা। গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের দিকে এগোল।

সদর দরজায় উঠে ফিরে তাকাল হাত নাড়ার জন্য। কিন্তু গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেছে নোভা। মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি, একটু খুঁতখুঁতে ভাব হয়ে গেছে রানার, ঠিক বুঝতে পারছে না। আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ঢুকে পড়ল হোটেলের ম্লান আলোকিত লবিতে।

'মঁসিয়ে রানা,' রিসেপশনিস্ট বলল, 'আপনার একটা মেসেজ আছে। লণ্ডন থেকে টেলিফোনে এসেছে মেসেজটা।'

এক টুকরো কাগজ রানার দিকে বাড়িয়ে দিল ও। পেন্সিল দিয়ে লিখেছে। মিস্টার লংফেলোর পাঠানো, সাঙ্কেতিক কথাগুলো একবার পড়েই বুঝতে পারল রানা। আরেকবার পড়ল মনোযোগ দিয়ে :

দেরি না করে পিস্টাচিওতে চলে যাও। জানা গেছে, ওখানে ক্যাভিয়ারের বিক্রি এখন তুঙ্গে। স্থানীয় এজেন্ট তোমার অপেক্ষায় রয়েছে।

ঘরে ফিরে এল রানা। দ্রুত সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে রিসেপশনে ফোন করে এয়ারপোর্টের লাইন দিতে অনুরোধ করল। *পিস্টাচিও* মানে পার্শিয়া—অর্থাৎ ইরান, *ক্যাভিয়ার* মানে ড্রাগ। আর এসবের সঙ্গে নিশ্চয় যুক্ত হয়েছে ড. অ্যালফ্রেড পিটসেন, ভাবছে রানা। আহ্, সোনায় সোহাগা!

সাত

নাক নিচু করেছে প্লেন, নামছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। দূরে, বাঁয়ে দেখা যাচ্ছে অ্যালবুর্জ পর্বতের চূড়া। তার ওপাশে হালকা একটা কালো দাগের মত দেখা যায়, ক্যাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীর।

ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আবু হাশিমের কথা ভাবছে ও। স্থানীয় লোক। একইসঙ্গে ব্রিটিশ নাগরিকত্বও রয়েছে। প্রভাবশালী। ব্যবসায়ী, প্রচুর টাকার মালিক। ইরানে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান। লণ্ডনের বিএসএস অফিস থেকে রানাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তেহরানে আবু হাশিম ওকে সব রকম সহযোগিতা করবে। প্লেনের পেট থেকে ল্যাণ্ডিং গিয়ার খুলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। তারপর বহুবার দেখা দৃশ্য আরও একবার দেখল রানা: টেলিফোনের তার, গুবরে পোকার মত জড় হয়ে থাকা অসংখ্য গাড়ি, নিচু টার্মিনাল ভবন, তারপর হঠাৎ করেই চোখের সামনে লাফিয়ে উঠে আসা কংক্রিটের রানওয়ে। প্লেনটাকে নিখুঁতভাবে ল্যাণ্ড করাল দক্ষ পাইলট।

প্লেনের খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়াতেই মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ যেন ঘুসি

মারল রানাকে। বাইরে এসে ট্যাক্সিতে চড়ে অভিজাত এলাকার সবচেয়ে দামি হোটেলে যেতে বলল। এয়ার-কণ্ডিশনড হোটেলে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওর ঘরটা বারো তলায়। দু'পাশে বড় বড় জানালা। একটা দিয়ে শহরের বাড়িঘর চোখে পড়ে, আরেকটা দিয়ে পর্বত। চূড়ার কাছে বরফ জমে থাকতে দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না, এই পর্বতের উপত্যকায় এত গরম।

ঘরে গোপন মাইক্রোফোন কিংবা ক্যামেরা লুকানো আছে কি না ভালমত দেখে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল ও। অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে থেকে ধুয়ে ফেলল ভ্রমণের সমস্ত ক্লান্তি আর ময়লা। একটা তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোল। রুম সার্ভিসকে ডেকে ভাজা ডিম ও কফি দিতে বলল। রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই বেজে উঠল আবার। তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। 'বলুন?'

'আমি আবু হাশিম। কেমন হলো আপনার জার্নি?'

'বৈচিত্র্যহীন।'

হাসল হাশিম। 'মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যহীনতা আমার পছন্দ, তবে সেটা শুধু অ্যারোপ্লেনে। এয়ারপোর্টে যেতে পারিনি, সরি। ওই একটা জায়গায় খোলাখুলি দেখা করতে চাই না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গাড়ি পাঠাচ্ছি, যদি বলেন। তারপর তেহরানের সবচেয়ে ভাল ডিনার খাওয়াব আপনাকে। ক্লান্ত নন নিশ্চয়? তা হলে, প্রথমে আমার বাড়িতে চলে আসুন। সামান্য ক্যাভিয়ার দিয়ে শুরু করুন, আজ সকালেই দিয়ে গেছে, একেবারে তাজা, ক্যাস্পিয়ান থেকে এসেছে। আপনার ভাল লাগবে। আসবেন?' মোটা, ভারি গলা হাশিমের। আন্তরিক হাসিটা উপেক্ষা করা যায় না।

'তৈরি হতে আধঘণ্টা লাগবে আমার,' রানা বলল।

ডিম আর কফি শেষ করে কাপড় পরল ও। সাদা শার্ট, ঢোলা সুতির ট্রাউজার আর কালো মোকাসিন।

হোটেলের বাইরে এসে দেখে একটা নীল মার্সিডিজ গাড়ি অপেক্ষা করছে। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে চওড়া হাসি দিল ছোটখাট একজন মানুষ। 'আমি ইয়াকুব, হাশিম সারের ড্রাইভার।' পিছনের দরজা খুলে দিয়ে উঠতে অনুরোধ করল রানাকে।

হোটেলের আঙিনা থেকে বুলেটের মত ছুটে বেরোল গাড়িটা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা, ইয়াকুব?'

'শেমিরান। তেহরানের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা। খুব সুন্দর। আপনার পছন্দ হবে।'

পর পর দুটো ট্রাককে ঝড়ের বেগে ওভারটেক করল গাড়ি।

'হুঁ,' রানা বলল, 'যদি বেঁচে থাকি!'

'বেঁচে তো থাকবই,' হেসে বলল ইয়াকুব।

বিশ মিনিট উন্মাদের মত ছোটার পর হঠাৎ বাঁয়ে মোড় নিয়ে নির্জন একটা রাস্তা ধরে এগোল ও। দুই পাশে গাছের সারি। সেটা থেকে একটা অ্যাসফল্টে তৈরি ড্রাইভওয়েতে ঢুকল। দু'ধারে সবুজ লন। রাস্তার শেষে সদ্য রং করা সুন্দর একটা বাড়ির সাদা থামওয়ালা পোর্টিকো।

সিঁড়ি বেয়ে সামনের দরজার কাছে উঠে এল রানা। ও দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই খুলে গেল সেটা। দুই হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এল দামি পোশাক পরা ছয় ফুট লম্বা এক ভদ্রলোক, দুই পাশের জুলফিতে পাক ধরেছে। 'আরে আসুন, আসুন, মিস্টার রানা। কিংবদন্তীর নায়ককে কোনও দিন আমার বাড়িতে দেখতে পাব, স্বপ্নেও ভাবিনি।'

রানাকে স্বাগত জানিয়ে ঘরে নিয়ে এল হাশিম। লম্বা, কাঠের মেঝেওয়ালা হলঘর পার করিয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে একটা বড় বাগানে নিয়ে এল। গাছপালায় ছাওয়া। ছোটখাট একটা পুকুর তৈরি করা হয়েছে বাগানের ভিতর। পুকুরপাড়ে রাখা গদিওয়ালা চেয়ার দেখিয়ে রানাকে বলল, 'বসুন। রাস্তার চেয়ে এ জায়গাটা অনেক ঠাণ্ডা, তাই না? তো, কী খাবেন, বলুন। ক্যাভিয়ার আনতে বলি?'

রানা হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই টেবিলে রাখা একটা ছোট পিতলের ঘণ্টা বাজাল সে। ঘর থেকে বেরোল একজন ইরানী পোশাক পরা তরুণ। 'হাবিব, ইনিই আমাদের মেহমান, যাঁর কথা তোমাকে বলেছিলাম। নাও, তোমার কাজ শুরু করো।'

হাত তুলে হাসিমুখে রানাকে সালাম দিল হাবিব। তারপর তাড়াহুড়ো করে চলে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড পর বরফ দেয়া বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে চারপাশে তাকাল রানা। বাড়ির পিছনে বেড়া তৈরি করেছে উঁচু-উঁচু সাইপ্রেস গাছ, সামনে বিশাল গোলাপঝাড়, বেশির ভাগ ফুলই কালো ও হলুদ রঙের।

'এখানে বাগান আমাদের কাছে খুব জরুরি জিনিস,' হাশিম বলল। 'আর পানি তো বিরাট ব্যাপার, এ রকম শুকনো এলাকায়।'

'আপনার বাগানটা সত্যি সুন্দর,' রানা বলল।

'থ্যাংক ইউ।' হাসল হাশিম। হালকা সৌজন্য বিনিময় শেষে বিয়ারের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে সামনে ঝুঁকল। 'এখন শোনা যাক, আপনার জন্যে কী করতে পারি।'

রুপার ডিশে করে ক্যাভিয়ার রেখে গেল হাবিব। ড. অ্যালফ্রেড পিটসেনের কথা হাশিমকে বলল রানা।

চামচ দিয়ে ডিশ থেকে খানিকটা ক্যাভিয়ার তুলে নিল হাশিম। তাতে লেবুর রস চিপে দিল। হাতে বানানো চাপাতি রুটি ছিঁড়ে সেটা দিয়ে ক্যাভিয়ার মুড়ে নিয়ে মুখে পুরল। চিবাতে চিবাতে বলল, 'লোকটার নাম আমি শুনেছি, মিস্টার রানা। কাসকাই গোত্রের লোক আমি, আমার পূর্বপুরুষরা ছিল মরুভূমির যোদ্ধা, ভয় কাকে বলে জানা ছিল না তাদের। আমিও সহজে ভয় পাই না, কিন্তু এই পিটসেন লোকটাকে ভয় করি। এ কী, আপনি খাচ্ছেন না?'

এক চামচ খেয়ে দেখেছে রানা। তেমন ভাল না লাগায় বন্ধ করেছে খাওয়া। 'খেলাম তো।'

হাসল হাশিম। 'হুঁ, আপনার ভাল লাগেনি, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, চলুন, বলেছি না, দুনিয়ার সেরা ডিনার খাওয়াব আপনাকে।' হাবিবকে ডেকে গাড়ি রেডি করতে বলল ও। রানাকে বলল, 'তেহরানের সবচেয়ে ভাল রেস্টুরেন্টে আমাদেরকে নিয়ে যাবে ইয়াকুব। খাওয়াটাই তো জীবন, সেই সঙ্গে মেয়েমানুষ আর মদ। হাফিজের একটা কবিতা শোনাই...'

'গাড়ি রেডিই আছে, সার,' পিছন থেকে বলল হাবিব।

'উঁহ-হুঁ, দিলে তো সব নষ্ট করে,' হাশিম বলল। 'তোমার মধ্যে রসবোধ বলতে কিচ্ছু নেই, হাবিব। কতবার বলেছি আমি যখন কবিতার কথা বলি, আমাকে ডিসটার্ব করবে না। চলুন, মিস্টার রানা, চারপাশে এত বেরসিক মানুষ থাকলে কাব্যচর্চা হবে না। কোথাও কী আর শান্তি আছে! এখন পড়তে হবে খেপা ড্রাইভারের পাল্লায়। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে আপনার?'

'পেয়েছে।' সত্যি কথাটাই বলল রানা, প্যারিস এয়ারপোর্ট থেকে রওনা দেয়ার পর আর তেমন ভারি কিছু পেটে পড়েনি।

অপেক্ষা করছিল ইয়াকুব। রানা আর হাশিম গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে চলল উত্তরে। যানবাহনের ভিড়ের ভিতর দিয়ে এমন উন্মাদের মত ছুটল, মনে হচ্ছে যেন এটাই ওর জীবনের শেষ যাত্রা, সময়মত পৌঁছাতে না পারলে জীবনের শেষ খাওয়াটা খেতে পারবে না।

হাশিম ওদিকে বকবক করেই চলেছে। আচমকা সামনে ঝুঁকে ফার্সিতে দ্রুত নির্দেশ দিল ও। টায়ারের আর্তনাদ তুলে সাঁই সাঁই করে পাক খেল গাড়ি। একটা সাইড রোডে পড়ে আবার ছুটতে থাকল।

'মাপ করবেন, মিস্টার রানা,' হাশিম বলল, 'আমি বোধহয় বেশি কথা বলছি। আসলে, পিটসেনের কথা শোনার আগে এই দেশটা সম্পর্কে ভালমত জানা দরকার আপনার, তাতে সুবিধে হবে।'

'না না, এতে মাপ করার কী হলো। তবে এই আচমকা রাস্তা বদলানো কেন?'

'অতিরিক্ত কথা বলতে গিয়ে রাস্তার দিকে মনোযোগ দিতে পারিনি। কালো একটা আমেরিকান ওল্ডসমোবাইল বোধহয় আমাদের পিছু নিয়েছে। ওটাকে খসাতে বললাম ইয়াকুবকে।'

'আর তাতে নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছে ও?'

'গাড়ি চালাতে ভালবাসে ইয়াকুব, মিস্টার রানা। আর টেক্কা দেয়ার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই। মূল শহর থেকে সরে এসেছি আমরা এখন। এত দক্ষিণে বিদেশীরা সাধারণত আসে না। নতুন শহর। পতিতালয়, শুঁড়িখানা আর জুয়ার আড্ডায় ভর্তি এদিকটা। আরও দক্ষিণে রয়েছে বস্তি। তেহরানের সবচেয়ে গরীব মানুষরা থাকে ওখানে। জঘন্য আবর্জনার মধ্যে বাস করে যারা, তাদের মধ্যে আছে কিছু আরব, তবে বেশির ভাগই আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থী। এই যে, এসে গেছি আমরা।'

এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী অতিথিকে আগে যেতে হয়, তাই রানাকে ওর আগে থাকতে বলল হাশিম। যেখানে নামল ওরা, জায়গাটাকে একটা কার্পেটের দোকানের মত লাগল রানার কাছে। নিচু দরজার ওপর একটা লাল বাল্‌ব্ জ্বলছে দরজার ঠিক ওপাশেই বেঞ্চে বসে হুঁকো টানছে এক বুড়ো।

দ্বিধা করছে রানা। ওর কাঁধে হাত রেখে হাশিম বলল, 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, মিস্টার রানা।'

মাথা নুইয়ে ভিতরে যাবার আগে একবার ফিরে তাকাল রানা। চোখের কোণ দিয়ে কালো একটা ওল্ডসমোবাইল গাড়ি থামতে দেখল রাস্তার অন্য পারে। দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হেডলাইট নিভিয়ে দিল গাড়িটা।

রানা বুঝল, গাড়িটাকে খসাতে পারেনি ইয়াকুবের মত খেপা ড্রাইভারও।

আট

মাটির নীচের, মোমের আলোয় আলোকিত মস্ত একটা ঘরে ঢুকল রানা। দেয়ালে লাগানো লোহার মোমদানিতে বসানো রয়েছে অসংখ্য মোম। পথ দেখিয়ে একটা টেবিলের কাছে নিয়ে আসা হলো ওদের। তাতে আগে থেকেই একটা ট্রে-তে রাখা আছে বড় একটা বাটি ভর্তি পেস্তা, আতাফল ও আখরোট, সেই সঙ্গে এক বোতল শিভাস রিগাল ও দুই জগ বরফ দেয়া পানি। কোন মেনু নেই। চারজন বাদক একটা কার্পেট বিছানো নিচু বেদিতে বসে মোলায়েম সুরে বাজনা বাজাচ্ছে। ঘরে আরও গোটা বারো টেবিল রয়েছে, সেগুলোও ভর্তি।

গ্লাসে উইস্কি ঢালতে ঢালতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল হাশিম। একজন ওয়েইট্রেস ট্রেতে করে অনেকগুলো বাটি আর প্লেট নিয়ে এল। তাতে রয়েছে চাপাতি রুটি, দই, সালাদ, আর তাজা পুদিনা, মৌরী, ধনেপাতা এসব দিয়ে বানানো চাটনি। প্রথমে সেগুলো নামিয়ে রাখল ওয়েইট্রেস। তারপর ঢাকনা দেয়া বড় একটা সুপের পাত্র রাখল টেবিলের মাঝখানে। রানা ও হাশিমের সামনে দুটো বাটি রেখে গোল বড় চামচ দিয়ে সুপ তুলে দিতে লাগল।

'ভেড়ার পা আর মাথার সুপ,' হাশিম বলল রানাকে।

চমৎকার সুগন্ধ ছাড়ছে, কোনরকম আঁশটে গন্ধ কিংবা চর্বির আঠা নেই।

'এর মধ্যে সামান্য *টরশি* মিশিয়ে নিন,' আচারের বাটিটা রানার দিকে ঠেলে দিল হাশিম। 'ভাল লাগবে।'

এক চামচ সুপ মুখে দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, ভাল।'

'আর ওয়েইট্রেস?' মেয়েটা নিশ্চয় ফার্সি ছাড়া অন্য কোন ভাষা বোঝে না তাই ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল হাশিম।

'হ্যাঁ, সুন্দরী।'

'বাইরের দেশ থেকে আসা কিছু কিছু মানুষের এখনও ধারণা, ইরানী মহিলারা নিজেদের বোরকা দিয়ে মুড়ে রাখে।'

আবার খাবারের ট্রে হাতে ফিরে এল কালো চুলওয়ালা সুন্দরী ওয়েইট্রেস। এবার নিয়ে এসেছে একটা লোহার প্যান, চুলা থেকে তুলে সরাসরি, তাতে রাখা প্রচুর মশলা ও তেঁতুল মিশিয়ে রান্না করা বড় বড় চিংড়িগুলো থেকে এখনও চড়চড় শব্দ বেরোচ্ছে। চিংড়ির পর এল বড় মাটির ডিশে করে পোলাও, ওপরে কমলা, সবুজ, সাদা আর লালের আস্তর। পাহাড়ের চূড়ার মত চোখা করে রাখা ওপরটা দেখে মনে হয় লাভা উদ্গীরণ করছে আগ্নেয়গিরি। মাটির নীচের এই প্রায় অন্ধকার করে রাখা ঘরটাতে এত চমকপ্রদ উজ্জ্বল রঙ কীভাবে ফুটিয়েছে, সেটা সত্যিই বিস্ময়কর।

'জাভাহের পোলাও,' হাশিম বলল। 'জুয়েলড রাইস। ওপরের রঙের স্তরটা তৈরি করেছে কমলার খোসা, জাফরান আর খোদাই জানে কী কী দিয়ে। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমনি মজা। *নুস-এ জান!*

'তা তো বুঝলাম,' রানা বলল। 'কিন্তু, হাশিম, এখন কি দয়া করে পিটসেনের কথা কিছু বলা যায়? যেমন ধরা যাক, ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হয়ে গেল হাশিম। 'ওকে খোঁজার দরকার নেই আপনার, মিস্টার রানা। আমার যতদূর বিশ্বাস, সময় হলে ও-ই আপনাকে খুঁজে নেবে। সবখানে কিলবিল করছে ওর স্পাই। আমাদের পিছু নিয়েছে যে গাড়িটা, সেটা যদি ওর হয়ে থাকে, অবাক হব না। তেহরানে ওর একটা অফিস আছে,

ফার্মাসিউটিকাল ব্যবসার সাইনবোর্ড লাগানো। ফেরদৌসী স্কয়্যারের কাছে। ক্যাস্পিয়ান সাগরের কিনারে, নশাহ্‌র্‌-এর রিযোর্ট এলাকায়ও কিছু একটা করছে ও। কিন্তু ওখানে ওর ধারে-কাছে ঘেঁষা কঠিন। আমার ধারণা বোট-বিল্ডিং ইয়ার্ডের আড়ালে অবৈধ কোনও কাজ করছে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে নশাহ্‌রে চলে যায় তেহ্‌রানের ধনী লোকেরা। বাণিজ্যিক কাজকর্মও হয় ওখানে, বিশেষ করে ডক এলাকায়। তবে পিটসেনের আসল ঘাঁটি মরুভূমিতে, মরুভূমির মাঝখানে কোথাও।'

'আপনি জানেন কোথায়?' রানা জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল হাশিম। 'আমি কেন, কেউই জানে না। ওর পিছু নিয়ে খোঁজ বের করা বড় কঠিন। ছোট ছোট দুটো প্রাইভেট প্লেন আছে ওর, আর একটা হেলিকপ্টার। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় চারজনের একটা দল পাঠিয়েছিল মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্ত বাম-এ। কোথাও কোন গোপন ঘাঁটি থাকলে সেগুলোর ছবি তুলে আনার কথা ছিল ওদের।'

'তারপর?'

'কিছুই আসেনি।'

'মানুষগুলোও না?'

'না। ও হ্যাঁ, একটা জিনিস এসেছিল। একটা পার্সেল। তেহ্‌রানের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। বাম থেকে পোস্ট করা হয়েছিল প্যাকেটটা। তাতে ছিল চারটে টেনে ছেঁড়া জিভ।'

'বাহ্‌, দারুণ!' তিক্ত শোনাল রানার কথা।

'সত্যিই তাই। কারও চরিত্র বোঝাতে যথেষ্ট।'

ফিরে এল ওয়েইট্রেস। খাবারের এঁটো প্লেটগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর প্রচুর ঝাল দেয়া বেগুন ও টম্যাটোর ভর্তা নিয়ে এল। তারপর ডিম্বাকৃতি পাত্রে করে আনল মিষ্টি ও টক দিয়ে রান্না করা ছয়টা আস্ত কোয়েইল পাখি, ভিতরে গোলাপের পাপড়ি ভরা।

'এটা আপনার খুব পছন্দ হবে, মিস্টার রানা,' হাশিম বলল। 'তেহ্‌রানের খাবার। একমাত্র তেহ্‌রানের লোকেরাই এই বিশেষ রান্নাটা জানে। পাখিগুলোকে আস্ত দেখা গেলেও ভিতরে একটা হাড়ও পাবেন না, কাঁটা চামচ দিয়েই কেটে ফেলতে পারবেন। এর সঙ্গে তুলনা করা চলে শুধু কচি ভেড়ার ভেতরে পেস্তা ভরে রান্না করা রোস্টের...'

'ওর সঙ্গীর ব্যাপারে কী জানেন?' রানা জিজ্ঞেস করল। 'সারাক্ষণ সাথে থাকে যে লোকটা। মাথায় কেপি পরে থাকে।' তেহ্‌রানের বিশেষ রান্নার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাল না ও। যদিও চামচ দিয়ে কেটে খানিকটা তুলে মুখে দিল।

'বেশি কিছু না,' হাশিম বলল। 'ওর নাম লি টনকিন, তবে আসল নাম কি না সন্দেহ আছে আমার। উত্তর ভিয়েতনামের লোক। সেনাবাহিনীতে ছিল। ওখানে ওপরঅলাকে খুন করে পালিয়েছে। তেহরানে এসে লুকিয়ে ছিল। এখান থেকেই ওকে নিয়ে গেছে পিটসেন।'

এঁটো বাসন-পেয়ালা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলল ওয়েইট্রেস।

'ওকে আপনার নিশ্চয় পছন্দ হয়েছে, তাই না, মিস্টার রানা?' হাশিম বলল। ইচ্ছে করলে আজ রাতে ওকে সঙ্গিনী হিসেবে পেতে পারেন। কী, বলব?'

'নাহ্, ওসবের প্রয়োজন নেই,' রানা বলল। 'এত খাওয়া খেয়েছি, আর কিছু সহ্য হবে না। চলুন, বেরনো যাক।'

'আরে বসুন, কফিটা শেষ করি।'

এক বোতল *আরক* নিয়ে আবার ফিরে এল ওয়েইট্রেস। সাথে কিছু ফল।

'খাঁটি তেহরানি জিনিস,' হাশিম বলল। 'খুব কড়া। ভরপেটে ভাল জমে। নিন।'

'নাহ্। শুধু এক কাপ কফি, আর কিচ্ছু না।'

ঘন করে জ্বাল দেয়া দুধ ও প্রচুর চিনি মিশানো কফি খাওয়ার পর উঠল ওরা।

বাইরের বাতাস ভিতরের চেয়ে গরম, কিন্তু কোথা থেকে যেন ফুলের সুবাস আসছে। পার্কিং লট ধরে এগোল দুজন মার্সিডিজটার কাছে। রাস্তার ওপারের কালো গাড়িটাকে খুঁজল রানার চোখ, দেখল না।

মার্সিডিজটার কাছে চলে এসেছে ওরা। হঠাৎ হাশিমের হাত চেপে ধরল রানা। 'দাঁড়ান!'

চোখের পলকে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে ও। সাবধানে এক পা এক পা করে এগোল। ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে ইয়াকুবকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ওর বসে থাকার ভঙ্গিটা স্বাভাবিক লাগল না রানার কাছে। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে পিস্তল হাতে এক পাক ঘুরে এল গাড়িটাকে। তারপর এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের দরজার হ্যাণ্ডেল চেপে হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। সিট থেকে গড়িয়ে রাস্তায় পড়ল ইয়াকুবের অজ্ঞান দেহটা। মুখে, কপালে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন। পিটিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছে ওকে।

ইয়াকুবের একটা হাত মুঠোবদ্ধ, কী যেন ধরে রেখেছে। ঝুঁকে বসে হাতটা উঁচু করল রানা। আঙুলের ফাঁক থেকে ছাড়িয়ে নিল একটুকরো কাগজ। গাড়ির ভিতরের আলোটা জ্বেলে কাগজের লেখাগুলো পড়ল:

মাসুদ রানা,

আপনার এখানে আসার খবর

জানা আছে আমাদের। কেন এসেছেন
তা-ও জানি। সুতরাং, ভাল চান তো
আর এগোবেন না।
কাগজের নীচে স্বাক্ষরের জায়গায় একটা পপিফুল আঁকা।

নয়

পরদিন সকাল আটটায় নাস্তা দেয়া হলো রানার ঘরে, অথচ সে কোন অর্ডার দিয়ে রাখেনি। দুধ ছাড়া চা, মশলা দেয়া ভেড়ার দুধের পনির আর চাপাতি। হোটেল কর্তৃপক্ষই পাঠিয়েছে। ডিম ভাজা পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞেস করল রানা। বয় বলল, পাওয়া যাবে। আনতে বলে সেদিনকার পত্রিকাটা তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বসল।

হাশিম আসতে পারবে না। নিজের ব্যবসার জরুরি কাজে আটকে গেছে। গুণ্ডাদের মার খেয়ে ইয়াকুব এমন বেয়াকুব হয়েছে, হাশিমের ড্রাইভারিই ছেড়ে দিয়েছে। হাশিম জানিয়েছে, *খেপা চালক* এখন প্রাণের ভয়ে জড়সড়।

হাশিমের জন্য বসে থেকে সময় নষ্ট না করে নশাহ্রে যাবে ঠিক করল রানা। পিটসেন ওখানে কী করছে, খোঁজ নেবে। একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজেই চালিয়ে যেতে পারে, আবার ড্রাইভার সহ গাড়ি ভাড়া নিতে পারে। পরেরটাই সুবিধেজনক মনে হলো ওর কাছে। স্থানীয় কাউকে নিলে জায়গা চেনার জন্য বার বার গাড়ি থামিয়ে একে-তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। সোজা চলে যেতে পারবে যেখানে যেতে চায়।

নাস্তা সেরে, কাপড় পরে নীচে নামল রানা। গাড়ির জন্য হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্কের সাহায্য চাইল ও। ক্যাস্পিয়ানে যাওয়ার জন্য ড্রাইভারসহ একটা ট্যাক্সি দরকার, জানাল। রিসেপশনিস্ট ওকে বসতে বলে ফোনের রিসিভার তুলে নিল। আধ মিনিট পর রিসিভার রেখে দিয়ে জানাল, গাড়ি জোগাড় হয়েছে। ড্রাইভার ওই কার রেন্টাল কোম্পানির সবচেয়ে দক্ষ লোক, ইংরেজি জানে, আগামীকাল সকাল আটটা নাগাদ হাজির হয়ে যাবে।

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই রানার। হোটেলের বুকস্টোর থেকে কয়েকটা ম্যাপ কিনে আবার রুমে ফিরে গেল। বিছানায় বসে এক এক করে দেখতে শুরু করল ম্যাপগুলো। প্রথমে দেখে নিল নশাহ্রের ওয়াটারফ্রন্ট, আজাদি স্কয়্যারের বাজার, কমার্শিয়াল ডক, মেরিনা আর প্রমোদ-সৈকতের অবস্থান।

তারপর ইরানের একটা ম্যাপ বিছাল বিছানার ওপর। এর পশ্চিমে রয়েছে তুরস্ক, পূর্বে আফগানিস্তান। দক্ষিণ সীমান্তে ইরান উপসাগর, আর উত্তর সীমান্তে ক্যাস্পিয়ান সাগর। উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে রাশিয়া, আজারবাইজানের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, রাস্তার অবস্থা ভাল না। তবে জলপথে যাওয়াটা অনেক সহজ। ক্যাস্পিয়ানের উত্তর তীর থেকে আস্ত্রাখান হয়ে গেলে ভলগোগ্র্যাডের দূরত্ব খুবই কম।

রানার ধারণা হলো, মাদক পাচারে সহায়তার জন্য রাশান কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছে পিটসেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির কোনও নির্জন এয়ারস্ট্রিপ থেকে প্লেনে করে কীভাবে ওই মাদকদ্রব্য রাশায় নিয়ে যায়, বোঝা কঠিন। ছোট প্লেনে করে এত দূর পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। আর বড় প্লেন নিয়ে যেতে চাইলে রেডারকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

ক্যাস্পিয়ানের দিকে আবার মনোযোগ দিল ও। এখানেও সমস্যা আছে। ক্যাস্পিয়ানের দক্ষিণ উপকূল থেকে আস্ত্রাখানের সোভিয়েত শহরগুলো ছয়শো মাইল দূরে। কোন্ ধরনের জলযান এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারে?

এদিকে, ইরানের ভিতরে মস্ত দুটো মরুভূমি রয়েছে। উত্তরে তেহরানের কাছাকাছি যে মরুভূমিটা রয়েছে ওটা একটা সল্ট ডেজার্ট, নাম দাস্ত-এ কবির। দক্ষিণ-পশ্চিমের অনেক বেশি নির্জন মরুভূমিটার নাম দাস্ত-এ লুত। মানুষ বসবাসের এতই অনুপযুক্ত যে, ইরানের আদি বাসিন্দারাও ওখানে বসতি করেনি। অথচ এই মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তের শহর বাম-এ পিটসেনের খোঁজে লোক পাঠিয়েছিল তেহরান পুলিশ।

দাস্ত-এ লুতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে একটা রেল লাইন চলে গেছে কিরমান আর ইয়াজদ শহরে। দুটো শহরেই এয়ারস্ট্রিপ আছে। শহরগুলো কত বড়, ম্যাপ দেখে বোঝা কঠিন। দাস্ত-এ লুতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে একটা বড় রাস্তাও চলে গেছে জাহেদান হয়ে, জ্যাবুল ছাড়িয়ে একেবারে আফগান সীমান্তে।

জ্যাবুল। ম্যাপ দেখে মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর শেষ ঠিকানা। কোন্ ধরনের সীমান্ত শহর ওটা? ভাবছে রানা। যত দেখছে, কৌতূহল বাড়ছে ওর।

কয়েক ঘণ্টা ম্যাপ দেখে কাটাল ও। লাঞ্চের অর্ডার দিল ও। চিকেন কাবাব আর নান্ দিয়ে খাওয়া শেষ করে কফির অর্ডার দিল। কফি খেতে খেতে ভাবতে লাগল ম্যাপে দেখা জায়গাগুলো নিয়ে। নানানরকম হিসেব মেলানোর চেষ্টা করছে।

টেলিফোনের শব্দে ভাবনায় বাধা পড়ল ওর। তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল।

'মিস্টার রানা? রিসেপশন থেকে বলছি। আপনার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন। নাম বলছেন না।'

'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

এই তেহরানে আবার কোন্ মহিলা দেখা করতে চায় ওর সঙ্গে? কাকে চেনে ও? মনে করতে পারল না রানা। ভাবতে ভাবতে লিফটে করে নামছে। ওর মনে হলো, হাশিম কাউকে পাঠাতে পারে। তেহরানে আর কারও তো জানার কথা নয়, ও কোন্ হোটেলে উঠেছে। পিটসেনের কথা অবশ্য আলাদা।

লিফট থেকে বেরিয়ে সাদা মার্বেলে তৈরি লবিতে বেরোল রানা। মেয়েটাকে দেখতে পেল, এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। গিফট শপের উইণ্ডোর দিকে নজর। লম্বা কালো চুল পিছনে টেনে এনে ব্যাণ্ড আটকে দেয়া হয়েছে, কাঁধের উপর নেমে এসেছে চুলের প্রান্ত। গায়ে সাদা স্লিভলেস ব্লাউজ আর নেভি ব্লু স্কার্ট। সুন্দর দুটো পা। রূপালী ফিতে লাগানো স্যাণ্ডাল পরেছে।

রানা টের পেল, নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে ওর। পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল মহিলা। চেহারাটা দেখার পর আর উত্তেজনা চাপা দিতে পারল না, 'নোভা! তুমি...'

হেসে ঠোঁটে আঙুল রাখল তরুণী। 'এখানে না। আপনার ঘরে যাওয়া যেতে পারে।'

সাবধান হলো রানা। 'ঘরে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। চলো, হাঁটা যাক।'

'আমার হাতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে।'

'ছোট একটা পার্ক আছে কাছেই।'

বাইরে, যানবাহনের শব্দের মধ্যে নিরাপদ বোধ করল রানা। 'হ্যাঁ, নোভা, বলো...'

'আমি নোভা নই।'

'মানে?'

'আমি নিনা।'

'নোভা তো আমাকে বলল...'

'অনেক কম বয়েস লাগে আমাকে? ও ওরকম সব সময়ই বলে।' মৃদু হাসল নিনা। 'আসলেই আমি ছোট। পঁচিশ মিনিটের। আমরা যমজ।'

'নিজের নাম নোভা বলে সহজেই মানুষকে ধোঁকা দিতে পারবেন আপনি। আসুন, পা চালান।'

শ'খানেক গজ দূরে দুটো বাড়ির মাঝখানে ছোট এক টুকরো সবুজ জায়গা। কাঠের কয়েকটা লম্বা বেঞ্চ আছে সেখানে, আর বাচ্চাদের কয়েকটা দোলনা। একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসল ওরা। এমন অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে, যাতে কেউ দেখলে ভাবে দুই নিকটাত্মীয় গল্প করছে।

'পিটসেনের সঙ্গে এসেছি আমি,' নিনা বলল। 'ও জানে, আপনি তেহরানে এসেছেন। আমি পোস্ট অফিসে একটা চিঠি পোস্ট করার কথা বলে পালিয়ে এসেছি। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করেছি জানলে লি আমাকে খুন করে ফেলবে। আমি শুধু আপনাকে একটা জিনিস দিতে এসেছি।'

চারপাশে তাকিয়ে চট করে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ গুঁজে দিল সে রানার হাতে।

ওর মনে হলো, নিনার চোখের মরিয়া দৃষ্টি যেন ওকে বিদ্ধ করছে।

'আপনি কি নশাহ্‌রে যাবেন?' নিনা জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তা হলে এই কাগজটা আপনার কাজে আসবে।'

'পিটসেনের মরুভূমির আস্তানাটা কোথায় জানেন আপনি?'

'জানি না।'

'কিন্তু আপনি তো শুনেছি ওখানেই থাকেন।'

'থাকি। আমাকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুম পাড়িয়ে। কোথায় যাচ্ছে শুধু পাইলট জানে।'

'বামের কাছে কোথাও?'

'হতে পারে। তবে আমার ধারণা কিরমানের দিকে কোথাও হবে। আমরা যাচ্ছি ওখানে। প্রথমে ইয়াজদে যাব। ওখানেই আমাকে ড্রাগ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হবে।'

নিনার চোখে অনুনয় দেখতে পাচ্ছে রানা। দুই বোনের চেহারায় এত মিল, আলাদা করা কঠিন। দু'এক আউন্স ওজন কি কম-বেশি হবে? গালে কি ক্রমাগত ড্রাগ নেয়ার ছাপ পড়েছে? কথার টানটা কি একটু অন্যরকম? ঠোঁট দুটো অবিকল এক। তবে একটা জায়গায় স্পষ্ট অমিল, নোভার চোখ গাঢ় বাদামি, আর নিনার হালকা লালচে-বাদামি, তাতে মাঝে মাঝে সবুজ আভা ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

'নিনা,' ওর হাতে একটা হাত রেখে কোমল গলায় বলল রানা, মনে হলো ওর স্পর্শে হাতটা যেন সামান্য কেঁপে উঠল, 'আমাকে কী করতে বলো?'

গভীর দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল নিনা। 'পিটসেনকে খুন করুন। হ্যাঁ, এখন এটাই কাজের কাজ হবে। ওকে খুন করুন।'

'শুধু শুধু ঠাণ্ডা মাথায় তো একটা লোককে...'

'যা বলছি, করুন। খুন করুন ওকে। অনেক দেরি হয়ে যাবার আগেই। আর মিস্টার রানা...'

'শুধু রানা।'

'হ্যাঁ, রানা। শুধু আমার জন্যে না। আপনার সাহায্য আমি অবশ্যই চাই, এটা

ঠিক, ভীষণভাবেই চাই...' একটা মুহূর্তের জন্য যেন ভাষা হারিয়ে ফেলল নিনা, তারপর সামলে নিল। 'ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করেছে পিটসেন। ওকে ঠেকাতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার কাছে পিস্তল থাকলে আমিই ওকে গুলি করে মারতাম।'

'কিন্তু আমি খুনী নই, নিনা,' রানা বলল। 'আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে লোকটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে যেন লণ্ডনে রিপোর্ট করি।'

বিশ্রী একটা গালি দিল নিনা, মেয়েদের মুখে একেবারেই বেমানান, ওর দিকে তাকিয়ে রইল রানা। রুক্ষস্বরে নিনা বলল, 'রিপোর্টের কথা ভুলে যান, ভুলে যান। সময় নেই। কেন আপনি বুঝতে পারছেন না, রানা?'

'সবাই আমাকে পিটসেনের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে সাবধান করছে। আপনি বাদে। আপনি বলছেন ওর কাছে যেতে, ওর কী অপরাধ না জেনে, কোন রকম প্রশ্ন ছাড়াই চোখ-কান বুজে ওকে খুন করতে।'

'আমি বলছি তার কারণ আমি সবার চেয়ে বেশি জানি,' নিনা বলল। 'অন্য সবার চেয়ে ওকে বেশি চিনি আমি।'

অস্বস্তি বোধ করছে রানা। নোভাকে ওর হোটেল রুমে বসে থাকতে দেখে এ রকম অনুভূতি হয়েছিল। কেমন যেন অচেনা একটা অনুভূতি। 'আপনি কে তা কী করে বুঝব আমি?'

'আপনি বলতে চাইছেন, আমি যে নোভা নই তার কী প্রমাণ?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল। চোখের রঙের কথাটা তুলল না।

'নোভাকে কাপড় ছাড়া দেখেছেন?'

'ব্যাংকের কর্মচারীরা কি একবার-দু'বার কারও সঙ্গে দেখা হলেই তার সামনে উলঙ্গ হয়ে যায়?'

একটা মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল নিনা। ডান উরুর ওপরের দিকটা দেখাল। 'এই যে, গোল দাগটা, জন্মচিহ্ন। নোভার নেই। আরও আছে, আসুন আমার সঙ্গে।'

রানার হাত ধরে ছোট একটা ঝোপের কাছে নিয়ে এল নিনা, পার্কের দেয়ালের কাছে। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে কোমরের ফিতে খুলল ও, স্কার্টের জিপার টেনে নামিয়ে দিল অনেকখানি, দুই পাশে তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কি না, তারপর আরও কয়েক ইঞ্চি নামাল। সাদা সুতির প্যান্টির রবারটা এক আঙুলে ধরে টেনে নামাল। সাদা চামড়ায় আধ ইঞ্চি ডায়ামিটারের লালচে একটা গোল দাগ।

'দেখলেন,' দ্রুত আবার প্যান্টি তুলে স্কার্টের জিপার লাগিয়ে দিল নিনা। কোমরের ফিতে বাঁধল।

'সুন্দর,' হেসে বলল রানা। 'কিন্তু নোভার ওই জায়গাটা দেখার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত...'

'নিশ্চয়ই। তবে এর বেশি প্রমাণ এখন আর দিতে পারলাম না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

দুই হাতের তালুতে রানার একটা হাত চেপে ধরল নিনা। 'প্লিজ, রানা, আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি। শুধু আমার নিজের জীবনের নয়, আগেই বলেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'বুঝতে পারছি,' রানা জবাব দিল।

'এখন আমাকে যেতে হবে। আশা করি, শীঘ্রি দেখা হবে আবার।'

নিনাকে দৌড়ে চলে যেতে দেখল রানা। পার্ক থেকে বেরিয়ে তেড়ে আসা গাড়িগুলোর পরোয়া না করে, বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ছুটে রাস্তা পার হলো। নোভার মত হাত নাড়ার জন্য ফিরে তাকাল না। প্রথম যে ট্যাক্সিটাকে থামাতে পারল, প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেটার ভিতর।

হোটেল রুমে ফিরে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল রানা, যেটা দিয়ে শহরের দক্ষিণ দিকটা চোখে পড়ে। ভাঁজ করা কাগজটা খুলল। নশাহ্‌রের ওয়াটারফ্রন্টের একটা নকশা আঁকা রয়েছে পেন্সিল দিয়ে, নিনা হয়তো নিজেই এঁকেছে। তাতে একটা হোটেলের গায়ে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। নীচে নাম লিখে দিয়েছে হোটেলটার: ফরহাদ'স ফাইভ স্টার।

মার্জিনে লিখেছে, আসলাম ব্রাদার্স বোট বিল্ডার্স। নামটা থেকে একটা রেখা টেনে নিয়ে গিয়ে নকশার মাঝখানে ডকসাইড স্ট্রিটের গায়ে এক জায়গায় লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। নাম-ঠিকানাগুলো সব পরিষ্কার করে লিখেছে নিনা।

দশ

পরদিন সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে রানা দেখল একটা ধূসর ক্যাডিলাক গাড়ি অপেক্ষা করছে ওর জন্য। সালাম দিয়ে পিছনের দরজা খুলে দিল ড্রাইভার।

গাড়িতে উঠে বসল রানা।

'আমি ফারুক,' ড্রাইভিং সিটে বসে নিজের পরিচয় দিল ড্রাইভার। গম্ভীর চেহারা। মস্ত কালো গোঁফটা টুথব্রাশের মত খাড়া হয়ে আছে। 'আপনাকে ক্যাস্পিয়ান সাগরে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে। বেদিং ট্রাউজার

নিয়েছেন তো, সার?' রানার সঙ্গে নেয়া ছোট অ্যাটাশে কেসটার দিকে তাকাল ও।

'নিয়েছি,' রানা বলল। বলল না, প্যান্টের নীচে পরেই আছে সুইমিং ট্রাঙ্ক।

ম্যাপ, বাড়তি একটা শার্ট আর কিছু আণ্ডারওয়্যারও আছে কেসে। নশাহ্‌রে একদিনের বেশি থাকার ইচ্ছে নেই। কেসের পিছনের অংশে, কজার ঠিক নীচে একটা গোপন কুঠুরিতে রেখেছে ওয়ালথার পিস্তলে লাগানোর উপযোগী একটা সাইলেন্সার আর কিছু বাড়তি গুলি। মিশনে বেরোলে অতিরিক্ত জিনিস নেয়াটা পছন্দ নয় ওর, অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে, বেশি জিনিস কাজেও লাগে না। এমনকী সাইলেন্সারটাও ওর কাছে বোঝা মনে হয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে চট্ করে ওটা খুলতে বা লাগাতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তবু, নিয়েছে। যদি প্রয়োজন হয়।

সিটে হেলান দিয়ে, তেহরানের শহরতলির দোকানগুলোকে পিছনে ছুটতে দেখছে ও। দীর্ঘ যাত্রা। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বললে সময় কাটবে, কিছু তথ্যও পাওয়া যাবে। হোটেলের দোকান থেকে আমেরিকায় তৈরি দামি এক প্যাকেট চেস্টারফিল্ড কিনে নিয়েছে রানা। একটা বের করে সাধল ওকে। তিনবার *না না* করার পর খুব আগ্রহের সঙ্গে সিগারেটটা নিল ড্রাইভার। কোন কিছু সাধলে এই *না না* করাটা তেহরানি ভদ্রতা ও রেওয়াজ।

সকালেই প্রচণ্ড গরম, ঘাম বেরোচ্ছে। পাতলা সুতির শার্টটা ঘামে ভিজে রানার গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। ট্যাক্সিতে এয়ার-কণ্ডিশনার নেই। গুমোট আবহাওয়া। বাতাস ঢোকার জন্য জানালা খুলে দিয়েছে রানা। ফারুকের কাছ থেকে জানা গেল, এই গরম থেকে বাঁচতে ধনী পরিবারগুলো মাস দুয়েকের জন্য পর্বতের পায়ের কাছে সবুজ উপত্যকায় চলে যায়। সরু একটা পাহাড়ি নদীর তীরে তাঁবু টাঙিয়ে অলস, সহজ-সরল জীবন যাপন করে পূর্বপুরুষদের মত। ওখানকার আশপাশের গ্রামে নির্ভেজাল খাবার পাওয়া যায়, প্রাণ ভরে সেসব খায়। মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে বেড়াতে যায় পর্বতে। রাতে প্রদীপ কিংবা চাঁদের আলোয় কবিতা পাঠের আসর বসায়।

এক সময়ে শহরের কোলাহল পিছনে পড়ে গেল, তীব্র গরম ছাড়িয়ে অ্যালবুর্জের পার্বত্য এলাকায় ঢুকল ট্যাক্সি।

'ওই যে দেখুন, সার—*হাজারো পাতাল-নরকের মুখ,*' ডানে হাত তুলে দেখাল ফারুক।

চড়াই বেয়ে উঠে গেছে রাস্তা, সাপের মত এঁকেবেঁকে। কিন্তু গতি কমাচ্ছে না সে, একইভাবে এক্সেলারেটর চেপে ধরে রেখেছে, সমতলভূমিতে যেমন রেখেছিল। বাঁ হাত স্টিয়ারিঙে, ডান হাতে বিভিন্ন জায়গার দিকে নির্দেশ করে ওগুলোর নাম বলে চলেছে, '*ওটা কুমারির পাহাড়...ওটা সিংহের ডেরা...ওটা*

ভয়াল পাড়ি।'

মাঝে মাঝেই নীচে পর্বতের গভীর গিরিখাতে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে থাকা নানারকম গাড়ির মরচেপড়া ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ছে। চাকা ওপরের দিকে তুলে চিত হয়ে থাকা গাড়িগুলোকে বীভৎস দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে প্রাণীর লাশ। তীক্ষ্ণ একটা চুলের-কাঁটা মোড়ের কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠল ফারুক, '*আল্লাহুআকবর!*' কিন্তু গতি কমাল না।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে বাতাস। ঘণ্টা দুয়েক পর, পাহাড়ের উপর রাস্তার পাশে একটা চা-দোকানের সামনে গাড়ি থামাল ফারুক। রানাকে নেমে সঙ্গে আসতে অনুরোধ করল। দোকানের বারান্দায় বসে ড্রাইভারের পয়সায় চিনি দেয়া কালো চা খেতে খেতে পিছনে তেহরানের দিকে তাকাল রানা। দক্ষিণে রোদের অসহ্য তাপে অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে থাকা শহর থেকে যেন বাষ্প উঠছে এঁকেবেঁকে, আবছা দেখাচ্ছে। চারপাশ ঘিরে থাকা মরুভূমির মাঝখানে মানুষের টিকে থাকার ক্ষমতারই যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে ওই শহর।

দোকানদারকে নিয়ে কোনও গোপন আলোচনা করতে ভিতরে চলে গেল ফারুক। লোকটা ওর আত্মীয়। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এসে রানাকে নিয়ে গাড়িতে ফিরে এল।

আরও ঘণ্টাখানেক পর পর্বতের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা পেরোল ওরা। এবার শুধু নামার পালা, ক্যাস্পিয়ানের দিকে। বাতাসের রুক্ষতা কেটে গেছে আগেই, শুরু হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত ভেজা ভেজা ঠাণ্ডা বাতাসের এলাকা। দিগন্তে মরীচিকার মত ঝিলমিল করছে ক্যাস্পিয়ান সাগরের সবজে-নীল পানি।

বহু নীচে উপত্যকার গায়ে রাস্তা দেখতে পেল রানা। সবুজ গাছপালার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। ধুলোভরা পথে সারি দিয়ে চলেছে পিঠে মালবোঝাই গাধা ও উটের কাফেলা। বড় বড় ট্রাকগুলোর ধীরগতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে পণ্যের ভারে কাবু, ক্ষমতার তুলনায় মাল তুলেছে তিনগুণ, উঁচু হয়ে আছে তেরপল উটের পিঠের মত। ফোক্সভাগেন গাড়ির ছড়াছড়ি, ক্যাম্পার ভ্যান আর বিটল্ স্যালুনই বেশি। আয়তাকার বাক্সের মত কিছু গাড়ি দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত তেহরানে তৈরি।

কমলাবীথির পাশ কাটানোর সময় লম্বা করে শ্বাস টানল রানা। গ্রীষ্মের বাতাসে লেবুফুলের সুগন্ধ। একটানা বসে থেকে আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর। আড়মোড়া ভাঙল। শীঘ্রি নামতে হবে কাজে।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের দিবানিদ্রার সময়ে নশাহ্রে পৌঁছল ওরা। হোটেলে যাবার আগে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে শহরটা দেখতে চাইল রানা, যাতে জায়গাটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারে। রাস্তার দুই পাশে পাম গাছের সারি, বড় বড়

বাড়িঘর, ধনীদের বাগান-বাড়ি আর সাগরের কিনারে তৈরি বেশ কিছু হোটেল দেখল ও। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরেফিরে দেখে ফরহাদ'স ফাইভ স্টারের সামনে থামতে বলল ড্রাইভারকে। অনেক আগেই লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে দুজনেরই। ওই হোটেলেরই রেস্টুরেণ্টে খাবে, ঠিক করল রানা। ফারুককে ওর সঙ্গে খাওয়ার কথা বলতেই রাজি হয়ে গেল।

শূন্য ডাইনিং রুম। দুজনে বসলে এগিয়ে এল ওয়েইটার। অর্ডার নিয়ে গেল। খানিক পরেই ফিরে এল কাবাব আর পোলাওয়ের ট্রে নিয়ে।

'ফারুক,' খেতে খেতে রানা বলল, 'আমি যা বলি, মন দিয়ে শোনো। ডক এরিয়ায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুমি ফিরে আসবে। রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে তো এলামই; যদি না আসি, তেহরানে আবু হাশিম সাহেবকে ফোন করবে। এই যে নাম্বার। এরপর তিনি বুঝবেন কী করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

কয়েকটা নোট বের করে দিল রানা। 'তোমার ভাড়া সহ অন্যান্য সমস্ত খরচ আশাকরি হয়ে যাবে এতে। ঠিক আছে?'

'আলহামদুলিল্লাহ্,' বলল ফারুক। 'ওঁকে চিনি, সার; আপনার যে-কোন মেসেজ আমি আবু হাশিম সাহেবের কাছে পৌঁছে দেব। এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আর একটা কথা, সার, আমি একটু ক্যাভিয়ার খেতে চাই। এখানে দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল ক্যাভিয়ার পাওয়া যায়। কিন্তু খুব দাম।'

'ক্যাভিয়ার তোমাদের খুব পছন্দ, তাই না?' ওয়েইটারের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল রানা।

খাওয়া শেষ হলে গাড়িতে ফিরে এল দুজনে। মেইন ডক এরিয়ায় এসে নিনার ম্যাপ দেখে ধীরে ধীরে রাস্তা বাতলাচ্ছে রানা, ফারুক গাড়ি চালাচ্ছে, কোনও নতুন রাস্তায় পড়লে রানাকে বলছে। অনেক বড় দুটো মালবাহী জাহাজ নোঙর করা রয়েছে, আর আছে ঝাঁকে ঝাঁকে পেশাদার মাছধরা বোট। ডকটা বিশাল। অসংখ্য গুদাম ঘর আর কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড রয়েছে।

আসলাম ব্রাদার্স বোট বিল্ডার্সটা খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না।

'গুড গার্ল, নিনা,' বিড়বিড় করল রানা। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'ফারুক, মনে আছে তো কী করতে হবে?'

'আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, মিস্টার রানা।'

'মিস্টার হাশিমকে ফোন করার আগে ওই থামটার ফোকরে একটু খুঁজে দেখো।' মরচে পড়া একটা বাতিল ট্রাফিক পোস্ট দেখাল রানা। 'দেখবে, আমি কোন নোট রেখে গেছি কি না।'

সেদিন প্রথমবারের মত উত্তেজনা দেখা গেল ফারুকের গম্ভীর মুখে। ঝিক করে উঠল চোখের তারা। হাসিতে উঁচু হলো মস্ত গোঁফজোড়া। 'দেখব, সার।'

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ফারুক। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল রানা। তারপর ঘুরে রওনা হলো বোট বিল্ডার্স-এর বাড়িটার দিকে।

বাইরে থেকে অতি সাধারণ দেখতে বাড়িটা, কাঠের একটা সিঁড়ি বেয়ে ঢুকতে হয় ভিতরে। দরজাটা বন্ধ। বাড়ির উপর আড়-চোখ রেখে রাস্তা ধরে হেঁটে গেল রানা। নাহ্, আর কোনও পথ নেই ঢোকার। লক্ষ করল, সামনে থেকে বাড়িটাকে অতি সাধারণ মনে হলেও আসলে তা নয়। বাড়ির সঙ্গে লাগানো, কিছুটা নিচু, লম্বা-চওড়া আরেকটা কাঠামো রয়েছে। ওটার ধনুকের মত বাঁকানো ছাদ ঝকঝকে নতুন স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। রানা আন্দাজ করল: কাঠামোটা চওড়ায় চল্লিশ গজের কম হবে না, লম্বায় পঞ্চাশ গজেরও বেশি। সাগরের ভিতর চলে গেছে অনেক দূর। রানার মনে হলো, নিশ্চয়ই কোনও ধরনের ডক হবে ওটা।

কৌতূহল বাড়ছে ওর। বিল্ডিঙের একপাশে দাঁড়িয়ে ঢোকার পথ খুঁজছে ওর চোখ। নেই। স্টিলের ছাদওয়ালা কাঠামোটার গায়েও কোনরকমের ফাটল, দরজা বা জানালা দেখা গেল না। পুরানো বাড়িটার গা থেকে তৈরি করা একটা নিশ্ছিদ্র গ্যাংওয়ে যুক্ত হয়েছে ডকের সঙ্গে।

ডকের কিনার ধরে বাড়িটার সামনে দিয়ে দুইবার যাতায়াত করল ও। কেউ নজর রাখছে কি না দেখল। তারপর একটা ফিয়াট লরির আড়ালে গিয়ে সুইমিং ট্রাংকটা ছাড়া সব জামা-কাপড় খুলে ফেলল। কাপড়গুলোর মাঝখানে পিস্তলটা ভরে, পুঁটুলি বানিয়ে লুকিয়ে রাখল একটা ডাস্টবিনের পিছনে। কমাণ্ডো নাইফ সঙ্গে নিয়েছিল, বাঁ পায়ে হাঁটুর নীচে চামড়ার ফিতে দিয়ে আটকানো রয়েছে ছুরিসহ খাপটা—প্রয়োজন হতে পারে মনে করে ওটা সঙ্গেই রাখল। দুই পাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দ্রুত চলে এল ও ডকের ধারে, নামল পানিতে। পিচ্ছিল, আঠালো পোড়া তেল ভাসছে পানিতে, একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলে চোখ পড়লে রংধনুর রং দেখা যায় তার মধ্যে। আর রয়েছে ডিজেলের দম আটকানো মিষ্টি গন্ধ। হাঁসের ভঙ্গিতে ডুব দিল ও। মাথা নিচু করে নেমে চলল নীচের দিকে। শুধু উপরের ঢাকনাই নয়, পানির নীচেও বেশ কিছুটা অংশে স্টিলের পুরু শিট লাগানো।

কাঠামোটা ধরে রাখা ইস্পাতের তৈরি মস্ত থামগুলো দেখা যাচ্ছে। অন্তত এক ডজন থাম দেখতে পাচ্ছে ও, সাগরতলের বালিতে কংক্রিটের বড় বড় ব্লক তৈরি করে তাতে গাঁথা। বিল্ডিঙের দুই পাশের দেয়াল পানিতে নেমে ডকের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাবে, এতটা আশা করেনি ও। যে এই জিনিস বানিয়েছে, খুব

দক্ষতার সঙ্গে সাবধানে বানিয়েছে। দেয়ালের গোড়ার কাছাকাছি থেকে সামনে এগিয়ে চলল ও। ভিতরে ঢোকার পথ খুঁজছে। ঢেউয়ের মত উঁচুনিচু হয়ে থাকা সমুদ্রতলের বালিতে, বালি আর দেয়ালের গোড়ায় কোথাও কোনও একটা বড় ফোকর পাবে আশা করছে। বিল্ডিঙের দেয়াল খোলা সাগরের দিকে গিয়ে কোথাও না কোথাও শেষ হয়েছে, জানা কথা; কিন্তু ওখানে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে, ততক্ষণ দম আটকে রাখা সম্ভব নয়, ভেসে উঠতেই হবে ওকে।

ডুব দিয়েছে প্রায় এক মিনিট হয়ে গেছে। অসাধারণ ফুসফুসের জোর আছে বলেই এতক্ষণ পেরেছে, তবে আর বেশিক্ষণ দম রাখতে পারবে না। গোটা কাঠামোটা ক্রমশ উপরে উঠে গেছে, হারিয়ে গেছে শ্যাওলা আর তেল-ময়লায় ভরা ধোঁয়াটে পানিতে। হাত বুলাল ও স্টিলের গায়ে। মসৃণ। ফাঁক-ফোকর তো দূরের কথা, কোথাও সামান্যতম খাঁজও নেই। এ জিনিস যে বানিয়েছে, তার টাকা আছে, মেধা আছে, ক্ষমতাও আছে।

পা দুর্বল হয়ে আসছে রানার। বুঝল, রক্তে অক্সিজেন কমে গেছে। ব্যথা শুরু হলো পায়ের পেশিতে। মনোবল ধরে রেখে জোরে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে চলল। অন্ধকার পানিতে দেখার জন্য চোখ দুটো বিস্ফারিত করে রেখেছে। সামনে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল দেয়াল, মস্ত একটা পাথরের কারণে এগোতে পারেনি আর। শুধু তাই না, পাথরটাকে জায়গা দেয়ার জন্য ইস্পাৎ-কাঠামোর গা-ও খানিকটা কেটে ফেলতে হয়েছে। পাথর আর কাটা জায়গাটার মাঝখানে একটু ফাঁক দেখতে পেল রানা, যার ভিতর দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দেয়া সম্ভব। কাটা জায়গার দিকে পিঠ দিয়ে পাথরের খাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে দিল ও শরীরের ভেসে ওঠা ঠেকাবার জন্য।

গরম হয়ে উঠেছে ফুসফুস, সংকুচিত হয়ে গেছে। বুকের ভিতর যেন স্টিম-হ্যামার দিয়ে পেটাচ্ছে কেউ। পানিতে লাথি মেরে সামনে এগোল ও, স্টিলশিটের কাটা জায়গার অমসৃণ ধারালো লোহায় আঁচড় লাগল মেরুদণ্ডের কাছে পিঠের চামড়ায়, পেটে লাগছে পিচ্ছিল পাথরের অস্বস্তিকর কঠিন চাপ। শেষবারের মত, একটা মরিয়া লাথি মেরে, ঢুকে গেল ও ভিতরে। বাইরের আবর্জনা আসতে না পারায় পানি এখানে অনেক বেশি পরিষ্কার। জোরে জোরে তিন-চারটে ব্রেস্ট-স্ট্রোক দিয়ে কিছুদূর এগোল ও, তারপর ভেসে উঠতে শুরু করল। মাথাটা সামান্য পিছনে বাঁকা করে রেখেছে, সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত, কোনও বাধা থাকলে যেন প্রথম ধাক্কাটা মাথায় না লেগে হাতে লাগে। হাতে লাগল ধাতব বাধাটা। চোখ তুলে দেখল জাহাজের খোলের মত বিশাল একটা জিনিস, ক্রমশ বাঁকা হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। অক্সিজেন পাচ্ছে না মগজ, তবে চিন্তাশক্তি এখনও নষ্ট হয়নি। বুঝল, ওপরে ভেসে উঠতে হলে এই খোল ঘেঁষে যেতে হবে।

দ্রুত উঠে চলল ও। হঠাৎ হাত ঠেকল খোল থেকে সোজা বেরিয়ে থাকা প্লেনের ফিউযেলাজের ডানার মত একটা জিনিসে।

একটা জাহাজ, ডানাওয়ালা... এ কী করে সম্ভব, ভাবছে রানা, শেষ শক্তিটুকু খরচ করে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ওপরে ওঠার পথ। হয়তো এটা জাহাজ কিংবা প্লেন কোনটাই নয়। আটকা পড়েছে কোনও কামরার মেঝের নীচে, আর ভাসতে পারবে না, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। মরিয়া হয়ে এখানে-ওখানে খামচে বেড়াতে লাগল ও ধাতব জিনিসটার নীচে। অবশ হয়ে আসছে আঙুল, হাত-পা, মগজ। হঠাৎ করেই ধাতব জিনিসটার নীচ থেকে সরে এল, ভুস করে ভেসে উঠল মাথা।

পুরো এক মিনিট হাঁ করে জোরে জোরে বাতাস টানল ও। ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে আসছে শরীরে। নাড়ির গতি আর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলে চারপাশে তাকাল।

এক অদ্ভুত দৃশ্য! ইস্পাতের তৈরি ঢাকনাটা আসলে মস্ত এক হ্যাঙার, কিন্তু তাতে রয়েছে একটিমাত্র যান। জিনিসটা যে কী, বুঝে উঠতে পারল না ও।

সাবধানে, নিঃশব্দে দানবীয় জিনিসটার কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করল ও, ভাল করে দেখার জন্য। পিঠের বেশ অনেকটা জায়গা কেটেছে, আঁচড় লাগা জায়গাটা নোনা পানি লেগে জ্বালা করছে অনেকক্ষণ থেকে। হ্যাঙারের কিনারে এসে একটা লোহার ডাণ্ডা ধরে ভেসে থেকে দেখতে লাগল অবিশ্বাস্য বস্তুটাকে।

লেজটা রয়েছে ডাঙার দিকে, মাথাটা খোলা সাগরের দিকে তাক করা—সেদিকটা ক্যামোফ্লাজ নেট দিয়ে ঢাকা। রানা আন্দাজ করল, অন্তত একশো গজ লম্বা হবে জিনিসটা। উঁচু করে তৈরি লেজটায় বড় দুটো ডানা রয়েছে, প্লেনের ফিউযেলাজে যেমন থাকে তেমন নয়, মাছের পাখনার মত দেখতে। আর সামনের মূল ডানা দুটো বেশির ভাগটাই কেটে ফেলা হয়েছে, গা থেকে অল্প একটু শুধু বেরিয়ে রয়েছে। সামনের অংশটা দেখতে যাত্রীবাহী বিমানের মত, কিন্তু ফিউযেলাজের ওপর আটটা জেট ইঞ্জিন বসানো।

পানিতে বেশ মানিয়ে গেছে যানটা। প্রপেলার নেই, তারমানে জাহাজ কিংবা বোটের মত চলে না। চলে বাতাস ঠেলে। খাটো করা ডানা নিয়ে নিশ্চয় বেশি ওপরে উঠতে পারে না। হঠাৎ করেই বুঝে ফেলল রানা ব্যাপারটা। নিচু দিয়ে চলা একটা উভচর যান ওটা, অনেক দূর যাওয়ার ক্ষমতা আছে, অথচ রেডারে ধরা পড়ে না।

এটা বোধহয় হোভারক্র্যাফটের মত করে চলে। শুকনো সমতল জায়গা হলে সেখান দিয়েও চলতে পারে। হোটেলে দেখা ম্যাপটার কথা মনে এল রানার। ক্যাস্পিয়ানের উত্তর-পশ্চিম তীরে আস্ত্রাখানের উত্তরে রাশিয়ার নিচু অঞ্চলটা বেশ সমতল। তার মানে কী, দৈত্যাকার এই মেশিনটা নশাহ্‌র্‌ থেকে রওনা হয়ে সাগর

পাড়ি দিয়ে সরাসরি আস্ত্রাখানের ওপর দিয়ে ভলগোগ্র্যাড পর্যন্ত চলে যেতে পারে?

ডানদিকে মাল তোলার উপযোগী একটা বড় দরজা আছে উভচর বিমানটার। হ্যাঙারের চারপাশ ঘিরে রয়েছে গ্যালারি। বিমানের দরজা থেকে একটা গ্যাঙওয়ে গিয়ে ঠেকেছে গ্যালারির একপাশে। হ্যাঙারের পিছনে তক্তা দিয়ে বানানো পাটাতনের ওপর রাখা অসংখ্য কাঠের বাক্স। দুটো ফর্কলিফট ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে অলস ভঙ্গিতে।

ডুব দিয়ে আসার ক্লান্তিটা দূর হয়ে যেতেই ডাণ্ডা ছেড়ে দিয়ে আবার আস্তে করে ডুবে গেল রানা পানিতে। হ্যাঙারে আর কেউ আছে কি না দেখা দরকার। দেখতে হলে কোনওভাবে গ্যালারিতে উঠতে হবে। বিমানের গা বেয়ে কিংবা ফিউযেলাজের কিনার বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। লেজের কাছে ফিরে এসে ধোঁয়াটে পানি থেকে মাথা তুলল ও। সামনে একটা লোহার মই, ডকের কিনারে লাগানো। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে ওটার দিকে এগোল।

মই বেয়ে উঠে এসে মিনিটখানেক বিশ্রাম নিল আবার। তখন পানি থেকে দেখেছিল, এবার ওপর থেকে দ্রুত আরেকবার চোখ বোলাল হ্যাঙারের ভিতর।

প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ও, বাক্সগুলোর কাছে। শাবল দিয়ে চাড় মেরে একটা বাক্সের ডালার একপাশ ভেঙে ফেলল রানা। চায়ের পাতা রাখার বড় বাক্সের মত দেখতে বাক্সটা, শক্ত পলিথিনের ছোট ছোট ব্যাগ সাজিয়ে কানায় কানায় ভর্তি। একটা ব্যাগ তুলে নিল ও। হাতের আন্দাজে বুঝল দেড় কেজি ওজন হবে একেকটার। ভিতরে কী আছে দেখা যাচ্ছে না, ছিঁড়ে না দেখে বোঝার উপায়ও নেই। তবে যা-ই হোক, ভিতরের জিনিস প্যাকেটজাত করা হয়েছে কারখানায়, মেশিনে।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে কান খাড়া করে ফেলল রানা। গ্যালারির একটা ধাতব দরজা ঠেলে খোলা হয়েছে। মেঝেতে ঝাঁপ দিল ও, বাক্সগুলোর আড়ালে। একজন মানুষের কণ্ঠ শোনা গেল, দূর থেকে জবাব দিল আরেকজন। মেঝেতে শুয়ে বাদামি একটা জিনিস চোখে পড়ল রানার, মাটির ঢেলার মত।

নীরবে মনে মনে গাল দিয়ে উঠল ও। ওর অস্তিত্ব টের পেয়ে যাওয়ার কারণটা বোঝা যাচ্ছে। ঢেলাটা একটা এসআইডি, অর্থাৎ সাইযমিক ইন্ট্রুডার ডিটেকশন যন্ত্র। এটা মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, কিংবা যে কোনও জড় বস্তুর নড়াচড়া তিনশো গজ দূর থেকেও টের পায়। তিনটে মার্কারি সেল দিয়ে চলে। বিল্ট-ইন ডাইপোল অ্যানটেনা সহ ১৫০ মেগাহার্টজের ট্র্যান্সমিটার বসানো। সচল কোনকিছুর অস্তিত্ব ধরতে পারলেই সাঙ্কেতিক মেসেজ পাঠাতে থাকে। মাটিতে ফেলে রাখলে সহজে চোখে পড়ে না, তার কারণ, দেখতে মাটির ঢেলার মত, ওরকম করেই তৈরি।

ছুটন্ত পদশব্দ আর ডাকাডাকি শুনতে পাচ্ছে রানা। আবার যদি পানিতে নামে, খোলা সাগরে বেরোনোর আগেই দম নেয়ার জন্য মাথা তুলতে হবে। ফিউযেলাজের নীচে লুকিয়েও লাভ হবে না, সেই একই ব্যাপার, শ্বাস নিতে মাথা তুলতে হবে। তখন ধরা পড়বে। খোলসের যে ফাঁকটা দিয়ে ঢুকেছে, অন্ধকার পানিতে আবার ওটাকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। বেরোতে হলে, ডাঙা দিয়েই বেরোতে হবে।

যত তাড়াতাড়ি গার্ডকে আক্রমণ করে তার অস্ত্রটা কেড়ে নিতে পারে, ততই ভাল। অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। দেরি করলে আরও বেশি গার্ড সর্তক হয়ে যাবে।

খুব সাবধানে বাক্সের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। নীচের ক্রেনটার কোন ক্ষতি হয়েছে কি না দেখতে গেছে গার্ড। রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে পনেরো ফুট নীচে রয়েছে ক্রেন রাখার জায়গাটা। ওখানে লাফিয়ে পড়ে অক্ষত থাকতে পারবে কি না বোঝার চেষ্টা করল ও।

আর কিছু করারও নেই। আস্তে করে পায়ের খাপ থেকে ছুরিটা বের করে হাতে নিল ও। শাবলটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে থামল গ্যালারির রেলিঙের কিনারে। ছুঁড়ে মারল যতটা দূরে সম্ভব। শাবল পড়ার জোরালো শব্দ হলো বদ্ধ জায়গায়। শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিল গার্ড। একটা মুহূর্তও দেরি না করে ওপর থেকে লাফিয়ে নামল রানা। ছুটল উভচর বিমানের লেজের দিকে। লাফিয়ে উঠল লেজের ওপর। গার্ড ফিরে আসার আগেই লুকিয়ে পড়ল।

বিমানের লেজের কাছে এসে একটা জিনিস দেখে ভুরু কোঁচকাল রানা, রাশান ফ্ল্যাগ আঁকা রয়েছে ওখানে।

দুপদাপ শব্দ তুলে ফিরে আসছে গার্ড। চার-পাঁচ ফুট ওপর থেকে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা, মেঝেতে রানার দেহের নীচে চাপা পড়েছে।

'ফেলো ওটা,' কঠিন স্বরে আদেশ দিল রানা, ছুরির ফলা চেপে ধরেছে লোকটার কণ্ঠার এক ইঞ্চি উপরে। 'পিস্তল ফেলো!'

ধস্তাধস্তি করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল লোকটা। ছুরির চাপ কিছুটা বাড়াতে বাধ্য হলো রানা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিস্তলে ঢিল হয়ে গেল লোকটার আঙুল। হাঁটু দিয়ে ঠেলে জিনিসটা সরিয়ে দিল রানা, ধাতব ওঅকওয়ের ওপর দিয়ে কয়েক ফুট দূরে।

লোকটাকে জানে মেরে ফেলার ইচ্ছে নেই রানার। জানে, ক্যারোটিড ধমনীর উপর মাত্র এগারো পাউণ্ড চাপ মগজে রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তাতে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ জ্ঞান হারায়। লোকটার ঘর্মাক্ত ঘাড়ে চেপে

কল রানার দু'হাতের দুই বুড়ো আঙুল। জ্ঞান হারালেও বড়জোর এক মিনিট অজ্ঞান থাকবে লোকটা। তবে খানিকক্ষণের জন্য দুর্বল হয়ে পড়বে। তা ছাড়া একটা মিনিটের জন্য ওকে নীরব রাখতে পারলে পালাতে সুবিধে হবে ওর।

ভারি দেহটা রানার দেহের নীচে নিথর হয়ে গেল। লোকটার ওপর থেকে সরে পিস্তলটা তুলে নিল ও। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। পলিথিনের ব্যাগটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল। আর ঠিক এই সময় নীচ থেকে শোনা গেল লোকটার চিৎকার, জ্ঞান ফিরে এসেছে।

খোলা দরজার ওপাশে কী আছে ভাবার সময় নেই রানার। সোজা সামনে ছুটে গিয়ে অন্ধের মত লাফ দিল অন্যপাশে।

এগারো

চারপাশের নতুন পরিবেশ চোখে সয়ে আসতে একটু সময় লাগল। একটা বোট-বিল্ডিং ইয়ার্ডে ঢুকেছে ও, একটামাত্র জাহাজ বানানোর কাজ চলছে। ইলেকট্রিক করাত দিয়ে লোহার পাত কাটা ও হাতুড়ি পিটানোর জোর শব্দ হচ্ছে। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা। তারপর ধীরে ধীরে গ্যালারি ধরে এগিয়ে চলল। ওটার শেষ মাথায় কাঠের সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, নেমে গেছে একটা প্ল্যাটফর্মে। ওখানে একটা দরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে। দরজার ওপাশে রাস্তায় নামার সিঁড়ি, এবং মুক্তি। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় গার্ডের চিৎকার শুনতে পেল ও। হ্যাঙার থেকে দৌড়ে এসে প্রথম দরজাটার কাছে দাঁড়িয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফাঁকা গুলি করল একবার রানা। তারপর সিঁড়ি দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে উল্টোদিকের দরজার উদ্দেশে ছুটল। পিছন থেকে গুলির শব্দ হলো। রানার মাথার উপর কাঠের দেয়ালে লেগে বাতাসে শিস কেটে ছুটে চলে গেল বুলেট অন্যদিকে। এঁকেবেঁকে দরজা লক্ষ্য করে দৌড় দিল ও। আশপাশ দিয়ে প্রতিধ্বনি তুলে চলে গেল আরও তিনটে বুলেট।

আক্রান্ত হলে দুটো কাজ করার থাকে—পাল্টা আক্রমণ, নয় তো পালানো। এ মুহূর্তে পাল্টা আক্রমণ করে লাভ নেই, এবং পালানোর সুযোগ আছে। য পলায়তি স জীবতি! সুতরাং দ্বিতীয়টাই বেছে নিল ও। একটিবারের জন্যও পিছনে ফিরে না চেয়ে, দরজার ওপাশে সিঁড়ি বেয়ে সোজা রাস্তায় নেমে গেল। শ'খানেক গজ এগিয়েছে, এ সময় রাস্তার পাশের একটা গলির মুখ থেকে গাড়ির হর্ন শুনতে পেল।

ফিরে তাকিয়ে দেখে একটা ধূসর ক্যাডিলাক। ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে প্রথমে যে জিনিসটা চোখে পড়ল, সেটা হলো টুথব্রাশের মত খাড়া হয়ে থাকা মস্ত কালো গোঁফ।

'উঠে পড়ুন, সার। জাঙ্গিয়া পরে রাস্তায় ছোটাছুটি মোটেও ভাল দেখাচ্ছে না।' গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে ফারুক, দ্রুত হাতে পিছনের দরজা খুলে দিল।

'চালাও, ফারুক, চালাও!' সিটে বসে দরজা লাগাতে লাগাতে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

বলার প্রয়োজন ছিল না। চাকার তীক্ষ্ণ আর্তনাদের সঙ্গে খানিকটা রবার রাস্তায় রেখে আজাদি স্কয়্যারের বাজারের পাশ দিয়ে ছুটতে শুরু করল গাড়ি। চলে এল শহরের পিছনে কোটিপতিদের পাম গাছে ঘেরা গ্রীষ্মাবকাশগুলোর সারির কাছে।

কেউ ওদেরকে অনুসরণ করছে না, নিশ্চিত হয়ে নিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ, এবার গতি কমাও।'

গতি কমানোর কথা বলাতে হতাশ মনে হলো ফারুককে। গতি কমিয়ে ফিরে তাকাল। উত্তেজনায় ইঁদুরের গোঁফের মত কাঁপছে আর ঝাঁকি খাচ্ছে ওর গোঁফ। রানার হাতের প্যাকেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওতে কী আছে?'

'জানি না। হোটেলে গিয়ে খুলে দেখব। তুমি আমাকে নামিয়ে দিয়ে বাজারে যাও, নতুন ট্রাউজার আর শার্ট কিনে নিয়ে এসো। পারবে না?'

'আমেরিকান কাপড় কি পছন্দ হবে আপনার? এখানে আমেরিকান কাপড়ই বেশি, সার।'

'হবে, হবে,' রানা বলল। 'তবে বেশি রঙচঙে, চেক কিংবা স্ট্রাইপ কিনো না। এখন বলো তো, ওখানে কী করছিলে?'

শ্রাগ করল ফারুক। 'আর তো কিছু করার ছিল না। আপনি চলে যেতে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করলাম। ভাল লাগল না। শেষে মনে হলো আমাকে আপনার দরকার হতে পারে, ইয়ার্ডের কাছে গিয়ে বসে থাকাই ভাল।'

'ঠিকই করেছ, ফারুক। খুব ভাল করেছ। অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছ আমাকে।'

হোটেলে এসে ওখানকার সবচেয়ে ভাল রুমটা চাইল রানা। খাতা বাড়িয়ে দিল ডেস্ক ক্লার্ক। রানার অর্ধনগ্ন, রক্তাক্ত দেহের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রানার হাতের দামি অ্যাটাশে কেস কিছুটা আশ্বস্ত করল তাকে।

'আমার মালপত্র আসছে,' রানা বলল। 'ফারুক এলে আমি কয় নম্বরে আছি ওকে জানাবেন।'

রানার ঘরটা তৃতীয় তলায়। চমৎকার একটা ব্যালকনি আছে। বাগানের

ওপর দিয়ে সাগর চোখে পড়ে ওখান থেকে। রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ কিংবা অন্য কোনও জাঁকজমকের বালাই নেই ঘরটায়, তবে বেশ বড় একটা পরিষ্কার বাথরুম আছে, যে জিনিসটা এই মুহূর্তে খুব জরুরি। রানা বুঝল, ফাইভ স্টার শব্দ দুটো এই হোটেলের নামেরই অংশ, মানের নয়। কোথাও *ছারপোকা* কিংবা গোপন মাইক্রোফোন লুকানো আছে কি না দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রানা, কারণ ঘরটা আগে থেকে বুক করে রাখা হয়নি, কারও জানার কথা নয় ও এখানে উঠবে। সোজা বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিল। সামান্য ঝুঁকে কুঁজো হয়ে পিঠটাকে বাঁকা করে দিল পানিতে যাতে রক্ত ধুয়ে যেতে পারে।

গোসল সেরে তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে এ সময় দরজায় থাবা পড়ল। দরজা খুলে দিয়ে দেখে ছোট একটা রূপালী ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক বেয়ারা।

'একজন ভদ্রমহিলা এই কার্ডটা পাঠিয়েছেন, সার,' বলল সে। 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। নীচে বসে আছেন।'

'তা-ই নাকি?'

কার্ডটা তুলে নিয়ে নীরবে পড়ল রানা: নোভা ল্যাপটেভ, ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার। নীচে ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা।

অবাক হয়ে কার্ডটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

'ভদ্রমহিলাকে কী বলব, সার?'

হাসল রানা। 'বলবে, মিস্টার রানা নীচে নামতে পারবেন না, কারণ তাঁর গায়ে কোনও কাপড়চোপড় নেই, শুধু একটা তোয়ালে প্যাঁচানো। যদি তিনি এখানে আসতে রাজি হন, ওঁর হাতে এক বোতল ঠাণ্ডা শ্যাম্পেন আর দুটো গ্লাস দিয়ে দিয়ো। একজন ভদ্রমহিলাকে আপ্যায়ন করাই তো কর্তব্য, তা-ই না?'

রক্তশূন্য হয়ে গেল বেয়ারার চেহারাটা। লোকটা চলে গেলে চেপে রাখা হাসিটা বেরিয়ে আসতে দিল রানা। তারপর নোভার এই আকস্মিক আবির্ভাবের কথা ভেবে মিলিয়ে গেল হাসি। রোম আর প্যারিসে ওকে খুঁজে বের করাটা হয়তো কঠিন ছিল না নোভার পক্ষে। কিন্তু এখানকার কথা জানল কীভাবে? তারমানে কোনভাবে পিছু নিয়েছে, এবং বোনকে খোঁজার ব্যাপারে রানার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছে না। নিশ্চয় কোনওভাবে নিনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে নোভার, নিনাই নশাহ্রের এই হোটেলটার নাম জানিয়েছে। কিন্তু খুঁতখুঁত করতে থাকল রানার মন, কোথায় যেন একটা...

দরজায় টোকা পড়ল। বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখল রানা। ভেজা চুলের গোছা লেপটে রয়েছে কপালে। অনেকক্ষণ নোনা পানিতে ভিজে লাল হয়ে আছে চোখ। শার্ট, প্যান্ট কিছুই নেই পরনে।

শ্রাগ করল ও। একজন ভদ্রমহিলার সামনে যাবার মত আর কোনও

পোশাকই নেই, চেহারার অবস্থাও ভাল করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায়ই বাথরুম থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে দিতে চলল।

'রানা! এ কী অবস্থা তোমার?'

'ঠিকই আছি, ভয় পাবার কিছু নেই। তবে তোমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছি।'

'অবাক,' ঘরে ঢুকল নোভা, হাতে একটা ট্রে, তাতে শ্যাম্পেনের বোতল আর দুটো গ্লাস, 'হবারই কথা। তবে খুশি হওনি, তাই না? একটু খুশিও না।'

'একটু হয়েছি,' রানা বলল।

'প্যারিস থেকে বলতে গেলে সরাসরিই এখানে চলে এলাম।'

'দেখতেই তো পাচ্ছি।'

কয়লা-ধূসর একটা বিজনেস সুট পরেছে নোভা, আর সাদা ব্লাউজ। রানার বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, অন্য কোন পোশাক পরার সময় পাইনি। ভাগ্যিস, তেহরানে গরম কিছুটা কম এখন। কাল বাজারে যেতে হবে।'

'দেখো, ফারুক কী নিয়ে আসে। স্থানীয় ফ্যাশন হয়তো খারাপ লাগবে না তোমার।'

'ফারুক?'

'হ্যাঁ, ট্যাক্সি ড্রাইভার। আর আমার নতুন বাজার-সরকার। শ্যাম্পেন?'

'থ্যাংক ইউ। যা দেখাচ্ছে না তোমাকে!'

জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বোতলের ছিপি খুলছে রানা। চেঁচিয়ে উঠল নোভা, 'হায় হায়, তোমার পিঠে কী হলো! কাটলো কী করে এভাবে? অ্যান্টিসেপটিক লাগানো দরকার।'

'কী করে কেটেছে, সেটা বলতে পারব না। তবে তোমার বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এটা বলতে অসুবিধে নেই।'

'সত্যি? কোথায়?' হঠাৎ তরল ভঙ্গিটা ভারি হয়ে গেল নোভার।

'তেহরানে। আমার হোটেলে এসেছিল। দেখতে অবিকল তোমার মতন। যেন তোমারই একটা ডুপ্লিকেট কপি স্রেফ বাতাস ফুঁড়ে উদয় হয়েছিল।'

মুখ নামাল নোভা। আবার যখন তুলল, বিব্রত ভঙ্গিটা কিছুটা কাটিয়েছে। 'তা হলে তুমি জেনে গেছ ও আমার যমজ।'

'হ্যাঁ।'

'সরি, রানা। আগেই বোধহয় তোমাকে বলা উচিত ছিল। তবে তাতে কোন ক্ষতি হয়নি, তা-ই না?'

'হয়তো।'

'ও কেমন আছে, রানা? ভাল মনে হয়েছে?'

'দেখে তো তেমন কিছু বোঝা যায়নি। তবে সারাক্ষণই মনে হয়েছে, তোমার সঙ্গেই কথা বলছি, অথচ ওটা তুমি ছিলে না...'

'জানি। জানি। ও কি বলেছে, আমাদের মধ্যে কে বড়?'

'বলেছে। আর তোমার সঙ্গে ওর পার্থক্যটা কোথায়, তা-ও দেখিয়েছে।'

'কী? ও তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছে?' বিমূঢ় হয়ে গেছে যেন নোভা। 'এখানে?' বাঁ পায়ের উরুতে আঙুল রাখল নোভা।

'হ্যাঁ। নিরাপদে কথা বলার জন্যে একটা পার্কে নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে, ওখানে, ওই খোলা জায়গাতেই দেখিয়েছে। ও আসলেই বুনো টাইপের।'

'এখন আমারও ওই জন্মদাগটা আছে কি না দেখতে চাইবে মনে হচ্ছে? নিশ্চিত হবার জন্যে?'

হাসল রানা। 'না। তার দরকার আছে বলে মনে হয় না।' নোভার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ও। নিনার সঙ্গে চোখের রঙের অমিলটা দেখতে পাচ্ছে।

'গুড। এখন দেখি, আয়োডিন পাওয়া যায় কি না, তোমার ক্ষতটায় লাগানো দরকার।'

দরজার দিকে রওনা হলো নোভা।

'ফিরে এসে অবশ্যই জানাবে আমাকে,' রানা বলল, 'একজন প্যারিসিয়ান ব্যাংকার মধ্য জুলাইয়ের এই অসময়ে ক্যাস্পিয়ান রিযর্টে কেন এসেছে।'

'হ্যাঁ, বলব,' বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল নোভা।

একবার দ্বিধা করে খানিকটা শ্যাম্পেন গ্লাসে ঢালল রানা। চুমুক দিতে দিতে ভাবছে। অস্বীকার করতে পারবে না, নোভাকে দেখে খুশি হয়েছে ও। তবে, এই বিপদের মধ্যে এসে ওকে বেকায়দায়ও ফেলে দিয়েছে মেয়েটা। নিজেই যখন নাক পর্যন্ত ডুবে আছে বিপদে, সেখানে একটা মেয়ের নিরাপত্তা নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে এখন ওকে, বাড়তি ঝামেলা।

দশ মিনিট পর বাদামি রঙের একটা ওষুধের বোতল আর খানিকটা তুলো নিয়ে ফিরে এল নোভা। 'ঠিক জিনিস আনলাম কি না বুঝতে পারছি না। ফার্সি ভাষাটা খুব একটা জানি না আমি।'

'তবে তোমার বোন কিন্তু খুব ভাল জানে। আমাকে যে নকশাটা দিয়েছে, তাতে ফার্সিতেই নোট লিখেছে।'

'শেখার সময় পেয়েছে তো, তবে তার জন্যে কতটা খেসারত যে দিতে হয়েছে, বেচারি! এখন, চুপ করে বোসো তো!'

সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। তুলোয় আয়োডিন লাগিয়ে ওর পিঠের এখানে ওখানে চেপে ধরতে লাগল নোভা।

'ব্যথায় চিৎকার করে ওঠা উচিত তোমার,' নোভা বলল। 'ওয়েস্টার্ন

ছবিগুলোতে তো তা-ই করে।'

'আমিও করছি,' জবাব দিল রানা। 'তবে মনে মনে। তা ছাড়া অতটা লাগছেও না।'

'জিনিসটা আদৌ আয়োডিন কি না কে জানে, নাকি প্ল্যাসিবো? তোমার বুকেও তো কাটা দাগ।'

ঘুরে এসে রানার সামনে দাঁড়াল নোভা। নিচু হলো। ওর পরিষ্কার ঝকঝকে চুল থেকে 'লিলি-অভ-দ্য ভ্যালি'র গন্ধ পেল রানা। এত দূর থেকে উড়ে আসার পরও গন্ধটা একদম তাজা রয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র বাথরুম থেকে শ্যাম্পু করে বেরিয়েছে।

থেমে গেল নোভা। ওর এই দ্বিধা বুঝিয়ে দিল রানা যে ওকে লক্ষ করছে, টের পেয়ে গেছে ও। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে দুজনের মুখ।

'এখানে লাগাও,' গালের একটা কাটা দাগ দেখাল রানা।

'বেচারা,' নোভার চোখে বিড়ালের দৃষ্টি।

প্রথমে আলতো করে চুমু খেল কাটা দাগটায়। তারপর তুলো চেপে ধরল নোভা।

'এখন একটু ভাল লাগছে?'

'লাগছে,' দাঁতে দাঁত চেপে রানা বলল।

'এখানে?' ঘাড়ের আরেকটা কাটা দাগে চুমু খেল নোভা। তুলো চেপে ধরল।

'আর এখানে,' নীচের ঠোঁটটা দেখাল রানা।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওখানেও দেব। আহা, বেচারা!'

রানার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল নোভা। ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। ওর নিষ্ঠুর দুই ঠোঁটের ভিতর ঢুকে গেল নোভার নরম অধর।

হঠাৎ নোভাকে ছেড়ে দিয়ে রানা বলল, 'এবার তোমার জন্মদাগটা আছে কি না দেখা যাক। সত্যিই যে তুমি নোভা, তার প্রমাণ দেখে শিওর হয়ে নেওয়া উচিত।'

মুখ লাল হয়ে গেছে নোভার। ঘন ঘন দম নিচ্ছে। কোনরকম দ্বিধা না করে স্কার্টের নীচের অংশ তুলে ধরল ও। লম্বা নাইলনের মোজা হাঁটু ছাড়িয়ে উঠে এসেছে। সেটা আর লাল সুতির প্যান্টির মাঝে সাদা উরুতে কোনওরকম দাগ নেই।

হাসল রানা। 'একেবারেই নিখুঁত।' নোভার হাত চেপে ধরল। ওর চুলে চুমু খেয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'ব্যাংকাররা যে লাল প্যান্টি পরে জানতাম না।' নিনার তলপেটের নীচে যে দাগটা ছিল, সেটার কথা ভাবল রানা।

এবার তোমার স্কার্টটা খোলো দেখি, আর একটা দাগ দেখিয়েছিল নিনা।' বলে আবার চুমু খেল নোভার ঠোঁটে।

এবারও কোনরকম দ্বিধা করল না নোভা। প্রথমে জ্যাকেট খুলল। তারপর ব্লাউজ। আণ্ডারওয়্যার টেনে নামানোর আগেই ওর কাছে পৌঁছে গেল রানা। জড়িয়ে ধরে গভীর চুম্বন করল। এক হাত বুলাচ্ছে ওর নগ্ন পিঠে। অস্থির হাতে নোভা ওর তোয়ালের গিঁট অর্ধেক খুলে ফেলেছে, এমনি সময় টোকা পড়ল দরজায়।

'মিস্টার রানা, সার, আমি ফারুক। আপনার কাপড় নিয়ে এসেছি।'

'আসার আর সময় পেল না ব্যাটা?' বিড়বিড় করল রানা। তোয়ালেটায় গিঁট দিল। নোভার লাল হয়ে ওঠা হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি। আমাদের কপাল খারাপ।'

ভারি দম নিল নোভা। ভঙ্গি দেখে মনে হলো শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে খুলে ফেলা কাপড়গুলো তুলে নিল মেঝে থেকে।

'ভবিষ্যতে,' বলল রানা, 'প্রমিয?'

'হ্যাঁ, ভবিষ্যতে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল নোভা, 'প্রমিয!'

হোটেলের ডাইনিং রুমে খেতে বসল ওরা তিনজন। ফারুককেও ওদের সঙ্গে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে রানা।

সাদা রঙের একটা শার্ট গায়ে দিয়েছে রানা। আর নেভি ব্লু রঙের কটন ট্রাউজার। কোমরের কাছে সামান্য ঢিলা, সঠিক মাপের আনতে পারেনি ফারুক। তবে এ নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা। নশাহ্‌রের বেশির ভাগ মানুষের পরনে যা দেখেছে, তারচেয়ে ওর পোশাক অনেক ভাল।

টুরিস্ট শপ থেকে নিজের জন্য হালকা একটা পোশাক কিনে এনেছে নোভা। যদিও পছন্দ হয়নি মোটেও। ওর ধারণা, এটা একেবারেই বুড়ো মানুষের পোশাক। ওর গাঢ় বাদামি চোখের সঙ্গে হালকা নীল এই পোশাকটা একেবারেই বেমানান। একটা ঘর নিয়েছে রানার সঙ্গে একই তলায়, করিডোরের একেবারে শেষ মাথায়।

খেতে খেতে আলোচনা চলল। বোট-বিল্ডিং ইয়ার্ডে দেখে আসা উভচর বিমানটার প্রসঙ্গ তুলল রানা। 'কোনভাবে ওটার একটা ছবি তুলতে পারলে লণ্ডনে বিএসএস-এর হেডঅফিসে পাঠিয়ে দিতে পারতাম।'

'অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে,' নোভা বলল। 'সাইন্স ফিকশনের মত।'

'কিন্তু আছে ওই জিনিসটা,' রানা বলল। 'আমার ধারণা, রাশিয়ায় তৈরি।'

'পিটসেনের দিকেই তো আঙুল দেখাচ্ছে,' নোভা বলল। 'ওর ব্রিটিশ-

বিদ্বেষের কথা আমি তোমাকে বলেছি।'

'আমার কাছে কিন্তু ক্যাস্পিয়ান সাগর-দানবের মত লাগছে, সার,' ফারুক বলল।

অন্য একজন লোক যে ওদের সঙ্গে বসে খাচ্ছে, ভুলেই গিয়েছিল রানা। তাড়াতাড়ি খাবারের প্লেটের দিকে নজর দিল।

আর ফারুক খাবারের প্লেটের দিক থেকে মুখ তুলে তাকাল। গোঁফে লেগে থাকা রুটির কণা হাত দিয়ে মুছে বলল, 'ক্যাস্পিয়ান সাগর-দানব, বুঝলেন, সার? এ বছরই বারকয়েক দেখা গেছে।'

'দেখা গেছে?'

'হ্যাঁ। প্লেন থেকে, সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময়। মাছ ধরতে এখন সাগরে বেরোলে ভয়ে ভয়ে থাকে জেলেরা, কখন এসে দানবটা হামলা চালায়। গাড়ির চেয়ে জোরে ছোটে। ওদের ধারণা, ওটা জ্যান্ত প্রাণী। স্কটল্যাণ্ডের লেকের সেই বিখ্যাত দানবটার মত।'

'লক নেস?'

'হ্যাঁ।'

'আকাশ থেকে দেখলে দানবই মনে হবে। তবে ওটা একটা যন্ত্র,' রানা বলল। 'নিশ্চয় মাদক পাচারের কাজে ব্যবহার হয়।'

ডালিম ও রোস্ট করা হাঁসের মাংস নিয়ে হাজির হলো ওয়েইটার। সেই সঙ্গে মরিচ আর অন্যান্য ঝাঁঝাল মশলা দেয়া সালাদ। দেখে ভালই মনে হলো রানার।

'রাতে আবার ওখানে ফিরে গেলে কেমন হয়?' নোভা বলল, 'অন্ধকারে ওরা দেখতে পাবে না আমাদের।'

'আমাদের মানে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'আমিও যাচ্ছি। এক জোড়া বাড়তি চোখ পাহারায় থাকলে সুবিধেই হবে তোমার।'

'তা হলে আমিও আসতে পারি,' ফারুক বলল। 'দুই জোড়া চোখ থাকলে আরও বেশি সুবিধে।'

'না, অসুবিধে। একবার পালিয়ে এসেছি, এখন ওরা অনেক বেশি সতর্ক হয়ে থাকবে। আর একবার যেতে হবে আমার, কিন্তু তোমাদেরকে নিয়ে ভিতরে ঢোকা মোটেও উচিত হবে না।'

'আমরা সাথে থাকলে তোমার কোনও না কোন কাজে লাগতে পারি,' জোর দিয়ে বলল নোভা।

চেয়ারে হেলান দিয়ে উয়িস্কির গ্লাসে চুমুক দিল রানা। আমতা আমতা করে বলল, 'তোমাদেরকে হোটেলে রেখে যেতেও সাহস পাচ্ছি না। যে-কোনও মুহূর্তে

ওরা এসে হানা দিতে পারে।' একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলো। তবে তোমরা বাইরে লুকিয়ে থাকবে, আমি একা ভিতরে ঢুকব। আমার পিস্তলটা জামা-কাপড়ের মধ্যে পেঁচিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম ডাস্টবিনের আড়ালে, ওটা সংগ্রহ করতে হবে। ফারুক, তোমার গাড়িতে একটা ভারি আমেরিকান পিস্তল রেখে এসেছি—গার্ডের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া—খাওয়া শেষ হলে ওটা নিয়ে আমার কামরায় চলে এসো। আমরা কে কী করব সেই প্ল্যান ছকে ফেলতে হবে আগেই। নোভা, পিস্তল চালাতে পারো?'

'আমি তো নিরীহ এক ব্যাংকার রানা, ওসব কখনও...'

'তা হলে তো তোমাকে সঙ্গে নেয়া যাবে না।'

'শিখে নিতে পারব না অল্প সময়ে?'

'কামরায় ফিরে দেখব সেটা।'

খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এল রানা। আবার পায়ে বাঁধল কমাণ্ডো নাইফটা। ওয়ালথার পিপিকেটার জন্য বাড়তি দুটো ক্লিপ ভরল পকেটে। অ্যাটাশে থেকে বের করে টেবিলে রাখল দামি আণ্ডারওয়াটার ক্যামেরাটা। একটা আল্ট্রা-হাই-স্পিড ফিল্ম ভরল তাতে।

টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল নোভা ও ফারুক।

'এনেছ?' হাত বাড়াল রানা।

ঢোলা প্যান্টের পকেট থেকে মিরজুমলার কামানের সমান একটা পয়েন্ট ফোর-ফাইভ স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তল বের করে দিল ফারুক। ম্যাগাজিন বের করে পাঁচটা গুলি সাজাল রানা টেবিলের উপর, চেম্বার থেকে একটা বুলেট বের করে রাখল ওগুলোর পাশে। অর্থাৎ, মোট সাতটা বুলেট ছিল ওতে—একটা খরচ করেছে রানা, বাকি আছে ছয়টা। ওগুলো ম্যাগাজিনে ভরল ও আবার, স্লাইড টেনে চেম্বারে একটা বুলেট এনে সেফটি অন করে রাখল।

'কে নেবে এটা?'

ফারুককে মাথা নাড়তে দেখে নোভার দিকে ফিরল রানা। আগ্রহে চকচক করছে মেয়েটার চোখ।

'কিন্তু তুমি তো কলম ছাড়া আর কোনও অস্ত্রের ব্যবহার জানো না বললে। তুমি ট্রিগার টিপলে আমরা দুজন মারা পড়ব না তার কী গ্যারান্টি?' নোভার চোখের আলো নিভে যাচ্ছে দেখে চট করে বলল, 'এদিকে এসো। দেখো। দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াবে, এই এভাবে,' উঠে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিল রানা। 'দুই হাতে চেপে ধরে সোজা এভাবে তাক করবে অস্ত্রটা—সেই সঙ্গে এই ছোট্ট সেফটি ক্যাচটা বুড়ো আঙুলের মাথা দিয়ে টেনে নামাবে। এবার আস্তে করে চাপ দেবে ট্রিগারে। হ্যাঁচকা টান নয়। তাড়াহুড়ো করবে না। নিশানা করবে বুক থেকে

কোমর পর্যন্ত যে-কোনও জায়গায়।' পরপর তিনবার দেখাল রানা কীভাবে গুলি করে।

'বুঝেছি,' নোভা বলল। 'হিসেবের খাতার জমা-খরচ লেখার চেয়ে কঠিন মনে হচ্ছে না।'

'গুড। এবার যা-যা বলেছি, করে দেখাও আমাকে।'

দেখাল নোভা। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে দিল রানা।

'আর শুধু দুটো কথা খেয়াল রাখবে: এক, যাকে গুলি করতে চাও না, তার দিকে ভুলেও অস্ত্র তাক করবে না—পিস্তলে গুলি থাক বা না থাক। দুই, গুলি ছোঁড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ট্রিগার স্পর্শ করবে না। ঠিক আছে?'

'আর আমার কী কাজ, সার?' জানতে চাইল ফারুক।

'তুমি কাছে-পিঠেই থাকবে, আমাদের থেকে বেশ অনেকটা পিছনে। আবার ওই নোংরা পানিতে সাঁতরাতে পারব না। মূল বিল্ডিঙের ভিতর দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করব আমরা এবার। তুমি নিরাপদ দূরত্ব থেকে নজর রাখবে আমাদের ওপর। যদি দেখো কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে চলেছে, আলগোছে গা ঢাকা দেবে।' পলিথিনের প্যাকেটটা ওর হাতে দিল রানা, সেই সঙ্গে একটা চিঠি। 'আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা নয়, তোমার আসল কাজ সামান্যতম বেগড়বাঁই দেখলেই ছুটে তেহরানে গিয়ে এই দুটো জিনিস আবু হাশিমের কাছে পৌঁছে দেয়া। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল ফারুক।

'এটা আমি, ইয়ে...কোথায় রাখব?' নোভা জিজ্ঞেস করল।

'তোমার হ্যাণ্ডব্যাগে জায়গা নেই?'

ব্যাগ খুলে পিস্তলটা ভরার চেষ্টা করল নোভা। 'নাহ্, মেকআপগুলো ফেলতে হবে, নইলে জায়গা হবে না।'

'ফেলতে হলে ফেলো। কিছু চাইলে কিছু তো বিসর্জন দিতেই হয়,' রানা বলল। 'এবার রওনা হব। চলো।'

রাতের নীরবতা ভেদ করে এগিয়ে চলল ধূসর ক্যাডিলাক। রানার নির্দেশে গতি কমিয়ে রেখেছে ফারুক। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ, তার সঙ্গে ঐকতান জুড়েছে যেন ঝিঁঝির সম্মিলিত ঐকতান। বাতাসে স্থির হয়ে আছে কমলার ঝোপ থেকে আসা ফুলের মিষ্টি সুগন্ধ।

'এহ্হে, ভুলেই গিয়েছিলাম,' হঠাৎ বলল রানা। 'কুকুরের কথা মনেই ছিল না।'

'কুকুর?' ফারুক বলল।

'হ্যাঁ। রাতের বেলা প্রহরী হিসাবে কুকুর থাকবে মনে হয়।'

মাথা নাড়ল ফারুক। 'ইরানে কেউ কুকুর পোষে না। এটা ইয়োরোপিয়ানদের স্বভাব। বড্ড নোংরা প্রাণী। আমরা ওদের রাস্তায় দেখতেই পছন্দ করি।'

শহরের রেসিডেনশিয়াল এরিয়া ছাড়িয়ে এল গাড়ি। রাস্তার বাতিও কমে এসেছে। স্ট্রিট-ল্যাম্প এখন অনেক দূরে দূরে। ডকের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় প্রবেশ করল গাড়ি। এগিয়ে চলেছে ছায়ার মত। আর কোনও গাড়ি কিংবা গাড়ির হেডলাইট দেখা যাচ্ছে না, হর্ন শোনা যাচ্ছে না। এখানে এই সাগরের কিনারে অন্ধকার যেন জীবনের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়েছে।

গাড়ির ভিতর চুপচাপ বসে আছে তিনজন। আসন্ন অ্যাডভেঞ্চারের কথা ভাবছে রানা। ভারি দম নিয়ে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করল।

'এখানেই রাখো,' রানা বলল। প্ল্যান একটু পরিবর্তন করেছে: 'তুমি ওই ওদিকটাতে গিয়ে অপেক্ষা করবে। বেশি কাছে এসো না। যা-ই ঘটুক, তোমাকে পালাতে হবে, ধরা পড়া চলবে না কিছুতেই। খেয়াল থাকবে তো? আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি আমরা। নোভা, তুমি এসো আমার সঙ্গে।'

মেইন রোড ধরে হেঁটে চলল দুজনে। কিছুদূর এগিয়ে ঘুরে রওনা হলো বোট-বিল্ডিং ইয়ার্ডের দিকে। কয়েকটা বাতি জ্বলছে। তবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হলো না রানা।

'তুমি এখানে থাকো। এই ট্রাকটার পিছনে। আমি এগোচ্ছি, আমাকে কাভার দাও।'

বিল্ডিঙের পাশের ছায়ায় থেকে এগোল রানা। তারপর হঠাৎ করেই আলোতে বেরিয়ে এল। ধাতব হ্যাঙারটার দিকে দৌড়ে গিয়ে বসে পড়ল আবর্জনার স্তূপের আড়ালে। হাত দিয়ে ওর কাপড়ের পুঁটুলিটা খুঁজল। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই হাতে এসে গেল প্রিয় ওয়ালথার পিপিকে। লক্ষ্য স্থির করার সময় পেলে বিশ গজ দূর থেকেও এটা দিয়ে মাকড়সার ডিম ফাটিয়ে দিতে পারে ও।

খোলা চত্বরের ওপর দিয়ে তাকাল রানা, যে লরিটার পিছনে নোভা লুকিয়েছে, সেদিকে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, যাতে মাটিতে ওর ছায়া না পড়ে। গুড গার্ল, ভাবল রানা।

বিল্ডিঙের পাশ ঘুরে সেই দরজাটার দিকে এগোল ও, যেটা দিয়ে এর আগে একবার বেরিয়ে এসেছিল। ভিতর থেকে তালা লাগানো। পকেট নাইফ দিয়ে ভিতরের ছোট লিভারটা খোলার চেষ্টা করল ও। সহজেই খুলে গেল তালা। নোভা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে এখন। কাঠের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ওরা। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলল, রানা আগে, নোভা পিছনে। প্রহরার কোনোই ব্যবস্থা নেই, একজন লোকও দেখা যাচ্ছে না কোথাও, ব্যাপারটা যেমন অবাক করল রানাকে, তেমনি উদ্বিগ্ন। অতি সাধারণ একটা কারখানাতেও অন্তত একজন নাইটগার্ড

থাকে, আর এখানে তো বিশাল কর্মকাণ্ড চলছে। গ্যাংওয়ে ধরে ধাতব ছাউনি দেয়া হ্যাঙারের প্রবেশপথের দিকে এগোল ওরা।

নোভার কব্জি চেপে ধরল রানা। 'শোনো, ব্যাপারটা খুব সহজ মনে হচ্ছে না? তার মানে ফাঁদ। তুমি এখানেই থাকো। পিস্তল হাতে আমাকে কাভার দাও। সেফটি ক্যাচ অফ করো। পারছ না? হ্যাঁ, এই তো হয়েছে। গুড গার্ল।'

দরজার হুড়কো খুলে মেইন হ্যাঙারে ঢুকল রানা। ও যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে বিশাল, ভয়ঙ্কর একটা জলদানবের মতই দেখাচ্ছে উভচর বিমানটাকে।

ছবি তুলতে আরম্ভ করল ও। কয়েকটা শট নেয়ার পর নীচে ক্রেনের কাছে নেমে গেল ক'টা ক্লোযাপ ছবি তোলার জন্য। ক্যামেরাটা সবে উঁচু করেছে, হ্যাঙারের ভিতর গমগম করে উঠল একটা জোরালো কণ্ঠ, 'আরও বেশি আলো চাই, মিস্টার রানা?'

হঠাৎ উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে গেল হ্যাঙারের ভিতরটা। আলো থেকে চোখ বাঁচাতে ঝটকা দিয়ে সামনে হাত নিয়ে এল রানা। ধাতব ওঅকওয়ে ধরে ছুটে আসা বুট পরা কয়েকটা পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠ, মেগাফোনে কথা বলছে, 'দয়া করে পিস্তলটা নামিয়ে রাখুন, মিস্টার রানা। দুই হাত মাথার ওপরে তুলুন। আপনার কাজ আপাতত শেষ।'

আলোকিত ফিউযেলাজের দিকে তাকাল রানা। হাইড্রলিক মেশিনের সাহায্যে মসৃণভাবে খুলে যাচ্ছে ককপিটের ওপরের অংশ। খোলা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ফরাসি সামরিক বাহিনীর কেপি, তার নীচে এক জোড়া কাঁধ, সবশেষে বেরিয়ে এল লির দেহটা। দুই হাতে ভর রেখে দোল দিয়ে ককপিট থেকে বেরোল ও, ফিউযেলাজ ধরে হেঁটে এল রানার দিকে। হাতে একটা সেমি-অটোম্যাটিক রাইফেল।

রাইফেল তুলে রানার মাথার দিকে নিশানা করল লি। অভিব্যক্তিহীন, মরা মানুষের মুখের মত চেহারা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

একটা মাত্র গুলির শব্দ হলো। অন্ধকারে ঢেকে গেল হ্যাঙারটা। সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। কী ঘটেছে বোঝার সময় নেই, তবে এটুকু বুঝতে পারছে, এই অন্ধকারকে কাজে লাগানো দরকার। নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে মইয়ের দিকে এগোল। মই বেয়ে মাত্র একটা ধাপ নেমেছে, জোরে কীসের যেন বাড়ি লাগল কানের পিছনে। মুহূর্তে গাঢ় আঁধারে ঢাকা পড়ল সবকিছু, ইরানি রাতের চেয়েও অনেক বেশি অন্ধকার।

বারো

জ্ঞান ফিরলে রানা দেখল, টারমাকের ওপর দিয়ে ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা হেলিকপ্টারের দিকে। রাতের বাতাসে আলোড়ন তুলে ঝিরঝির শব্দে ঘুরছে ওটার ব্লেডগুলো। চামড়ায় বাতাসের স্পর্শ বুঝিয়ে দিচ্ছে, ওর খাটো আণ্ডারপ্যান্ট বাদে সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয়া হয়েছে। দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। কমাণ্ডো নাইফটাও গায়েব। কানের পিছনে খুলিতে এতই ব্যথা, গা গোলাচ্ছে। ধাক্কা দিয়ে ওকে হেলিকপ্টারে তোলা হলো। ভিতরটা মিলিটারি হেলিকপ্টারের মত, পাইলটের পিছনে বসানো পুরানো আমলের সিট, ছয়জনের জায়গা হয়। কাঁধে চাপ দিয়ে মেঝেতে বসিয়ে দেয়া হলো রানাকে। শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো গোড়ালি। আরেকটা দেহের স্পর্শ পেল রানা, নরম দেহ—দুজনের পিঠে পিঠ লাগিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো। নোভাই হবে, ভাবল রানা। পায়ের ধাক্কায় ফেলে দেয়া হলো মেঝেতে।

বমি ঠেলে উঠছে রানার। কী ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করল ও। মনে পড়ল উজ্জ্বল আলোর কথা... তারপর, কিছু নেই। হেলিকপ্টারের রোটরের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, রেগে গেছে ওগুলো, চাপ সৃষ্টি করছে কানের পর্দায়। ঝাঁকি দিয়ে ওপরে উঠল যানটা, ভীষণভাবে দুলতে শুরু করল, কাত হয়ে গেছে একপাশে, রানার দেহের চাপ পড়ল মেয়েটার দেহে, ককিয়ে উঠল মেয়েটা। চিনতে কষ্ট হলো না রানার।

'নোভা?'

ধাঁই করে একটা লাথি লাগল রানার মুখে। ওর মনে হলো, চোয়ালটা ভেঙেই গেছে।

'কোনও কথা নয়,' বলল একটা রুক্ষ, কঠিন কণ্ঠ।

মুখ ফিরিয়ে রানা দেখল ছয়টা সিটই ভর্তি, সশস্ত্র গার্ডরা বসে আছে। ছয়টা অটোম্যাটিক রাইফেলের নল তাকিয়ে আছে ওদের দুজনের দিকে, ছয়টারই সেফটি ক্যাচ অফ করা, ছয় জোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি যেন বিদ্ধ করছে ওদেরকে। প্রতি মিনিটে মাথার যন্ত্রণাটা আরও বাড়ছে ওর। স্মৃতিতে ফিরে আসছে ঘটনাগুলো। লির উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, মিথ্যে বলেনি নিনা; *ক্যাস্পিয়ান দানবের* সঙ্গে পিটসেনের সম্পর্ক আছে, মরুভূমিতে ওর আস্তানাতেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে।

থুতু ফেলল ও। রক্ত পড়ল থুতুর সঙ্গে। ভাবছে, পিটসেনের লোকেরা ওকে নিয়ে না গেলে লোকটার হেডকোয়ার্টার খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতো না।

ঘণ্টাখানেক পর নীচে নামতে আরম্ভ করল হেলিকপ্টার। গার্ডদের চোখে উত্তেজনা দেখতে পেল রানা। ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার। রুক্ষকণ্ঠে আদেশ শোনা গেল। উঠল না ছয়জন গার্ড, তবে ওদের রাইফেলের নলের মুখ রানাদের দিকে এগোল আরও। বাইরে ডিজেলচালিত ইঞ্জিনের শব্দ হলো, তেলের লরি হবে হয়তো। খোলা লোডিং বে দিয়ে ধুলো উড়ে আসছে।

তেল নেয়া শেষ হলে আবার উড়ল হেলিকপ্টার। কোন্‌দিকে যাচ্ছে ওরা, মেঝেতে পড়ে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। আর কিছু করারও নেই যেহেতু, ঘুমানোর চেষ্টা করল রানা। নোভাকে সান্ত্বনা দিতে পারত, কিন্তু কথা বলতে গেলেই লাথি খেতে হবে। কাজেই সে-চেষ্টা করল না।

মনে হলো সারাটা রাত একটানা উড়ে চলার পর আবার নীচে নামছে হেলিকপ্টার। উঠে দাঁড়াল গার্ডরা। প্রথমে বুট দিয়ে লাথি মারল বন্দিদের, তারপর রুক্ষহাতে হ্যাঁচকা টানে তুলে দাঁড় করাল। ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার। রোটরের ঘূর্ণন বন্ধ হলো। সিঁড়ি নামানো হলো। সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়া হলো বন্দিদের। ধাতব সিঁড়িতে চামড়া ছিলে যাওয়ায় চিৎকার করে উঠল নোভা। বালিতে বসানো একজোড়া রেল লাইনের ওপর একটা ঠেলাগাড়ির মত বিদ্যুৎচালিত গাড়ি। দুদিক থেকে তুলে ধরে গাড়িটার ওপর বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলল ওরা রানা ও নোভাকে, তারপর নিজেরাও উঠে পড়ল।

দুর্গের দেয়ালের মত দেখতে প্রায় ষাট ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের দিকে ছুটল গাড়ি। কাছে আসতেই পিছলে সরে গেল পাহাড়ের দেয়ালে বসানো একটা দরজা, তার ভিতরে ঢুকল গাড়ি। পিছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল আবার দরজাটা। রানার মনে হলো দৈত্যের পেটের মধ্যে ঢুকেছে।

গোলাকার একটা প্ল্যাটফর্মের উপর এসে থেমে গেল গাড়ি। হাইড্রলিক যন্ত্রপাতির হিসহিস শব্দ শোনা গেল। গাড়িটাকে নিয়ে নীচে নামতে শুরু করল প্ল্যাটফর্মটা, গোল একটা টিউবের ভিতর দিয়ে। তিরিশ ফুট নীচে মাটিতে পৌঁছে থামল। প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে গাড়িটা অন্ধকার একটা করিডোর ধরে এগিয়ে বড় একটা দরজার সামনে দাঁড়াল। রানা ও নোভাকে গাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে নামাল গার্ডরা। দরজা দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলল একটা সেলের ভিতর।

দরজায় দেখা দিল লি। 'থাকুন এখানে। বেরোনোর কোন পথ নেই। বাড়াবাড়ি করলে খুন হয়ে যাবেন।'

ঘটাং করে লেগে গেল দরজার পাল্লা। বাইরে থেকে হুড়কো লাগিয়ে দেয়া হলো। ঘরটা ছয় বাই ছয় ফুট। পাথরের দেয়াল। বালির মেঝে।

'কী অবস্থা তোমার?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'আছি। তোমার?' নোভার কণ্ঠ দুর্বল, যেন কেঁদে ফেলবে।

'মাথা ধরেছে। ওটা তেমন কিছু না। তোমার গা কি খালি? কাপড়চোপড় কিছু নেই?'

'শুধু এটা,' নিতম্ব নাড়ল নোভা।

'লাল প্যান্টি?'

'সাদা। তুমি যেটা দেখেছ, সেটা নয়। ডিনারের আগে বদলে নিয়েছিলাম।'

'হ্যাঙারের ভিতর কী ঘটেছিল বলো তো? আমার মনে আছে, আলো জ্বলে উঠল। তারপর...'

'ফিউযেলাজের ওপর থেকে নেমে এল লি। ভাবলাম, ও তোমাকে খুন করবে। তাই গুলি করেছিলাম।'

'ওকে লক্ষ্য করে?'

'না। মেইন ইলেকট্রিক লাইনটাকে লক্ষ্য করে। আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে ছিল।'

'তাতে কী। খুব ভাল নিশানা না হলে মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকেও তারে লাগানো কঠিন।'

'প্রচণ্ড ঝাঁকি, মনে হলো যেন লাথি মেরেছে পিস্তলটা। তুমি যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলে, সেভাবেই ট্রিগার চেপেছি, হ্যাঁচকা টান মারিনি। ভেবেছিলাম, আলো নিভিয়ে দিলে অন্ধকারে তুমি পালাতে পারবে।'

'অনেক বেশি লোক ছিল ওরা।'

'এখন কী হবে, রানা?'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা। 'মরুভূমির মাঝখানে আমাদেরকে অকারণে নিয়ে আসেনি পিটসেন। ইচ্ছে করলে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলতে পারত।'

'তো?'

'নিশ্চয় কোনও উদ্দেশ্য আছে ওর। হয়তো আমাদেরকে ব্যবহার করতে চায়।'

'নাকি তথ্য আদায় করবে?'

'হয়তো,' রানা বলল। 'দেখা যাক, যখন সময় হবে, জানতে পারব। এখন বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করাই ভাল। নোভা, ইরানে কেন এসেছিলে তুমি, আমাকে কিন্তু বলনি।'

'এখন শুনলে হাস্যকর মনে হবে তোমার কাছে,' নোভা বলল। সামান্য মোড়ামুড়ি করল ও। 'বলো, শুনলে হাসবে না?'

'হাসার মত অবস্থা নেই আমার দাঁতের।'

'আমি ছুটিতে।'

'মানে?'

'কেন, ব্যাংকারদের কি বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না? তিন হপ্তার বার্ষিক ছুটি পাওনা হয়েছে আমার, তার মধ্যে দশ দিন নিয়েছি। পিটসেনের খপ্পর থেকে নিনার মুক্ত হওয়াটা নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলাম। কাজে মন বসাতে পারছিলাম না। তা ছাড়া ইরান দেখার এই সুযোগটাও হাতছাড়া করতে চাইনি।'

হাসবে না বললেও হাসতে শুরু করল রানা, শুকনো হাসি। তারপর মনে হলো, না হাসলেই ভাল করত। হাসির ঝাঁকুনিতে পিঠের কাটাগুলো ডলা খাচ্ছে নোভার পিঠে।

'এখন প্রাণ ভরে ইরান দেখছ,' মেঝের বালি আর পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'একেবারে মাটিতে নাক ঠেকিয়ে।'

বেশ অনেকক্ষণ পর হুড়কো খোলার শব্দ হলো। দরজা দিয়ে আলো এসে পড়ল করিডোর থেকে সেলের ভিতর। বালিতে গাল গুঁজে রেখে পড়ে ছিল রানা, নড়তে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল।

ঘরে ঢুকল দুজন গার্ড। একজন ছুরি দিয়ে ওদের সমস্ত দড়ি কেটে দিল, শুধু কব্জির বাঁধন ছাড়া। দ্বিতীয়জন পানি দিল। হাত বাঁধা অবস্থায়ই পানি খেল দুজন।

'ওঠো,' আদেশ দিল গার্ড।

অস্ত্রের মুখে ওদেরকে একটা আদিম ওয়াশরুমে নিয়ে আসা হলো। খুব কাছে থেকে পাহারা দিয়ে ওদের হাতমুখ ধোয়া আর পায়খানা-প্রস্রাবের সুযোগ দেয়া হলো।

'একটা শার্ট দেবে?' নিজের উন্মুক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল নোভা।

মাথা নাড়ল গার্ড। ওয়াশরুম থেকে ওদের বের করে, আরেকটা করিডোর ধরে আনা হলো একটা স্টেইনলেস-স্টিলের দরজার কাছে।

'দাঁড়াও এখানে,' গার্ড বলল।

দরজার পাশের স্লটে কোডওয়ালা কার্ড ঢোকাল ও। গোপন ক্যামেরা ওর চেহারা চিনতে পারল। খুলে গেল দরজা। খোলামেলা একটা এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরে দুজনকে ঠেলে দিল গার্ড। টকটকে লাল ঘর। মেঝে, ছাত, দেয়াল সহ ঘরে এমন কিছু নেই যেটার রঙ পপি ফুলের মত লাল নয়। ডেস্কের ওপাশে লাল গদিওয়ালা পুরানো ফ্যাশনের একটা সুইভেল চেয়ারে বসে রয়েছে বাঁ হাতে দস্তানা পরা একজন মানুষ।

'এহ্হে, কীভাবে নিয়ে এলে! ছি! মেয়েমানুষটাকে একটা শার্ট দাও,' ধমকে

উঠল ড. অ্যালফ্রেড পিটসেন। কণ্ঠস্বরে এতই বিরক্তি, অবাক লাগল রানার, সব মেয়েদেরকেই কি এরকম ঘৃণা করে লোকটা?

উঠে দাঁড়াল পিটসেন। ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এল। পরনে ক্রিম রঙের লিনেন সুট, নীল শার্ট, লাল টাই। উঁচু কপালের কাছ থেকে পিছনে টেনে আঁচড়ানো লম্বা চুল শার্টের কলারের ওপর ঝুলে রয়েছে।

রানার মুখোমুখি দাঁড়াল ও। 'শেষ পর্যন্ত তা হলে আমার এখানে আসতেই হলো আপনাকে, মিস্টার রানা। তবে আমার ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাববেন না দয়া করে।'

জবাব দিল না রানা। নোভার জন্য ধূসর একটা আর্মি শার্ট নিয়ে এল একজন লোক। একই রঙের একটা শার্ট আর ট্রাউজার রানাকেও দেয়া হলো।

'বসুন।' দুটো কাঠের চেয়ার দেখাল পিটসেন। 'মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন, কথার মাঝখানে কথা বলবেন না। এখন আমরা টেনিস খেলছি না। একটা জরুরি কাজ করে দেয়ার জন্যে আনা হয়েছে আপনাকে। প্রথমে আপনাকে আমার কারখানা দেখাব। তারপর কী করতে হবে, জানাব। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ও হ্যাঁ, আপনাকে যদি শুধু রানা বলি, মিস্টার-ফিস্টার বাদ দিই, নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না?'

জবাব না দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'নোভাকে দিয়ে কী করাবেন?'

'ওর ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই আমার। তবে হয়তো আমার কর্মচারীরা আগ্রহী হবে।'

'আমার বোনকে কী করেছেন?' নোভা জিজ্ঞেস করল। 'নিনা কোথায়?'

নোভার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পিটসেন। দস্তানা পরা হাতটা দিয়ে ওর চিবুক চেপে ধরে ঝটকা দিয়ে একবার ডানে, একবার বাঁয়ে ঘোরাল। দস্তানা সরে যেতে ওর কব্জির কালো রোম দেখতে পেল রানা।

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না,' নোভাকে বলল পিটসেন। 'নিশ্চয় কিছু গুজব শুনেছ। যারা গুজবে কান দেয়, তাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে আমাদের।'

'আমার বোন কোথায়? ওকে আপনি...'

দস্তানা পরা বাঁ হাত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ওর নাকে-মুখে থাবড়া মারল পিটসেন। ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলল, 'শ্‌শ্‌শ্‌! এখানে আমার মুখের ওপর কেউ কথা বলে না।'

নোভার ঠোঁটের কোণ বেয়ে এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল।

গার্ডের দিকে তাকাল পিটসেন। 'মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে সেলে আটকে

রাখো। রাতের শিফটে শ্রমিকদের আনন্দ দেবে।'

নোভাকে টেনে নিয়ে গেল গার্ড।

রানার দিকে ফিরল পিটসেন। 'আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

লাল পর্দা ঢাকা দেয়ালের একটা জায়গা স্পর্শ করল পিটসেন। দেয়ালের গায়ে বসানো একটা প্যানেল সরে গেল। একটা ওঅকওয়ে ধরে ওকে অনুসরণ করল রানা—ওটার মেঝে কাঁচের তৈরি। ওদের কয়েক ফুট নীচেই কারখানা—কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির মত লাগল রানার কাছে।

'অ্যানালজেসিয়া,' সামনে হাঁটতে হাঁটতে বলল পিটসেন। 'ব্যথা নিরোধক। লোকে রাসায়নিক যুদ্ধকে ভয় পায়। কিন্তু আমার মতে গতানুগতিক যুদ্ধ অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।'

রানা তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। কারখানাটা বিশাল। একসঙ্গে অন্তত পাঁচশো শ্রমিক কাজ করছে।

'শেলের স্প্লিন্টার লেগে যে লোকটার আধখানা মুখ উড়ে গেছে,' পিটসেন বলল, 'খুলির হাড় বেরিয়ে পড়েছে; কিংবা পেটের চামড়া ছিঁড়ে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে, নিজের অন্ত্র আর কলিজা নিজেই চেপে ধরে রেখেছে, সেই মানুষ বোঝে দ্রুত ব্যথা কমানোটা কত জরুরি আর কত শান্তির।'

ওঅকওয়ের একটা সংযোগস্থলে হাজির হলো ওরা।

'আমার এই কারখানায় আমি পপির নির্যাস বের করে সেটা থেকে ব্যথা নিরোধক আর অনুভূতিনাশক ওষুধ তৈরি করি। কোডিন, ডাইহাইড্রোকোডিন, পেথিডিন, মরফিন এই সব। কিছু প্রডাক্ট পারশিয়ান গালফের ভিতর দিয়ে মুম্বাইতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে দূরপ্রাচ্য আর অস্ট্রেলিয়ায় চালান হয়—বাংলাদেশও পড়ে তার মধ্যে। কিছু যায় ইরান হয়ে আমার প্যারিসের কারখানায়, কিছু আমেরিকা আর পশ্চিমা দেশগুলোতে। আর বাকিটুকু যায় রাশিয়া ও ইসটোনিয়ায়। মুম্বাই আর প্যারিসের কারখানায় কিছু কেমিক্যালকে আরও রিফাইন করে, পাউডার, ট্যাবলেট কিংবা তরলে রূপান্তরিত করা হয়—বাজারের চাহিদা অনুযায়ী, যে দেশের মার্কেট যেভাবে চায়। ব্র্যাণ্ড নেমও বদলে দেয়া হয়, প্যারিসে উৎপন্নগুলোর এক নাম, মুম্বাইয়েরগুলোর আরেক। তবে নাম আলাদা হলেও জিনিস একই।'

'প্রতিযোগিতা হয় না?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'হতো, যদি বড় বড় কোম্পানিগুলোর মত আমাকেও বড় অঙ্কের টাকা খরচ করতে হতো শ্রমিকদের পিছনে। আমাকে প্রায় কিছুই খরচ করতে হয় না।'

'কিছুই না?'

'নগদ টাকা দিতে হয় না কাউকে। সবাই ওরা নেশায় আসক্ত। তেহরান,

ইস্পাহান আর কাবুল থেকে জোগাড় করি ওদের। কিছু আসে বাগদাদ থেকে। তুর্কি থেকেও আসে কেউ কেউ। একটানা বারো ঘণ্টা কাজ করে ওরা শুধু পানি, সামান্য খাবার ও হেরোইনের বিনিময়ে। মেঝেতে ঘুমায়। কখনও পালিয়ে যায় না।'

'ওদের আপনি হেরোইন সরবরাহ করেন?'

'হেরোইন আফিমের চেয়ে শক্তিশালী অথচ দাম কম। এদের অনেকে প্রথম দিকে আফিমে আসক্ত ছিল, হেরোইন পেয়ে খুব দ্রুত আফিমের কথা ভুলে গেছে। দিনে মাত্র একবার একটা ইঞ্জেকশন নিলেই চলে। লাইনে দাঁড়িয়ে যে কী গভীর আগ্রহের সঙ্গে ইঞ্জেকশন নেয়ার জন্য অপেক্ষা করে ওরা, যদি দেখতেন!'

মোড় নিয়ে কয়েক কদম এগোল পিটসেন। 'কারখানার এই অংশে হেরোইন তৈরি হয়। দেখতে প্রায় একই রকম—প্রথম যেটা দেখলেন সেটার সঙ্গে খুব একটা তফাৎ নেই, তাই না? পৃথিবীতে আমিই একমাত্র ম্যানিউফ্যাকচারার, যে এত ব্যাপক হারে বিপুল পরিমাণে হেরোইন তৈরি করছে। এতে লাভও হয় অনেক বেশি। এদিকটাতে পাউডার তৈরি হচ্ছে, কারখানার আরেক দিকে তৈরি হয় ট্যাবলেট আর লিকুইড। মান কিন্তু একই। এগুলো চলে যায় শিকাগো, মাদ্রিদ, মুম্বাই আর প্যারিসের অন্ধ গলিতে। লস অ্যাঞ্জেলেসে যায়। যায় ইংল্যাণ্ডের সোহো আর ম্যানচেস্টারে। আর শুনলে খুশি হতে পারবেন না, রানা, যায় বাংলাদেশেও, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে, ব্যাপক হারে। হয়তো বলবেন কাজটা অনৈতিক, বেআইনী—কিন্তু চাহিদা আছে বলেই তো যায়। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, বাংলাদেশে এর অসম্ভব চাহিদা। যারা এসব সেবন করে, তারা প্রচুর আনন্দ পায়, আমি তাদের আনন্দ দিয়ে বরং উপকারই করি। একটা সময় ভয়ানক মৃত্যু হয় ওদের, তবে সেটা আমার দোষ নয়, আমি তো জোর করে নেশায় আসক্ত করাই না, আনন্দের বিনিময়ে ওই মৃত্যুকে বেছে নেয় ওরা। একবার কারখানা থেকে বেরিয়ে গেলে আমার আর কোনও দায়দায়িত্ব থাকে না, ওসব ব্যবহার করে কার কী হলো, এ নিয়েও মাথা ঘামাই না। ফ্যাক্টরির শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ব্যবসা পরিচালনা ও টাকা আদায়ের ভার লির ওপর, সে-ই সব ম্যানেজ করে—যদিও আমার নির্দেশ মতই।'

ওদের মাত্র কয়েক ফুট নীচে রয়েছে শ্রমিকেরা। ধূসর শার্ট আর ঢোলা ট্রাউজার পরা, রানা ও নোভাকে যে ধরনের পোশাক দেয়া হয়েছে। গভীর মনোযোগে কাজ করে চলেছে প্রতিটি শ্রমিক, ফাঁকি দেয়া কিংবা কাজে ঢিল দেয়ার কোনোই উপায় নেই, কারণ সারাক্ষণ ওদের পিছনে শিকলে বাঁধা অ্যালসেশিয়ান কুকুর আর হাতে চাবুক নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে কুকুরেরও অধম সশস্ত্র সুপারভাইজাররা।

'হেরোইন কী জিনিস, জানেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল পিটসেন। 'ছোটখাট একটা লেকচার দিই। খুব সুন্দর একটা ফুল দিয়ে শুরু করি আমরা। পপি। বৈজ্ঞানিক নাম প্যাপাভের সমনিফেরাম। একটা সুন্দর গাছের সুন্দর নাম। এর মানে কি জানেন? *ঘুম পাড়ানো পপি।* এর বিচির রস থেকে তৈরি হয় আফিম, সব ড্রাগের রাজা। কবি হোমারের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রয়েছে যার প্রচণ্ড প্রতাপ ও সম্মান—যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকরা এর কদর করে এসেছেন। আফিমের নেশার ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে আপনার?'

জবাব দিল না রানা।

'আফিম খুব দামি জিনিস,' পিটসেন বলল। 'তবে অনেকের কাছেই ভীষণ কাম্য। আমার আগে এই ড্রাগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি ও ব্যবহার করেছে ইংরেজরা। চিনাদের সঙ্গে দুটো আফিম-যুদ্ধ করেছে ওরা মাদকের একচেটিয়া ব্যবসা বজায় রাখার জন্যে। দুইবারই পরাজিত করেছে ওদের। আঠারোশ' বেয়াল্লিশ সালে ন্যানজিং চুক্তির মাধ্যমে হং কং-কে কেড়ে নিয়েছিল ওরা, আফিম-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে দুটো বন্দর নির্মাণ করেছিল, লক্ষ লক্ষ চিনাকে মারাত্মক নেশার পথে ঠেলে দিয়েছিল। এখন, ওদের ওষুধ দিয়েই ওদের যদি শায়েস্তা করা যায়, অন্যায় হবে না আশা করি? আপনি ইংরেজ নন, তবুও আপনাকে বলছি; এর কারণ, যাতে বুঝতে পারেন, ওই জাতটাকে কী পরিমাণ ঘৃণা করি আমি।'

চুপ করে রইল রানা। জবাব দিল না। এ বিষয়ে ওর মন্তব্য করার সময় আসেনি এখনও।

'তবে অনেক সময় লেগেছে আমার তৈরি হতে,' অধৈর্য শোনাল পিটসেনের কণ্ঠ। 'খোদা, অনেক সময় লেগে গেল আমার প্রতিশোধ নিতে।'

পিটসেনের কথা শুনতে শুনতে নীচে তাকিয়ে শ্রমিকদের দেখছে রানা। ঘামে ভেজা নোংরা পোশাক পরা মানুষগুলোকে ঠিক মানুষ মনে হচ্ছে না, যে যন্ত্রগুলো নিয়ে কাজ করছে ওরা, ওগুলোর মতই যান্ত্রিক মনে হচ্ছে। হঠাৎ করে পড়ে গেল একটা লোক। জ্ঞান হারাল না মরে গেছে, বোঝা গেল না। তবে লাশের মতই ঠ্যাং ধরে টেনে বের করে নিয়ে গেল ওকে গার্ডেরা। আশপাশে যারা কাজ করছিল, ওরা ফিরে তাকাল না, কাজ বন্ধ রেখে তাকানোর সাহস নেই কারও।

'আফিম আর হেরোইনের মাঝামাঝি যে জিনিসটা বেরোয়, তার নাম মরফিন,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল পিটসেন। 'আঠারোশ' পাঁচ সালে এটা আলাদা করতে পারেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী। তারপর, আঠারোশ' চুয়াত্তর সালে, রাইট নামে এক ইংরেজ ডায়াসেটাইলমরফিন নামে সাদা রঙের গন্ধহীন তেতো একটা মিহি পাউডার তৈরি করে, মরফিন অ্যাসেটিলেশন করে। এর নামই হেরোইন।'

কাশি দিল পিটসেন। 'ওই কাজটাই করছে ওরা ওখানে।' নীচের কারখানার

দিকে আঙুল তুলল ও। 'অ্যাসেটিলেশন। এর গন্ধই পাচ্ছেন। যাই হোক, সেই ইংরেজ কেমিস্ট তার আবিষ্কারের ফল ভোগ করতে পারেনি। হেরোইনের বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কথা প্রথম ভেবেছিল জার্মান ফার্মাকোলজিকাল কোম্পানি বেয়ার-এর মালিক হেইনরিখ ড্রেসার। প্রথমে তার শ্রমিকদের ওপর প্রয়োগ করে গবেষণা চালিয়ে দেখেছিল, আর সেখান থেকেই হেরোইন নামটা এসেছে, কারণ যারা এই জিনিস ব্যবহার করেছিল, ব্যবহারের পর তাদের মনে হয়েছিল *হিরো* হয়ে গেছে। হেরোইনের ক্রিয়াও অনেকটা মরফিনের মতই, তবে মাত্র চার ভাগের এক ভাগ ব্যবহার করলেই চলে। তা ছাড়া দামও কম। কম দাম, দ্রুত ক্রিয়া, আর সহজ ব্যবহার এটাকে ওয়াণ্ডার ড্রাগে পরিণত করেছে।'

লোকটার দিকে তাকাতে পারছে না রানা। তাকালে কেমন গা রি-রি করছে। পিটসেনের হলুদ চুল, শয়তানি বুদ্ধি, কথাবার্তা রাগিয়ে দিচ্ছে ওকে।

'প্রতি শিফটে বারো ঘণ্টা করে দুই শিফটে কাজ হয় এখানে,' পিটসেন বলল। 'তাই একটা মিনিটও সময় নষ্ট হয় না আমাদের। এই একটা কাজ আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোনও মতেই করতে পারবে না।'

'শ্রমিকদের কাজে কোন ব্রেক নেই?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'আছে, প্রতি তিন ঘণ্টা পর পর পাঁচ মিনিট। তখন পানি খায়, বাথরুম সারে। খুব বেশি পানি অবশ্য দেয়া হয় না। বেশি পানি খেলে বেশি পেসাব করতে হবে, তাতে কাজের মূল্যবান সময় নষ্ট... নেশা করে করে এতটাই অসুস্থ হয়ে যায় ওরা, যখন-তখন মরে যায়। অনেক সময় মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে। একজনকে তো মরতে দেখলেন একটু আগেই। রিপ্লেসমেন্টের অভাব হয় না আমাদের। সরকারি হিসেব মতে শুধু ইরানেই রয়েছে বিশ লাখ মাদকাসক্ত। আর প্রতিদিনই তাদের সঙ্গে নতুন নতুন মাদকাসক্ত যোগ হচ্ছে, এদের বেশির ভাগই তরুণ। লির রিক্রুটমেন্ট টিমের লোকেরা সারাক্ষণই লোক জোগাড়ে ব্যস্ত থাকছে। প্রতিদিন ইয়াজ্দ্ আর কিরমান থেকে গড়ে বিশজন করে লোক জোগাড় করে ওরা।'

'নীচ একটা কাজ,' রানা বলল।

'কিন্তু খুব ভাল ব্যবসা,' পিটসেন বলল। 'এই গোলামি ব্যবসাটা আমি নতুন শুরু করিনি, এটা বহু প্রাচীন, আপনার তো না-জানার কথা নয়। দুশো বছর ধরে ইংরেজরা আপনাদের গোলাম করে রেখেছিল। আফ্রিকা, ভারত, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে কলোনি করেছিল ওরা; ভাল, সুস্থ লোকদের দিয়ে গোলামি করিয়েছে। আমি যাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছি, এদের সবাই আবর্জনা। এক পা কবরে দিয়ে রেখেছে। আমি বরং ওদের সুখ দিচ্ছি, জীবন কিছুটা দীর্ঘায়িত করে দিচ্ছি। খাবার, পানি তো দিই-ই, প্রতিটি শিফটের শেষে ওদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা

রেখেছি। কী ধরনের বিনোদন, দেখাব আপনাকে। আমার অফিসে চলুন।'

লাল রঙ করা ঘরটায় ফিরে এল ওরা। ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে বসল পিটসেন। টেবিলের ওপরের একটা বোতাম টিপল। নিঃশব্দে সরে গেল ওর পিছনের একটা প্যানেল। ওখান দিয়ে কারখানার ভিতরটা দেখা যায়।

'মাঝে মাঝে এখানে বসে আমি ওদের কাজ দেখি, দেখে আনন্দ পাই,' পিটসেন বলল। 'যদিও মাঝে মাঝে ওদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম বিরক্ত করে আমাকে।'

বোতাম টিপে আবার প্যানেলটা বন্ধ করে দিয়ে চেয়ার ঘুরিয়ে রানার দিকে ফিরল পিটসেন। 'একদিন আমি, রানা, এত বেশি মাদকাসক্ত তৈরি করব ব্রিটেনে, চিন-এ ওরা যা করেছিল তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি। খুব শীঘ্রি। এমন কাজ করব, যাতে আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত হয়ে ওঠে ওই জাতটা। এমন করে ছাড়ব, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও ওদের দেখে হাসবে, ঘৃণার চোখে তাকাবে।'

'ইংরেজদের ওপর এত গোশশা কেন আপনার? আপনার ওই বনমানুষের হাত দিয়ে এতবড় একটা কাজ করবেনই বা কী করে?' জানে, মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে; কিন্তু খোঁচা দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়েছে ওর।

একটা মুহূর্তের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল পিটসেনের চেহারা। কঠিন, শীতল হয়ে গেল নীল চোখজোড়া। দাঁতে দাঁত ঘষার কারণে উঁচু হয়ে উঠল চোয়াল। তারপর জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজেকে সামলে নিল ও। ওর ঠোঁটে কঠিন হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'এই হাত দিয়ে আমি অনেক কিছু করেছি,' সাদা দস্তানা পরা হাতটা রানার দিকে উঁচু করে ধরল ও। 'আরও অনেক কিছু করতে পারব। এটা দেখতে চান?'

'না।'

'আমি জানি, চান। কৌতূহল না থাকলে আপনি এত নামকরা সিক্রেট এজেন্ট হতে পারতেন না। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল পিটসেন। টান দিয়ে দস্তানা খুলে হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। তালুটা লম্বা, চ্যাপ্টা, লালচে-সাদা রঙ। নখের কিনার থেকে কনুই পর্যন্ত বড় বড় লোম, একেবারে শিম্পাঞ্জির মত। বুড়ো আঙুলটা বাদে বাকি চারটে আঙুল জোড়া লাগানো। নখগুলো চোখা চোখা, তিন কোনা। সোজা কথা, শিম্পাঞ্জির বাম হাতটা কনুইয়ের কাছ থেকে কেটে নিয়ে একজন মানুষের হাতে লাগিয়ে দিলে যেমন দেখাবে। জোড়া লাগানো আঙুলগুলোও কুৎসিত দেখাচ্ছে। কিন্তু মুখটাকে নির্বিকার করে রাখল রানা। চেহারায় কোনও ভাব প্রকাশ পেতে দিল না।

দস্তানাটা আবার পরে নিল পিটসেন।

দুজনের মাঝখানের দূরত্ব মাত্র এক ফুট। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ পলক ফেলছে না।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' অবশেষে কথা বলল আবার পিটসেন, 'ব্যবসার কথা। কোথাও না কোথাও থেকে কাঁচামাল জোগাড় করতে হয় আমাকে, আফিম। তুরস্ক থেকে খুব একটা পাই না আজকাল। লির মাধ্যমে দূর প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। উত্তর লাওস থেকে পাই বেশ খানিকটা। ওখানে সরাসরি সাহায্য পাই সিআইএ-র। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ওদের এয়ার আমেরিকা আমার আফিম পৌঁছে দেয় জায়গামত।'

রানার দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখে হাসল পিটসেন, বলে চলল, 'রাশিয়া থেকেও পাই। তবে সবচেয়ে বেশি পাই আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশ থেকে। আর এখানেই আপনাকে প্রয়োজন, রানা। সীমান্তে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পুরো এলাকাটা ডাকাত আর জঙ্গিতে ভর্তি। রাইফেল-পিস্তল থেকে শুরু করে গ্রেনেড, রকেট লঞ্চার, সবই আছে ওদের কাছে। সীমান্ত শহর জ্যাবুল দিয়ে বেশ কিছু আফিম আসার কথা আমাদের, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই ডাকাতরা। জায়গাটার নাম হেলফায়ার পাস। কেন জানেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'একটা রেল লাইন আছে ওখানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অ্যানজ্যাক বন্দিদের দিয়ে বানিয়েছিল জাপানীরা। শোনা যায়, প্রতি এক গজ লাইন বসাতে ওখানে একজন করে মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। অসম্ভব দুঃসাহসী ছিল ওই অ্যানজ্যাকরা।'

'জানি। দুঃসাহসী যোদ্ধা না হলে এত বিরূপ অঞ্চলে টিকে থাকতে পারত না।'

'কিন্তু সমস্যাটা হলো, মাদকাসক্তদের ওখানে পাঠাতে পারব না, ওদের দিয়ে কাজ হবে না। পাঠাতে হবে সুস্থ মানুষ। আমি চাই, লির সঙ্গে আপনিও জ্যাবুলে যান। কাল সকালে।'

'কেন?'

'আপনার একটা শিক্ষা দরকার।' ডেস্কের কিনারে দাঁড়িয়ে বোতাম টিপে আবার পিছনের প্যানেলটা খুলে দিল পিটসেন। 'এখন বিকেলের বিনোদনের সময়। এখানে আসুন, দেখতে পাবেন।'

রানার মেরুদণ্ডের মাঝখানে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে গুঁতো দিল একজন গার্ড।

হেরোইন প্ল্যান্টে যাবার কাঁচের ওঅকওয়ের অন্য প্রান্তের একটা দরজা খুলে গেল। একজন গার্ড ধাক্কা দিয়ে এক তরুণীকে ঢুকিয়ে দিল সেখানে। আবার

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এক টুকরো কাপড়ও নেই মহিলার পরনে, একেবারে উলঙ্গ।

'একে আমরা ল্যামবেথ ওঅক বলি,' পিটসেন বলল। 'খুব ভাল একটা ককনি বিনোদন।'

একে একে আরও তিনজন উলঙ্গ তরুণীকে ঠেলে দেয়া হলো ওঅকওয়েতে।

'ওরা এখন হাঁটবে,' পিটসেন বলল। 'ফ্যাশন প্রতিযোগিতার মেয়েদের মত। নীচ থেকে কাঁচের ভিতর দিয়ে ওদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাবে শ্রমিকরা।'

'এই মেয়েগুলো কারা?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'বিশেষ কেউ না। পতিতা। এরাও মাদকাসক্ত। পুরুষদের সঙ্গে এদেরকেও তুলে আনা হয়। দু'তিন ল্যামবেথ ওঅক দেখানোর পর আর যখন কোনও চার্ম থাকে না ওদের, শ্রমিকদের হাতে তুলে দিই।'

'কী করেন?'

'গার্ডরা ওদের কারখানার ভিতরে ছেড়ে দেয়। শ্রমিকরা তখন ওদের টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। তারপর যা করার করে। কাজের স্পৃহা বাড়ানোর জন্যে এই বিনোদনটুকু ওদের দরকার।'

'তারপর মেয়েগুলোকে কী করেন?'

'অবশ্যই কবর দেয়া হয়। বালিতে পুঁতে রেখে আসে গার্ডেরা। হাজার হোক, মানুষ তো, শকুনের খোরাক তো আর হতে দিতে পারি না।'

আবার খুলে গেল ওঅকওয়ের অন্যপ্রান্তের দরজা। চওড়া হাসি ফুটল পিটসেনের মুখে। 'আরে আরে, দেখুন, রানা, কী অসাধারণ দৃশ্য। আপনার বান্ধবী! আমি শিওর, ওর জন্যে রীতিমত উন্মাদ হয়ে উঠবে শ্রমিকরা।'

তেরো

প্যারিসে তখন, যেন অন্য এক পৃথিবীতে, ফ্রাঁ থিয়াখি লাঞ্চ খেতে খেতে পত্রিকা পড়ছে। কাফেটা ওর অফিস ডুক্সেমের কাছে। একটা প্লেন নিখোঁজ হওয়ার খবর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওর। একটা ভিকারস ভিসি-১৫ এয়ারলাইনার ব্রিটেন থেকে রওনা দিয়ে ইরান-ইরাক সীমান্তের কোনও একজায়গা থেকে হারিয়ে গেছে। স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন, হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে গেছে রেডার থেকে।

আপনমনে শ্রাগ করল থিয়াখি। এটা নতুন কোনও ঘটনা নয়। এ ধরনের ব্রিটিশ বিমানগুলোর কেন যেন একটা নিখোঁজ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

পত্রিকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে করিম মোল্লার কথা ভাবল থিয়াখি। প্যারিসের এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানে পুলিশও ঢুকতে ভয় পায়। জায়গাগুলো ভীষণ বিপজ্জনক—অন্ধকার অলিগলিতে কোন্ দেয়ালের আড়াল থেকে ছুটে আসবে ছোরা কিংবা গুলি, কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া, পুলিশকে কোনরকম সহযোগিতা করতে রাজি নয় ওখানকার বাসিন্দারা। এ কারণে কেসটার কোনও কিনারা করতে পারেনি ও এখনও। তবে একটা জিনিস বোঝা গেছে, মাদক সংক্রান্ত কারণে মৃত্যু হয়েছে করিমের। কোনও একটা হেরোইন পাচারকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল লোকটা। থিয়াখির ধারণা, সংস্থাটা খুব বড় মাপের। এই ধারণা পুলিশকে জানিয়েছে ও। পুলিশ এখন যত ভাবে সম্ভব অনুসন্ধান করছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল থিয়াখি। আরও কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবে। তাই আরেকটা কফি আর কনিয়াকের অর্ডার দিল। গত কয়েকটা দিন—করিম মোল্লা খুন হওয়ার পর থেকে—প্লায়ার্স দিয়ে জিভ ছিঁড়ে নেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে ও। নিশ্চয় কথা না শোনার কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করার শাস্তি এটা। কোন্ লোক এই শাস্তিটা দেয়, জানতে পারলেই এই খুনের রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে, বুঝতে পারছে ও। কিন্তু কে সেই লোক? কীভাবে খোঁজ পাওয়া যাবে তার? ড. অ্যালফ্রেড পিটসেনকে সন্দেহ থিয়াখির। লোকটার কারখানার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলে দিয়েছে সেক্রেটারিকে। রিপোর্ট পাওয়া যায়নি এখনও। আশা করছে, দু'এক দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে।

তেহরানে তখন বিকেলের শুরু। নিজের অফিসে চলেছে আবু হাশিম। একটা আধুনিক বাড়ির দশতলায় ওর অফিস। প্রতিদিন বিকেল ছ'টায় লণ্ডনে বিএসএস-এর অফিসে রিপোর্ট করতে হয় ওকে। ড্রাইভার ফারুকের আনা চিঠি ও হেরোইনের সংবাদ আগেই পাঠিয়েছে, আজ শুধু রুটিন রিপোর্ট।

এয়ার কণ্ডিশনড অফিসে ঢুকে কম্পিউটারের সামনে বসল ও। অভ্যস্ত হাতে কী-বোর্ডের বোতাম টিপে চলল। অনেক কথা বলার আছে। তবে সবই বলতে হবে সাঙ্কেতিক ভাষায়, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের টপ লেভেলের কর্মকর্তা ছাড়া আর কেউ যাতে কিছু বুঝতে না পারে।

হাশিম জানাল, এখনও *মিস্টার মাসুদ রানা* নিখোঁজ। ও নিজে বা আর কাউকে পাঠিয়ে নশাহ্‌রের ডকইয়ার্ডে গিয়ে খোঁজ নেবার অনুমতি চাইল। ক্যাস্পিয়ান সাগরে ঘন ঘন চোখে পড়া সাগর-দানবটার কথা বলল। দানবটা দেখতে কেমন, তা-ও জানাল। আশা করল, এ থেকেই হয়তো যা বোঝার বুঝে নেবেন চিফ।

ঘণ্টাখানেক পর। লণ্ডনে তখন দুপুর। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ তাঁর অফিসে বসা। চেহারায় অতিরিক্ত উত্তেজনার লক্ষণ স্পষ্ট। দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে পাইপের বাউলের উপর ধরে জোরে জোরে টানছেন। তাঁর টেবিলে রাখা দুটো মেসেজ, একটা এসেছে প্যারিস থেকে, অপরটা তেহরান থেকে।

পাইপ ধরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার লংফেলো। পার্কের উপর চোখ রেখে ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর টেবিলে ফিরে এসে ইন্টারকমে বললেন, 'জুলিয়া? চিফ অভ স্টাফকে আসতে বলো।'

'ইয়েস, সার।' বলে ইন্টারকমের বোতাম টিপল জুলিয়া। স্পিকারে সাড়া আসতেই বলল ও, 'সার, বস আপনাকে একটু আসতে বলেছেন।'

দরজা খুলে নিজের অফিস রুম থেকে বেরিয়ে এল চিফ অভ স্টাফ। হাতে একটা ফাইল। প্রায় রানারই বয়েসী একজন মানুষ, দু'তিন বছরের বড় হতে পারে, ছিপছিপে, লম্বা। বিসিআই-এ সোহেল আহমেদের কাঁধে যে-দায়িত্ব, এর কাঁধেও সেই একই দায়িত্ব। একই কাজ করছে দুজন নিজ নিজ দেশের জন্য।

জুলিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে মিস্টার লংফেলোর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর ভারী একটা দম নিয়ে ওক কাঠের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল চিফ অভ স্টাফ।

মুখ তুলে তাকালেন মিস্টার লংফেলো। 'এসো, জিম। পিস্টাচিওর মেসেজের কপিটা পড়ে কী বুঝলে?'

'এইমাত্র অ্যাভিয়েশন সেকশন থেকে রিপোর্ট পেলাম, সার,' জিম বলল। 'মেসেজ পড়ে শিওর হওয়া কঠিন, সার। তবে বর্ণনা যা পাওয়া গেছে তাতে ওদের ধারণা, সাগর-দানবটা আসলে একটা একরানোপ্লেন।'

'ওটা আবার কী জিনিস?' ভুরু নাচালেন মিস্টার লংফেলো।

'ডানাকাটা এক ধরনের বিমান, অনেকটা হোভারক্র্যাফটের মত চলে। তিনশো ফুটের বেশি লম্বা। কাটা ডানা দুটোর একমাথা থেকে আরেক মাথার দৈর্ঘ্য একশো তিরিশ ফুট। রাশান মেড। নতুন বানিয়েছে ওরা, এখনও বাণিজ্যিকভাবে বাজারে ছাড়েনি। বিস্তারিত এই ফাইলে লেখা আছে।' ফাইলটা মিস্টার লংফেলোর দিকে ঠেলে দিল জিম।

'স্পিড কত?' ফাইলটার দিকে তাকালেন না মিস্টার লংফেলো।

'ঘণ্টায় চারশো কিলোমিটার।'

'কী!'

'হ্যাঁ, সার, প্রায় আড়াইশো মাইল...'

'তা তো জানি। কিন্তু পানির নীচ দিয়েও এত জোরে ছোটে?'

'পানির নীচ দিয়ে এত জোরে চলতে পারে না, তবে ডাঙার কয়েক ফুট ওপর দিয়ে এই গতিতে উড়ে যেতে পারে।'

'কিন্তু রাশান একটা জিনিস ইরানিয়ান বন্দরে কেন?'

'সেটা এখনও পরিষ্কার নয়, সার। তবে পিস্টাচিও লোক লাগিয়ে দিয়েছে। আশা করি, শীঘ্রি আরও তথ্য জানতে পারব।'

ঘন ঘন পাইপে টান দিলেন মিস্টার লংফেলো। 'হুঁ। পিস্টাচিওর ওপর আমার আস্থা আছে। নশাহ্র্ বন্দর থেকে রানা যে প্যাকেটটা পাঠিয়েছে, ওটা পরীক্ষা করা হয়েছে? কী আছে ওতে?'

'হেরোইন। একরানোপ্লেনে করে, আমার ধারণা, রাশিয়ায় পাঠানো হচ্ছে ওই মাদকের বাক্স।'

'তারমানে রাশায় লোক আছে পিটসেনের। পূর্ব ইয়োরোপের ভিতর দিয়ে পশ্চিমে পাঠায়। হয়তো বাল্টিক স্টেটের ভিতর দিয়ে, কিংবা ইস্টোনিয়া।'

'আমারও তাই ধারণা, সার।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার লংফেলো। চিফ অভ স্টাফের দিকে পিঠ। বললেন, 'আমার মনে হয় না, মাদক পাচারই একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যাপক আকারে পাচার করছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও কোন মতলব আছে লোকটার। রানা ফিরে না এলে সেটা জানা সম্ভব নয়। যাই হোক, পিস্টাচিওকে সতর্ক থাকতে বলো, আর নশাহ্র্ বন্দরে যেন কড়া নজর রাখে—নতুন কিছু জানার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানায়।'

চোদ্দ

'তোমার ভাগ্য ভাল পিটসেন, আমার হাত বাঁধা,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বেরিয়ে এল রানার কথাগুলো।

'বাঁধা না থাকলেও কিছু করতে পারতেন না,' পিটসেন বলল। 'ওরা আপনাকে আমার কাছে আসতেই দিত না।' দরজায় দাঁড়ানো দুজন গার্ডকে দেখাল ও। 'আপনার গার্লফ্রেণ্ডকে দেখছেন না কেন? সবাই তো দেখছে। ওদের চিৎকার শুনেই বোঝা যাচ্ছে, কত মজা পাচ্ছে ওরা।'

প্যানেল দিয়ে তাকাল রানা। ওঅকওয়ে ধরে নোভাকে হাঁটতে বাধ্য করছে একজন গার্ড। দুই হাতে লজ্জা ঢাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে নোভা, কিন্তু রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতো মেরে হাত সরিয়ে দিচ্ছে গার্ড। মজা পেয়ে হো-হো

করে হাসছে নীচে দাঁড়ানো শ্রমিকরা।

পিটসেনকে খুন করুন—নিনার কথাটা কানে বাজছে রানার। তখন বলেছিল, ঠাণ্ডা মাথায় একজন মানুষকে খুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন আর সেটা ভাবছে না। প্রথম সুযোগেই পিশাচটাকে খুন করবে ও।

'মেয়েদের কক্ষনো পাত্তা দেবেন না,' পিটসেন বলল। 'এদের কোন মূল্য নেই। ইচ্ছে হলে ব্যবহার করবেন, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।'

বিড়বিড় করে গালি দিল রানা।

'দেখতে ভাল না লাগলে,' হাসি হাসি কণ্ঠে পিটসেন বলল, 'নিজের সেলে ফিরে যেতে পারেন।'

আঙুলের ইশারায় একজন গার্ডকে ডাকল ও। ফার্সিতে দ্রুত নির্দেশ দিল ওকে। রানার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলল, 'আপনার গার্লফ্রেণ্ডকেও আপনার কাছে পাঠাব, তবে পরে। আজ রাতে ওকে শ্রমিকদের হাতে ছাড়ব না। দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের খিদেটা আগে বাড়িয়ে তুলতে চাই।'

নিঃসঙ্গ সেলে বসে বসে ভাবছে রানা, কীভাবে এখান থেকে বেরোনো যায়। গার্ডের দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। তবে তার আগে হাতদুটো মুক্ত করতে হবে, নাইলনের দড়ি কব্জিতে কেটে বসেছে। আর দড়ি খুলে গার্ডকে কাবু করলেই হবে না, নোভা ও নিনাকে নিয়ে কীভাবে পিটসেনের ঘাঁটি থেকে পালাবে, তারও একটা উপায় বের করতে হবে।

আট ঘণ্টা পার হয়ে গেল, খাবার, পানি কোন কিছুই দেয়া হলো না ওকে। নোভার দেখাও পেল না। পিঠে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আবার যখন পিটসেনের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো, রীতিমত ঢুলছে ও। এবার লি-ও রয়েছে পিটসেনের সঙ্গে।

'আপনাকে খানিকটা ব্যায়াম করানো হবে, রানা,' পিটসেন বলল। 'ছোট্ট একটা অ্যাডভেঞ্চার। মূল কাজে যাবার আগে খানিকটা প্র্যাকটিস ধরে নিতে পারেন এটাকে। যদিও, এটাও কম বিপজ্জনক নয়। বলা যায় না, না-ও টিকতে পারেন, তবে আপনার দৈহিক ক্ষমতা দেখার লোভ সামলাতে পারছি না আমি। আশা করি আপনার জন্যে ভালই হবে। অনেক কিছু শিখতে পারবেন। লির হাতে ছেড়ে দেব আপনাকে এখন, আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর।'

নিজের নাম শুনে এক পা আগে বাড়ল কেপি পরা লোকটা। গার্ডকে কিছু নির্দেশ দিল। খটাস করে বুট ঠুকে, স্যালুট করে, চলে গেল গার্ড।

'আমার মনে হচ্ছে, লির বিষয়ে আপনার খানিকটা জানা থাকা দরকার,

রানা,' পিটসেন বলল। 'আমার কাছে আসার আগে নিজ দেশের সেনাবাহিনীতে ছিল। যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি প্রচণ্ড বদমেজাজি। একজন পাদ্রির জিভ ছিঁড়ে ফেলা নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে নিজের ওপরওলাকে খুন করে ও। প্রথমে বাড়ি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর বুকের ওপর চেপে বসে প্লায়ার্স দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে জিভ। সব শেষে অফিসারের হোলস্টার থেকে ওরই পিস্তলটা খুলে নিয়ে মুখের ভিতর পুরে গুলি করে।'

আরও তিনজন গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল আগের গার্ড। সঙ্গে করে একজন শ্রমিককে নিয়ে এসেছে। লির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটা। প্রচণ্ড আতঙ্কে হাতজোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল।

'লি ভীষণ ধর্মবিদ্বেষী,' নির্বিকার কণ্ঠে বলে যেতে থাকল পিটসেন। 'সেনাবাহিনীতে থাকার সময় একবার ওর দল নিয়ে একটা গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। এক জায়গায় দেখে কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়েকে ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছে একজন খ্রিস্টান পাদ্রি। লোকটাকে ধরে প্লায়ার্স দিয়ে টেনে ওর জিভ ছিঁড়ে ফেলে, যাতে আর কোনদিন ধর্ম শিক্ষা দিতে না পারে, আর বাচ্চাদের বধির করে দেয় যাতে কানে শুনে আর ধর্ম শিক্ষা নিতে না পারে; এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কোর্ট মার্শাল হতে যাচ্ছিল ওর। বসকে খুন করার পর পালানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না লির। যাই হোক, যারা বেশি কথা বলে, তাদেরকেও এমনি করেই শাস্তি দেয় ও। আরও অনেক ধরনের শাস্তির কৌশল জানা আছে ওর।'

লির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল পিটসেন। পকেট থেকে দুটো চপস্টিক বের করল লি। দুজন গার্ড শ্রমিক লোকটার দুই হাত মুচড়ে পিছনে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরে রাখল। ওর দুই কানে একটা করে স্টিকের সরু মাথা ঢুকিয়ে দিল লি।

'এভাবেই বাচ্চাদের বধির করে দেয় লি, যাতে আর কোনও দিন ধর্ম শিক্ষা নিতে না পারে,' আবার বলল পিটসেন।

দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আচমকা দুই হাতের তালু দিয়ে স্টিকের বেরিয়ে থাকা মাথায় প্রচণ্ড থাবড়া মারল লি। খুলির ভিতরে যতদূর যায় ঢুকে গেল স্টিকগুলো। পিচকারি দিয়ে পানি বেরোনোর মত রক্ত বেরিয়ে এল লোকটার দুই কান থেকে, নাক ও চোখ দিয়েও নামল ঢল। আর্ত চিৎকার দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল লোকটা। গার্ডরা ওর হাত ছেড়ে দিতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়েছে আগেই।

'বহুদিন আর কানে কিছু শুনতে পাবে না ও,' পিটসেন বলল। 'আবার কানের ড্রাম সেরে না ওঠা পর্যন্ত, যদি সারে আরকী। ওই ধর্ম শিখতে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েগুলোর অনেকেই চিরকালের জন্যে বধির হয়ে গেছে।'

দুজন গার্ড হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল লোকটাকে। অন্য দুজন রয়ে

গেল অফিস ঘরে।

'হয়তো ভাবছেন, আপনার সামনে লোকটাকে ওভাবে শাস্তি দেয়ার কারণ কী?' রানার দিকে তাকিয়ে বলল পিটসেন। 'ওই যে বললাম, অনেক কিছু আজ শেখানো হবে আপনাকে। আপনার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। কিন্তু খাবার দেয়া হবে না। এটাও একটা শিক্ষা। দীর্ঘক্ষণ খালিপেটে থাকতে কেমন লাগে, সেটা অনুভব করার পর আমাকে জানাবেন আপনি।'

'আপনার *ছোট্ট অ্যাডভেঞ্চারটায়* কখন বেরোচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জানালা দিয়ে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে আছে পিটসেন, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি। তারপর হঠাৎ করেই ফিরে তাকাল লির দিকে। 'একে নিয়ে গিয়ে কাজ করাও।'

রানার আগে আগে চলল লি। পিছনে রানার দুই পাশে থেকে এগোল দুই গার্ড। খোলা এলিভেটরে করে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নামল। সেখান থেকে বৈদ্যুতিক রেল গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো খিলানওয়ালা করিডোর ধরে লোহার দরজার কাছে। দরজার পাশের কীপ্যাডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লি। পাঁচ অঙ্কের একটা কোড টিপল।

শব্দ শুনে কোডটা মুখস্থ করার চেষ্টা করল রানা। প্রতিটি বোতাম টেপার সময় আলাদা আলাদা শব্দ হতে শুনেছে।

পিছলে সরে গেল দরজাটা। বাইরে মরুভূমির বালিতে ঠেলে ফেলা হলো রানাকে। একটা রাশান টুইন-ইঞ্জিন এমআই-৮ হিপ হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। মেইন রোটরে পাঁচটা ব্লেড। একসঙ্গে ছত্রিশজন মানুষ বহন করার ক্ষমতা রাখে কপ্টারটা।

প্রচণ্ড গরম। চামড়ায় ছ্যাঁকা দেয় কড়া রোদ, যেখানেই লাগে, ছ্যাঁৎ করে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে রানাকে হাঁটিয়ে নেয়া হলো হেলিকপ্টারের দিকে। রানা সিঁড়ির কাছে পৌঁছুতেই ঘুরতে আরম্ভ করল কপ্টারের ব্লেড, ধুলো উড়িয়ে এনে চোখেমুখে ফেলল। ভিতরে বসা পিটসেনের দশজন লোক। সবাই সশস্ত্র। টি-শার্ট আর কমব্যাট ট্রাউজার পরা। কোমরে বাঁধা ভারি অ্যামিউনিশন বেল্ট। টেনে লাগানো হলো কার্গো ডোর। রোটরের গতি বেড়ে গেছে। আকাশে উড়ল কপ্টার। সামান্য ডানে কাত হয়ে সগর্জনে ছুটল মরুভূমির উপর দিয়ে।

সূর্য দেখে অনুমান করতে পারল রানা, পুবে যাচ্ছে ওরা, আফগানিস্তানের দিকে। দরজা খোলার কোডটার কথা ভাবছে ও, শব্দগুলো আরেকবার মনে করে কোনটার পর কোনটা হবে স্মৃতিতে গেঁথে নিল ভালমত।

একটা কারাভাঁ-সরাইয়ের কাছে নামল হেলিকপ্টার। আয়তাকার একটা

দালান। দূরের পর্বত থেকে মাটির নীচ দিয়ে বরফগলা পানি নিয়ে আসার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। কপ্টার থেকে নেমে দালানের সামনের খোলা চত্বরে ছায়ায় পাতা টেবিলে গিয়ে বসল মানুষগুলো। খাবার আর পানি দেয়া হলো তাদের।

পোলাও আর কাবাবের গন্ধে জিভে পানি এসে গেল রানার। নশাহ্‌রে নোভা ও ফারুকের সঙ্গে বসে খাবার পর আর পেটে কিছু পড়েনি ওর। বাবুর্চি এসে খাবার দিতে চাইল ওকে। বাবুর্চির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল লি, 'উঁহুঁ, ও খাবে না। খিদে নেই।'

'পানিও দেবে না?' রানা জিজ্ঞেস করল।

একটা বাটিতে পানি ঢালল লি। 'নাও, কুত্তার মত করে খাও।'

এখনও হাত বাঁধা রয়েছে রানার পিছনে। বাটি তুলে খাওয়ার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে ঝুঁকে মুখ নামিয়ে চুমুক দিতে হলো। গরম হয়ে আছে পানি।

ডজনখানেক উটের একটা কাফেলা রয়েছে সরাইয়ের সামনে। স্থানীয় মানুষরা ওগুলোর গায়ে মই লাগিয়ে ওপরে ওঠার ব্যবস্থা করেছে। কুঁজ কেটে গর্ত করে রেখেছে। লালচে ক্ষত তৈরি হয়েছে জায়গাগুলোতে। ওপরে উঠে ওই গর্তে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনছে পলিথিনে মোড়ানো প্যাকেট। নশাহ্‌রের হ্যাঙার থেকে এ রকম প্যাকেটই নিয়ে এসেছিল রানা। অনুমান করল, উটগুলোকে মরুভূমি পেরিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় যাতায়াতের ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। সে-সব জায়গায় পানির ব্যবস্থা আছে, পৌঁছলে প্রচুর পানি খাওয়ানো হয় ওগুলোকে। পানির লোভে নিজেরাই পথ চিনে জায়গা মত পৌঁছে যায় ওগুলো, চেনাতে হয় না।

'এগোও,' রানার গায়ে ধাক্কা মারল লি। দুর্গম অঞ্চলে চলার উপযোগী একটা আর্মি-লরি দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন চলছে ওটার।

পর্বতের মধ্য দিয়ে রুক্ষ মরুপথ ধরে একটানা প্রায় ছয় ঘণ্টা চলার পর প্রথমবারের মত মানুষ বসবাসের চিহ্ন চোখে পড়ল। রানার মনে পড়ল, ম্যাপে দেখেছে, দাস্ত-এ লুতের দক্ষিণ প্রান্ত ধরে একটা রাস্তা চলে গেছে, বাম থেকে জাহেদান হয়ে জ্যাবুল সীমান্তে। কিন্তু যেখানে রাস্তা থাকে, সেখানে পুলিশও থাকে, রোডব্লক দিয়ে যানবাহনে কী আছে খুঁজে দেখে। সুতরাং, মরুভূমি ধরে যাওয়াটাই পিটসেনের লোকদের জন্য নিরাপদ।

পর্বত থেকে নামার পর কিছুটা সবুজ হয়ে এল প্রকৃতি। জ্যাবুলের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। দশ মাইল মত যাওয়ার পর গাড়ি থামানো হলো। দশটা ছাতখোলা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। জিপে উঠল সবাই। প্রতিটি জিপের ড্রাইভার, রানা আর লি সহ এখন দলের লোকসংখ্যা বাইশ। তিন মিনিট বিরতি দিয়ে দিয়ে ছাড়তে লাগল গাড়িগুলো। রানার ধারণা, কেউ যাতে ভাবতে না পারে ওগুলো

একই দলের গাড়ি। বড় আর্মি-লরিটা, যেটাতে করে এসেছে ওরা, সেটা নেয়া হলো না, শহরে ঢুকলে চোখে পড়ে যেতে পারে এই ভয়ে—যদিও তাতে অনেক বেশি আফিম বহন করা সম্ভব ছিল।

কয়েক মিনিট পর শহরে পৌঁছল ওরা। তেহরানের হোটেলে বসে ম্যাপ দেখে যা অনুমান করেছিল রানা, ঠিক সেরকমই দেখল শহরটাকে। যেন পৃথিবীর শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছে । ধূলি-ধূসরিত, গাছপালাহীন, ধূসর-বাদামি কাঁচা ইঁট দিয়ে তৈরি বাড়িঘর। আর, অসহ্য গরম। ছায়ায় থেকেও শান্তি নেই। পশ্চিমা পোশাক পরা কিছু ইরানি আছে এখানে, তেহরানে যে রকমটা দেখা যায়, তবে বেশির ভাগই বাদামি চামড়ার আফগান, ঢোলা আলখেল্লার মত পোশাক আর মাথায় পাগড়ি বাঁধা, মুখ ভর্তি দাড়ি। আইন-কানুনহীন কেমন বন্য একটা এলাকা—পুরানো সীমান্ত শহরগুলো সাধারণত যেমন হয়ে থাকে।

জিপ থেকে নামার নির্দেশ দেয়া হলো রানাকে। জিপটা সরিয়ে নিয়ে গেল ড্রাইভার। পিঠে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে ওকে ঠেলে নিয়ে গেল লি, বাজারের ভিতর দিয়ে। বাজারে সিগারেট থেকে শুরু করে গানবাজনার সরঞ্জাম, পারফিউম, প্ল্যাস্টিকের জিনিসপত্র অনেক কিছু আছে; সবই চিনের তৈরি। ফলের দোকান আছে, সেগুলোতে সিসতানি তরমুজ, লাল আঙুর, বাক্সভর্তি বামি খেজুর, আর নানা ধরনের মশলা। ফলের সুবাস আর মশলার ঝাঁঝাল গন্ধ যেন স্থির হয়ে আছে বাতাসে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে রয়েছে আফিমের ঝাঁঝ।

'*ত্যালিয়াক,*' ফিসফিস করে রানাকে বলল এক বুড়ো। একটা পর্দার আড়ালে যেতে ইশারা করল ওকে। দীর্ঘ দিন *ত্যালিয়াক* অর্থাৎ আফিম সেবনের ফলে হলদে হয়ে গেছে দাড়ির রঙ, রানার কাছে এখন আফিম বিক্রি করতে চাইছে।

বুড়োর বুকে ধাক্কা মারল লি। পর্দা নিয়ে সিন্দুকের ওপর উল্টে পড়ে গেল বুড়ো। জ্যাবুলে পুলিশের নগণ্য সংখ্যা অবাক করল রানাকে। অনুমান করল, আসল মাদক চোরাচালানটা হয় বাজার থেকে দূরে কোথাও, তাই এখানকার ছোটখাট টুকটাক বিক্রিকে ওরা দেখেও দেখে না, হয়তো এই অপরাধের সঙ্গে ওরা নিজেরাও জড়িত।

শহরের ভিতর দিয়ে রানাকে হাঁটিয়ে একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় নিয়ে এল লি। এখানে সেই দশটা জিপকে দেখা গেল, কাঁচা ইঁটের তৈরি একটা নিচু গুদামের সামনে দাঁড়ানো। পাশে তরমুজের স্তূপ দেখে মনে হয় তরমুজের ব্যবসা হয় এখানে, তরমুজ নিতে এসেছে গাড়িগুলো। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল গুদামের ঢেউ টিন দিয়ে তৈরি করা দরজা। সারি দিয়ে ভিতরে ঢুকল জিপগুলো।

ভিতরের আবছা আলোয় ডজনখানেক আফগান শ্রমিককে দেখা গেল,

নিজেদের উপজাতীয় পোশাক পরা। তার ওপর আড়াআড়ি পরা রাইফেলের বুলেটের বেল্ট। হাতের রাশান রাইফেলগুলো তাক করে রেখেছে লির লোকদের দিকে। কাঠের তৈরি চায়ের বাক্সের মত বাক্স জিপের পিছনে তুলছে লোকগুলো। সব মিলিয়ে বিশজন লোক, প্রতিটি জিপের জন্য দুজন করে। বিপুল পরিমাণে কাঁচা আফিম রয়েছে বাক্সগুলোতে, ভাবছে রানা, কিন্তু তারপরেও পিটসেনের কারখানার ব্যাপক চাহিদার তুলনায় এগুলো কিছুই নয়। তার মানে বাকিটা আনে লাওস থেকে, প্লেনে করে। খোদাই জানে, কী পরিমাণে!

গুদামের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল লি। রাইফেল হাতে পিছন থেকে ওকে পাহারা দিচ্ছে ওর লোকেরা। একটা খালি বাক্সের ওপর ফুলস্কেপ সাইজের পেটমোটা একটা খাম রাখল লি। একজন আফগান এগিয়ে এসে খামটা তুলে নিয়ে খুলল। ভিতর থেকে বের করে আনল এক গাদা আমেরিকান ডলার। গুনে দেখল।

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল লোকটা, সব ঠিক আছে। নিজের লোকদের দিকে ফিরল লি। ইশারা করল। একসঙ্গে শোনা গেল দশটা জিপের ইঞ্জিনের শব্দ। এক এক করে বেরিয়ে যেতে শুরু করল গাড়িগুলো, এক মিনিট বিরতি দিয়ে দিয়ে। শেষ জিপটায় উঠল রানা ও লি। গুদাম থেকে বেরিয়ে, শহরের কিনারা ঘুরে দ্রুত ছুটে চলল গাড়িটা, চালাচ্ছে একজন তরুণ ড্রাইভার। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছে ও, ভয় পাচ্ছে। মিনিট দশেক পর জ্যাবুল থেকে বেরিয়ে এসে একটা বালি ও পাথরের পাহাড়ের কাছে অন্য নয়টা জিপের সঙ্গে মিলিত হলো গাড়িটা।

রানা দেখল, সামনে, দুই পাশে দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে গাছপালাহীন নগ্ন, রুক্ষ পাহাড়।

পকেট থেকে ছুরি বের করে রানার হাতের দড়ি কেটে দিল লি। বলল, 'এর নাম হেলফায়ার পাস।' মৃদু হাসি খেলে গেল তার কঠিন ঠোঁটে। 'এখন থেকে সামনের জিপটা তুমি চালাবে। যাও, ওঠো।'

হেসে উঠল ওর সঙ্গীরা।

সারির একেবারে সামনের জিপটাতে গিয়ে উঠল রানা। লেফট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ গাড়ি। বাঁ পাশে ড্রাইভারের সিট। তাতে বসল ও। পিছানোর পথ নেই। বুঝতে পারছে, সামনে কঠিন সময়। ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়ল ও। খড়খড় শব্দ তুলে মরুভূমির বালিতে কামড় বসাল ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়ির চারটে চাকা। লাফ দিয়ে এমন করে আগে বাড়ল গাড়ি, সিটের হেলানে ধাক্কা খেল ওর শরীর। স্টিয়ারিং-হুইল নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করল ও। অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারল গাড়ি। উঁচুনিচু জমি আর খানাখন্দে পড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি, দুলছে,

গড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে পিছনে রাখা ভারি বাক্স দুটোও একবার এপাশে সরছে, একবার ওপাশে। কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ের পাহাড়ে রাইফেলের নল থেকে বেরোনো ঝিলিক দেখতে পেল ও, মুখ তুলে দেখল পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গুলি করছে উপজাতীয় আফগানরা। গাড়ির বনেটে লেগে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। স্টিয়ারিং কেটে গাড়িটাকে এপাশ-ওপাশ সরাতে লাগল ও, গুলি এড়ানোর জন্য। তারপর শুনল, রকেট লঞ্চার থেকে ছোঁড়া রকেটের শনশন শব্দ। ওর সামনের রাস্তায় মস্ত একটা আগুনের বল ফাটল যেন, ধুলো আর পাথর ছিটাল, জিপের উইণ্ডশিল্ডটা সাধারণ কাঁচের—চুরচুর হয়ে গেল; ধুলোর মেঘে ঢেকে গেল সামনেটা। ঝট করে হাত তুলে আস্তিন দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল রানা। লম্বা এক টুকরো ধারাল কাঁচ ওর গালে ঢুকে গিয়ে গেঁথে রইল। চোখা দিকটা খোঁচা দিচ্ছে মাড়িতে।

ডান পাশের পাহাড় থেকেও গুলি শুরু হলো। ঠিক পিছনেই দেখা গেল আরেকটা গাড়ি। ওটা পিটসেনের দলের জিপ, না পিছু নেয়া শত্রুপক্ষের, বোঝার সময় নেই। একটা কাজই করতে হবে শুধু এখন, ছুটতে হবে সামনে। অনবরত গুলি আসছে ডানের পাহাড় থেকে। অটোম্যাটিক রাইফেলের একটা গুলি ওর সিটের পিছনে লাগল, ধাতব ফ্রেমে পিছলে গিয়ে বিইইইং শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত এলাকাটা যেন ড্রাগের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে, ডাকাতরা ওর গাড়িতে রাখা বাক্সগুলো ছিনিয়ে নেয়ার জন্য মরিয়া। হুইলে চেপে বসেছে রানার হাতের আঙুলগুলো, গাল থেকে রক্ত আর ঘাম ঝরে শার্ট ভিজাচ্ছে। পিটসেনের চেহারাটা মনে পড়ল ওর। চোখের সামনে ভেসে উঠল কাঁচের ওঅকওয়েতে অসহায় ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়ানো নোভার চেহারাটা। ভাবল, মরুভূমিতে বন্দি হয়ে থাকা নিনার কথা। রাগে আহত চিতাবাঘের মত চাপা গর্জন করে উঠল ও। ডান পায়ে এক্সেলারেটর চেপে ধরল যতটা যায়। গাড়ির গায়ে যেন বুলেট-বৃষ্টি হচ্ছে এখন।

হঠাৎ সিট থেকে ওপরে উঠে গেল রানা। মস্ত গুলতিতে লাগিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়া হলো যেন ওকে। অ্যাক্সেলের নীচে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়েছে। বাঁ কাঁধের ওপর ভর দিয়ে মাটিতে পড়ল ও। প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করে, গড়িয়ে সরে গেল একটা পাথরের আড়ালে। জিপটা গিয়ে পাহাড়ের ঢালে গুঁতো খেয়ে থেমে গেল, নাকটা উঁচু হয়ে রইল ওপর দিকে। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। রানার পিছন থেকে একটা বুলেট এসে ঢুকে গেল পাথরের ফাটলে। ফিরে তাকাল ও। সামনে উঁচু একটা ঢিবি চোখে পড়ল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। এঁকেবেঁকে ছুটে উঁচু ঢিবিটার আড়ালে চলে গেল। একটু দূরে মরচে ধরা একটা ঢেউ টিন দিয়ে কিছু চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। টিনটা সরাতেই দেখা গেল বড় একটা গর্ত। নীচে উঁকি দিয়ে বুঝল,

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

আপনাদের প্রিয় ওয়েবসাইট Banglapdf.net এখন ডোমেইন নেইম পরিবর্তন করে BanglaPdfBoi.Com এ রুপান্তরিত হয়েছে। আপনারা সবাই নিজ নিজ বুকমার্কস পরিবর্তন করে নিবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

চৌবাচ্চা। দূরের পর্বত থেকে সুড়ঙ্গ দিয়ে আসা পানির প্রবাহকে চৌবাচ্চা বানিয়ে ধরা হচ্ছে এখানে, তারপর সেটা থেকে নালা কেটে জ্যাবুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে। গর্তের কিনার ধরে ঝুলে পড়ল ও। হাত ছেড়ে দিয়ে পড়ল পনেরো ফুট নীচের ঠাণ্ডা পানিতে।

একটুক্ষণের জন্য ভাবার সময় পেল ও। কেউ কি ওকে এখানে আসতে দেখেছে? না দেখার কোনও কারণ নেই। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে নির্জন হেলফায়ার পাসটা যেন এই মুহূর্তে ইরানের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর অনুমান, ওকে টোপ বানিয়ে আগে আগে পাঠানো হয়েছে, যাতে ওর ওপর নজর থাকে ডাকাতদের, এই সুযোগে বাকি জিপগুলো উত্তরের রাস্তা ধরে নিরাপদে আর্মি-লরির কাছে চলে যেতে পারে। ওর জন্য এখন পিটসেনের হেড কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়াটা জরুরি। মরুভূমিতে মুক্ত থেকেও নোভা কিংবা নিনা, কিংবা আর কারও কোনও উপকার করতে পারবে না ও। যে-কোন ভাবেই হোক, একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে ওকে, লির লোকদের কাছে ফিরে যেতে হবে।

কোমর-পানিতে দাঁড়িয়ে আছে ও। মাথা ডোবাল ঠাণ্ডা পানিতে। সাবধানে আস্তে করে টেনে বের করে আনল গালে বিঁধে যাওয়া কাঁচের টুকরোটা। ভেঙে দুই টুকরো করল। প্রতিটি টুকরো দুই ইঞ্চির মত লম্বা। কিনারাগুলো ধারালো। যত্ন করে শার্টের বুক পকেটে রেখে বোতাম লাগিয়ে দিল।

একটা পিস্তলের গুলি এসে পানিতে পড়ে পানি ছিটাল। তার মানে, এই সুড়ঙ্গেও অন্তত একজন দস্যু রয়েছে। ডুব দিয়ে পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে নিল রানা, তারপর উজানের দিকে এগোতে শুরু করল ও। দূরের পর্বত থেকে নেমে আসছে বরফগলা এই ঠাণ্ডা পানি। প্রবল স্রোত ঠেলে এগোনো খুব কঠিন। শেষে ডুব দিয়ে এগোনোর চেষ্টা করল ও। সেটা আরও কঠিন—তবে তাতে গুলি খাওয়ার ভয় থাকে না। বহু চেষ্টায় ডুব-সাঁতার দিয়ে মাত্র কয়েক গজ এগোতে পারল। ফুসফুসের বাতাস ফুরিয়ে এলে মাথা তুলতেই আবার একটা গুলি চলে গেল কানের পাশ দিয়ে।

একজন নয়, কয়েকজন রয়েছে সুড়ঙ্গের ভিতর। পানি ঠেলে দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করতে গিয়ে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করল রানা: ফুলে উঠছে পানি। এতে মানুষের কারসাজি রয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। পর্বতের বরফ হঠাৎ করে এতটা গলে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই, ব্যাপারটা স্বাভাবিকও নয়। তার মানে, কোনও ধরনের জলকপাট রয়েছে ওপরে অথবা নীচে। নীচে হলে সেটা বন্ধ করে দিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা হচ্ছে পানি, আর ওপরে হলে খুলে দিয়ে বাড়ানো হচ্ছে পানির প্রবাহ। যেটাই হোক, পানি বাড়ছে। গভীর অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে

না ও।

মাথার উপর হাত তুলল। হায়, হায়! পাথুরে সুড়ঙ্গের ছাত মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে। আরেকটু পানি বাড়লেই দম আটকে মরতে হবে ওকে। ফিরে যেতে পারবে না, তার কারণ অস্ত্রধারী শত্রু রয়েছে পিছনে। অতএব সামনে এগোনো ছাড়া উপায় নেই।

দুই হাত সামনে বাড়িয়ে, পানি ঠেলে এগিয়ে চলল ও। মুখের কাছে উঠে এল পানি। আবার ডুব সাঁতার দিয়ে এগোল। আশা করছে, মাথার ওপরে কোনও ফাঁক-ফোকর পাওয়া যাবে, যেখানে বাতাস থাকবে, মাথা তুললে শ্বাস নিতে পারবে। কিন্তু যখন মাথা তুলল, ছাতটা এতই নীচে নেমে এসেছে, গলা পিছনে বাঁকিয়ে নাকটা উঁচু করে শ্বাস টানতে হলো ওকে। মরিয়া হয়ে, দুই হাতে পানি কেটে ঘোর অন্ধকারে দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করল ও। মিনিট খানেক পর হঠাৎ ওর বাঁ হাত পানিতে না লেগে লাগল বাতাসে। সুড়ঙ্গের ছাতে একটা ফোকর পাওয়া গেছে। উপর থেকে নেমে আসা গর্তও হতে পারে। প্রবল স্রোতের মধ্যেও ওটার কিনারা ধরে কোনমতে ঝুলে থেকে শ্বাস নিল ও। তারপর হাত বাড়িয়ে আরেকটু উপরে দেখল। গর্তের দেয়ালে হাত ঠেকানোর মত একটা পাথর পেয়ে বেয়ে উঠল কিছুদূর। কিন্তু খুব দ্রুতই কোমরের কাছে উঠে এল পানি, পাক খেয়ে ঘুরছে। সুড়ঙ্গ ভরে গেছে, ওখানে আর নামা যাবে না। ওপরে ওঠার চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

নিজেকে টেনে তুলতে গিয়ে দেখে দুদিকের দেয়ালে কাঁধের দুপাশ ঠেকে যায়। সরু একটা কুয়ার মত গর্ত। গা থেকে ধারাল পাথর বেরিয়ে আছে। ওগুলো ওর গায়ের চামড়া কাটছে, হাতের তালুতে খোঁচা দিচ্ছে; আবার ওগুলো ধরে, ওগুলোতে পা রেখেই বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছে ওকে। পানি থেকে সরে এসেছে পা। আর গুলি এল না। তারমানে এই কুয়ার গর্তের মধ্যে এখন একা রয়েছে ও।

এক ইঞ্চি ওপরে উঠল ও। তারপর আরেক ইঞ্চি। রক্তাক্ত হাত আর পায়ের সাহায্যে সরু পাইপের মত গর্ত বেয়ে উঠে চলল। নীচে পানির শব্দ। উঠতে উঠতে যদি আর না পারে, কিংবা বুজে আসে পাইপের মুখ, তা হলে নিজেকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না, নীচের পানিতে পড়ে মরতে হবে। তবে মরার কথা আগেই ভাবতে চায় না ও, যতক্ষণ পারে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। জিপ থেকে পড়ার সময় বাঁ কাঁধের ওপর পড়েছিল, ভীষণ ব্যথা করছে জায়গাটা, বাঁ হাতটা প্রায় নড়াতেই পারছে না, ঠিকমত ব্যবহার করতে পারছে শুধু ডান হাতটাই। তাতে বেয়ে ওঠার কাজটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেছে। পা আর নিতম্বের পেশিতে খিঁচ ধরে যাচ্ছে। যতই ওপরে উঠছে,

আরও চেপে আসছে গর্তের দেয়াল। আরেকটু সরু হলেই বন্ধ হয়ে যাবে এগোনো।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে যেন ঘোরের মধ্যে উঠে চলেছে ও। প্রচণ্ড পরিশ্রমে জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। অক্সিজেনের জোগান দিতে দিতে আর যেন কুলিয়ে উঠতে পারছে না ফুসফুসটা। আগুন ধরে গেছে যেন বুকের ভিতর। কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে এসে চোখের ভিতর জ্বালা ধরাচ্ছে।

নাহ্, আর পারবে না! একেবারেই সরু হয়ে গেছে গর্ত। পা দুটো পাথরে বাধিয়ে জোরে ঠেলা মারল মরিয়া হয়ে। সরু জায়গাটা পেরিয়ে এল। হঠাৎ করেই আবার প্রশস্ত হয়ে গেছে গর্ত। বেঁকে গেছে কোনাকুনি। উপরে আলোর আভাস চোখে পড়ছে এখন। তার মানে বেরোনোর মুখ। নতুন উদ্যমে আবার নিজেকে টেনে নিয়ে চলল রানা। এগোতে আর আগের মত ততটা কষ্ট হচ্ছে না এখন।

পনেরো

প্রচণ্ড গরম বাতাস থাবড়া মারল নাকেমুখে। গর্ত থেকে মাথা বের করল রানা ঠিক একটা ছুঁচোর মত। বাঁ কাঁধে অসহ্য ব্যথা। গরম বালির ওপর নেতিয়ে পড়ে হাঁ করে হাঁপাতে থাকল। মনে হচ্ছে বেহুঁশ হয়ে যাবে। চোখ বুজল। মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে আসছে আপনা-আপনি।

আবার যখন চোখ মেলল ঠিক চোখের সামনেই দেখতে পেল একজোড়া চকচকে পালিশ করা বাদামি চামড়ার জুতো। ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠল দৃষ্টি। ক্রিম কালারের সুট দেখতে পেল। মুখ উঁচু করতেই বাদামি রঙের একটা জুতোর সোল এসে গালে ঠেকল, বালিতে ঠেসে ধরল জুতোটা ওর মুখ।

'দা সিগার টিউব,' পিটসেনের কণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'ব্রিটিশ আর্মির দেয়া নাম, সৈনিকদের সহ্যক্ষমতা পরীক্ষা করত ওরা এভাবে। নিশ্চয় খুব আনন্দ পেয়েছেন। আপনি কী করছেন দেখতে খুব ইচ্ছে করল। অফিসে বসে থাকতে পারলাম না আর। ছুটে চলে এলাম।'

রানার মুখে জুতোর চাপ বাড়ল। রুক্ষকণ্ঠে ধমকে উঠল পিটসেন, 'অ্যাই, এই ছুঁচোটাকে নিয়ে যাও।'

জুতো সরে গেল রানার মুখ থেকে। গড়িয়ে চিত হলো ও। ছোট একটা হেলিকপ্টারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে পিটসেন। ওটাতে করেই এসেছে। দুই হাত ধরে টেনে দাঁড় করানো হলো রানাকে। বাঁ কাঁধের ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ও। ওর

চিৎকারে জক্ষেপ না করে ওকে নিয়ে গিয়ে একটা জিপে তোলা হলো। পিটসেনের হেলিকপ্টারটা তখন উঠে পড়েছে শূন্যে।

বড় আর্মি-লরিটার দিকে চলল জিপের বহর। একটা জিপ—রানাকে যেটা চালাতে দেয়া হয়েছিল, দেখা গেল লরির পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চিন্তে। সামনের উইণ্ডশিল্ড ভাঙা। দুই বাক্স আফিমও দেখা গেল রয়েছে ওতে। অর্থাৎ, বিচ্ছিরি একটা তামাশা করা হয়েছে ওর সঙ্গে। রেগে উঠতে গিয়েও সিদ্ধান্ত নিল রানা, রাগলে ওরই ক্ষতি, কিছুতেই আর প্রশ্রয় দেবে না রাগকে।

লরির কাছে এসে থামল জিপগুলো। সমস্ত বাক্স লরিতে তোলা হলো। রানাকে ফেলে রাখা হলো লরির মেঝেতে। ক্যারাভানসরাইয়ের দিকে চলল লরি। ওখানে অপেক্ষা করছে এমআই-৮ এইচআইপি ট্র্যান্সপোর্ট হেলিকপ্টারটা। বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার ভান করছে রানা, তাই কেউ আর ওর দিকে বিশেষ নজর দিল না। এক সুযোগে সবার অলক্ষে পকেট থেকে কাঁচের টুকরো দুটো বের করে এনে মুখে পুরে জিভের নীচে লুকিয়ে ফেলল।

কাঁধের অসহ্য ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে ঘুমানোর চেষ্টা করল ও, কারণ ঘুমাতে পারলেই শান্তি। ক্লান্তিও কমবে তাতে। লরি থেকে নামিয়ে হেলিকপ্টারে তোলার আগে পানি খেতে দেয়া হলো ওকে, তারপর আবার বেঁধে ফেলা হলো দুই হাত। পিটসেনের আস্তানায় পৌঁছে ভিতরে ঢোকানোর আগে সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে দেহতল্লাশী করার পর কিছু না পেয়ে গোটা কয়েক লাথি সহ কাপড়গুলো ফেরত দেয়া হলো।

আবার হুঁশ ফিরলে দেখল রানা, আগের সেই সেলটায় পড়ে আছে। পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে নোভা। দেহের প্রতিটি পেশিতে প্রচণ্ড ব্যথা। মুখ থেকে কাঁচের টুকরো দুটো বের করে বালিতে রেখে জিভ দিয়ে ঠেলে বালির নীচে ঢুকিয়ে রাখল। মাথা না নেড়ে এমনভাবে করল কাজটা, যাতে লুকানো ক্যামেরার সাহায্যে নজর রাখলেও কেউ কিছু বুঝতে না পারে।

দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হলো। ভিতরে ঢুকল একজন গার্ড। মনে করল, রানা ঘুমিয়ে আছে। ধাঁ করে লাথি মারল ওর পাঁজরে। উঠে দাঁড়ানোর হুকুম দিল দুজনকেই। নোভার পরনে সেই ধূসর রঙের ওঅর্কশার্ট আর ট্রাউজার। ওর নীচের ঠোঁট ফুলে রয়েছে এখনও, যেখানে মেরেছিল পিটসেন। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। ভীত মনে হচ্ছে। হাসির ভঙ্গি করে ওকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু নিজেই বুঝল হাসিটা ভেংচি কাটার মত দেখাচ্ছে। অস্ত্রের মুখে ওদেরকে সেল থেকে বের করে একটা ওয়াশরুমে নিয়ে আসা হলো। পানি খেতে দেয়া হলো। তারপর আনা হলো পিটসেনের অফিসে।

ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসে আছে পিটসেন।

ট্রপিকাল সুট পরেছে। বুক পকেটে গুঁজেছে পপি ফুল। ওকে দেখে এখন মাদক ব্যবসায়ী কিংবা সন্ত্রাসী নয়, জুয়াড়ি মনে হচ্ছে। একটিবারও *সিগার টিউবের* কথা তুলল না ও, ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে উত্তেজিত।

রানা আর নোভাকে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল ওরা। দুজনেরই পিছমোড়া করে হাত বাঁধা।

'আমাদের হেয় করে বড় হতে চাইছ, পিটসেন? এর পরিণতি জানা আছে তোমার?'

'জানি। পরিণতি মৃত্যু। আমার নয়, তোমাদের।'

'ভুল যখন টের পাবে, তখন আর শুধরাবার সময় পাবে না।'

'বোলচাল ছাড়ো, রানা!' ধমকে উঠল পিটসেন। 'যা বলি মন দিয়ে শোনো। আগামী কাল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ, স্মরণীয় দিন হতে চলেছে। এই দিনটির জন্যে ধৈর্য ধরে বহু বছর অপেক্ষা করেছি আমি। আগামী কাল এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি, যার খেসারত দিতে গিয়ে ব্রিটেনকে বহু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, হয়তো কোমরই ভেঙে যাবে—জীবনে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। দুই ভাবে করব আমি কাজটা।'

'ব্রিটেনের কোমর ভাঙলে আমার কী অসুবিধা? আমাকে ওসব শুনিয়ে কী লাভ?'

'তুমি ব্রিটেনের ভাড়াটে স্পাই, তোমাকে পাঠিয়েছে ওরা আমার ক্ষতি করার জন্যে—অস্বীকার করতে পারবে সেটা?'

'পারব। আমি কারও ভাড়াটে মার্সেনারি নই!' জোরের সঙ্গে বলল রানা। 'আমি এসেছি আমার দেশের স্বার্থ দেখতে। আমার দেশের যুবসমাজকে তোমার মত অর্থলোলুপ নরকের কীটের কবল থেকে রক্ষা করতে।'

'তা কি পেরেছো?' মাথা নাড়ল পিটসেন। 'আমার কারখানা বন্ধ করে দিয়েছ তোমরা, আটকে দিয়েছ আমার মালের ট্র্যানজিট রুট, যার ফলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে ওপিয়ামের দাম—কিন্তু পেরেছ আমার তৈরি হেরোইন আটকাতে? তিনগুণ দাম দিয়েই কিনছে না এখন তোমাদের যুব সমাজ?'

'আর বেশিদিন নয়, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে ওই ড্রাগ-ট্রাফিক।'

'কে ধ্বংস করবে আমাকে? তুমি না তোমার মনিব মারভিন লংফেলো?'

'আমি কারও চাকর নই।'

'তোমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট নেই বলতে চাও?'

'আছে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, আমি ইংরেজ নই, বা...'

'ব্যস! পাসপোর্ট থাকলেই আমার চলবে। আর বাঙালি হলে তো সোনায় সোহাগা। এবার শোনো,' একটা ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল ও। 'শুধু মাদক

ব্যবহার করেই ব্রিটেনের সর্বনাশ করে দিতে পারতাম আমি। কিন্তু তার জন্যে অনেক সময় দিতে হতো আমাকে। অতটা ধৈর্য আমার নেই। আমি এখনই করুণ অবস্থা দেখতে চাই ওদের।'

উত্তেজনায় দস্তানা পরা হাত দিয়ে টেবিলে চাপড় মারল পিটসেন। ঘরে পিনপতন নীরবতা। এয়ার-কণ্ডিশনিং মেশিনের মৃদু ঝিরিঝিরি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

'তাই,' বলল ও, 'কাল খুব ভোরে নশাহ্‌র্‌ বন্দর থেকে একটা একরানোপ্লেন—উভচর ওই যানটাকে আপনি দেখেছেন, রানা—রওনা হবে আযারবাইয়ানের উদ্দেশে। ওখান থেকে আরমেনিয়া হয়ে গিয়ে কৃষ্ণ সাগরে পড়বে। যেহেতু উভচর, পানিতেও চলতে পারবে, মাটির কয়েক ফুট ওপর দিয়ে মরুভূমি পেরোতেও কোন অসুবিধে হবে না ওটার—কোনও রেডারেই ধরা পড়বে না। কৃষ্ণ সাগর থেকে ভূমধ্যসাগর, তারপর জিব্রাল্টার দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে ব্রিটেনের কাছাকাছি। পথে বিভিন্ন পয়েন্টে অপেক্ষা করবে আমার তেলের ট্যাংকার। তেল নিতেও অসুবিধে হবে না। ছয়টা অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে ওই একরানোপ্লেনে, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড লাগানো রকেট। ওগুলো ছোঁড়া হবে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরের ওপর।

'রাশান ফ্ল্যাগ আঁকা রয়েছে একরানোপ্লেনে। কাগজপত্র সব রাশান। নাবিকদের পার্সপোর্টও রাশান। ওদের মধ্যে আমার দুজন বিশ্বস্ত লোক থাকবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে নানারকম অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবে ক্রুরা, আমার দুজন লোক বাদে। ওরা একরানোপ্লেন থেকে বেরিয়ে একটা বোটে করে সরে পড়বে। বোটটাও ঠিক করাই আছে। লণ্ডন আক্রান্ত হলে ব্রিটিশ নেভিও বসে থাকবে না। হই-হই করে ছুটে আসবে একরানোপ্লেনের দিকে। কয়েকজন *রাশান* নাবিকের মৃতদেহ ছাড়া ভিতরে আর কিছুই পাবে না। এমনিতেই রাশাকে দেখতে পারে না, এই ঘটনার পর পাল্টা আক্রমণ করতে আর কারও উস্কানি লাগবে না। দারুণ একটা ব্যাপার হবে, তাই না?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে ডেস্ক ঘুরে নোভার পাশে এসে দাঁড়াল পিটসেন। দস্তানা পরা হাতটা দিয়ে নোভার থুতনি ধরে আচমকা হ্যাঁচকা টান মারল। 'আহা, কাল সন্ধ্যায় শ্রমিকরা কী খুশিই না হবে তোমাকে পেয়ে।' রানাকে বলল, 'এখন চলুন, আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাদের।' গার্ডকে ইশারা করল ও।

নোভা ও রানাকে টেনে দাঁড় করাল গার্ড। করিডোর ধরে নিয়ে চলল পিটসেনের পিছন পিছন।

ইলেকট্রিক কার্ট ওদেরকে পৌঁছে দিল ইস্পাতের তৈরি বড় দরজাটার কাছে। ওটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা, মরুভূমির চোখ ধাঁধানো রোদে। আবারও কি-

প্যাডে দরজা খোলার কোড টেপার সঙ্গে সঙ্গে স্বরগ্রামের পাঁচটা সুর বাজল। রানা খেয়াল করল, সেই একই শব্দ! এগুলোর মধ্যে একটা নোট সম্ভবত দু'বার বেজেছে।

ওদের সামনে, বালির মাঝখানে তৈরি করা হয়েছে মাইল খানেক লম্বা একটা রানওয়ে। দুই পাশে বসানো গ্রিড আর হলুদ ল্যাণ্ডিং লাইট। রানওয়ের একপাশে দুটো হেলিকপ্টার, ওগুলো আগেই দেখেছে রানা। অন্যপাশে একটা লিয়ারজেট ও একটা টুইন-ইঞ্জিন সেসনা ১৫০ই প্লেন।

আর ওগুলোর পাশে, সকালের রোদে যেন জ্বলছে মস্ত, সাদা রঙের, এই পরিবেশে সম্পূর্ণ বেমানান, একটা ঝকঝকে নতুন ব্রিটিশ এয়ারলাইনার : একটা ভিকারস ভিসি-১৫, গায়ে বড় বড় অক্ষরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ লেখা, লেজে আঁকা ইউনিয়ন ফ্ল্যাগ। ওয়েল্ডিং মেশিন নিয়ে ওটার কারগো বে-তে কাজ করছে কয়েকজন মেকানিক।

'এভিয়েশন,' পিটসেন বলল, 'আমার একটা ছোট্ট হবি। আর এখানকার মত এতবড় অঞ্চলে দ্রুত চলাচলের জন্যে প্লেন ছাড়া গতি নেই। ওই ভিসি-১৫-টা আমার নতুন অর্জন। বাহরাইনের দিকে যাচ্ছিল ওটা, ভিতরে ছিল তেল কোম্পানির কিছু লোক আর ওদের পরিবার। ছুটি কাটাতে যাচ্ছিল। কিন্তু ব্রিটেন থেকে রওনা দেয়ার একটু পরেই ওরা জানতে পারল, দুজন এগজিকিউটিভকে যা ভেবেছিল তা ওরা নয়। ওরা আমার লোক। অস্ত্রের মুখে পাইলটকে প্লেন অন্যদিকে চালাতে বাধ্য করে। তিন দিন আগে প্লেনটাকে এখানে নামিয়েছে সে।'

চট করে নোভার দিকে তাকাল রানা। ও কী ভাবছে বোঝার চেষ্টা করল। এয়ারস্ট্রিপের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটার চঞ্চল দৃষ্টি, ছোট হ্যাঙারটার উপর স্থির হলো এক মুহূর্তের জন্য, তারপর সরে গেল দূরের মরুভূমির দিকে। মনোবল সংগ্রহের চেষ্টা করছে যেন মেয়েটা, রানার মনে হলো।

'আগামী কাল,' পিটসেন বলল, 'ওই প্লেনটা গিয়ে ঢুকবে রাশায়। জাখারভ-১৭, নামটা হয়তো শুনে থাকবেন, রাশার অত্যাধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রের সংযোজন কেন্দ্র ও গুদাম। প্লেনটাতে ততটুকু তেলই ভরা হবে, যাতে ঠিক জাখারভ-১৭'র কাছে পৌঁছেই শেষ হয়ে যায় ফিউয়েল। ওখানে পৌঁছেই কার্গো বে খুলে একটা বোমা পড়বে নীচে। বোমাটার ধ্বংস করার ক্ষমতা খুব বেশি নয়, তবে এর পরেই আসলে শুরু হবে একের পর এক পারমাণবিক বিস্ফোরণ—ধ্বংস হয়ে যাবে রাশার এক তৃতীয়াংশ অস্ত্রের মজুত। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, এটা রাশান সরকারকে খেপিয়ে দিয়ে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ানোর জন্যে যথেষ্ট।'

'ওখানে পৌঁছুতেই পারবেন না আপনি,' রানা বলল। 'রেডারের জাল তৈরি

করে রাখা হয়েছে জাখারভ-১৭-এর ওপরের আকাশে।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল পিটসেনের মুখে। 'রেডারে ধরা পড়লে প্রথমে হুমকি দেবে, তারপর গুলি করে নামানোর চেষ্টা করবে। তা-তে কোনও ক্ষতি নেই। এমনিতেও তো ক্র্যাশ করবে প্লেনটা, কাজেই গুলি করলেই কী আর না করলেই কী। রাশান গোয়েন্দারা আবিষ্কার করবে, একটা ব্রিটিশ বিমানের ধ্বংসাবশেষ, ভিতরে জাখারভ-১৭'র বেশ কিছু নকশা, আর ককপিটে দু'জন ব্রিটিশ নাগরিকের লাশ।'

'তাতে লাভটা কী?' রানার প্রশ্ন।

'হায় হায়, এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারছেন না? নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করছেন? শুনুন, রাশান একরানোপ্লেন লণ্ডনে পারমাণবিক হামলা চালাবে, আর ব্রিটিশ বিমান জাখারভ-১৭'এ বোমা ফেলবে। প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে গোটা দুনিয়া, সেই সুযোগে বেশ কয়েকটা বোমা চালাচালি হয়ে যাবে দুই দেশের মধ্যে। ধমক-ধামক মেরে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পরাশক্তি যখন ওদের থামাতে পারবে, ততক্ষণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে দুই দেশের। প্ল্যানটা কেমন মনে হচ্ছে আপনার কাছে?'

নোভার দিকে তাকাল রানা। নোভা এখনও তাকিয়ে আছে দূরের মরুভূমির দিকে। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। মৃদু টলছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে।

'মানুষ এত বোকা নয় যে সাধারণ একটা ক্রিমিনালের এসব কূট চাল বুঝবে না,' রানা বলল। 'রাশা আর ব্রিটেন যে এখন কোন কারণেই যুদ্ধে জড়াবে না, সেটা আপনি ছাড়া সবাই জানে।'

'জানুক,' বিমল হাসি ছড়িয়ে পড়েছে পিটসেনের মুখে। 'হয়তো আমার প্ল্যান সফল হবে না, কিন্তু খোঁচা দিয়ে দেখতে অসুবিধে কী? একটা উদ্দেশ্য তো সফল হবেই। ব্রিটেনের ধ্বংস তো কেউ ঠেকাতে পারছে না; পারমাণবিক ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাবে লণ্ডন শহর। ইংরেজদের এত সাধের হাউস অভ পার্লামেন্ট, বুড়ো বিগ বেন, ন্যাশনাল গ্যালারি, লর্ডের ক্রিকেট গ্রাউণ্ড...'

'কিন্তু এই ডিসি-১৫,' রানা বলল, 'কোন্ বোকা এটাকে ওড়াতে যাবে?'

'এ তো, খুবই সহজ, রানা,' ওর দিকে এক পা এগোল পিটসেন, 'আপনি। আপনি ওড়াবেন। আপনার তো ব্রিটিশ নাগরিকত্ব আছেই।'

'একে তো এতবড় প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা আমার নেই। তার ওপর কাঁধের জোড়া ছুটে গিয়ে বাঁ দিকটা অচল হয়ে আছে।'

লির দিকে তাকাল পিটসেন। 'লি, এর কাঁধটা মেরামত করে দাও দেখি।'

রানাকে শুয়ে পড়তে বলল লি। চিত হয়ে শুলো রানা। ওর বুকে বুট তুলে

নিয়ে বাঁ হাতটা দুই হাতে চেপে ধরল লি। তারপর আচমকা ভয়ানক এক টান মারল। সকেটে বসে গেল আবার কাঁধের প্রক্সিম্যাল হিউমেরাস।

যেন কিছুই ঘটেনি, এমনি ভঙ্গিতে বলে গেল পিটসেন, 'প্লেনের ভেতর প্রচুর সহায়তা পাবেন আপনি। এখান থেকে আকাশে ওড়াবে ওটার আসল পাইলট। তারপর সময়মত আপনার হাতে ছেড়ে দেবে। সারাটা রাস্তা আমার বিশেষ প্রতিনিধি আপনার পাশে বসে থাকবে, সুতরাং কোনই অসুবিধে হবে না আপনার।'

বালিতে বসে হাঁপাচ্ছে রানা। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। ব্যথায় ঘাম দিয়েছে শরীরে। কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ে চোখে ঢুকে জ্বালা ধরাচ্ছে।

ওদেরকে নিয়ে ইলেকট্রিক কার্টের কাছে ফিরে চলল পিটসেন। গাড়িতে উঠল। গিয়ার দিল ড্রাইভার। সামনের খোলা ইস্পাতের দরজাটার দিকে এগোল গাড়ি।

'যা-ই হোক,' পিটসেন বলল রানাকে, 'আপনার কোনোই সমস্যা হবে না। কারণ প্লেনটাকে ল্যাণ্ড করাতে হবে না।'

সেলে ফিরে স্বস্তি বোধ করল রানা। বালির নীচে পায়ের আঙুল ঢুকিয়ে কাঁচের টুকরো দুটোর অস্তিত্ব টের পেয়েছে। নোভার দিকে ফিরল।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল নোভা, 'কী করছ?'

'পালানোর চেষ্টা,' নোভার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল রানা। 'পিটসেন আমাদেরকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই যা করার করতে হবে। আরও কাছে এসো। আমার গা ঘেঁষে শোও। এমন ভান করো, যেন আমার ব্যথা কমানোর চেষ্টা করছ। তারপর যা বলি, মন দিয়ে শোনো।'

কাছে সরে এল নোভা।

আবার জিভ দিয়ে বালি সরিয়ে কাঁচের টুকরো দুটো বের করল রানা। দুই আঙুলে টিপে ধরল একটা টুকরো। 'আমার দিকে পিছন ফিরে শোও। হ্যাঁ, হয়েছে। ধারাল কিছু টের পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার হাতের দড়িটা এর ওপর রাখো। খুব ধীরে ধীরে ঘষতে আরম্ভ করো। লুকানো ক্যামেরা আছে কি না জানি না। মনে হয়, নেই। তবু, কোনরকম ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।'

পুরো দুটো ঘণ্টা অক্লান্তভাবে একটানা ঘষার পর নাইলনের দড়ির একটা জায়গা কেটে ফেলল নোভা, অল্প একটুখানি লেগে রয়েছে এখন, টান দিয়ে ছিঁড়ে

ফেলতে পারবে। নোভারটা কাটা হয়ে যাওয়ার পর রানার দড়ি কাটায় মন দিল ওরা।

'গানবাজনা কিছু জানো তুমি, নোভা?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'বেহালা আর পিয়ানো বাজিয়েছি এক সময়। আমার বাবার খুব পছন্দ। আসলে, সব রাশানই বাজনা ভালবাসে। অনেক সময় এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, বাজনা শুনতে শুনতে কাঁদে। কেন?'

'আমি যদি স্বরগ্রামের পাঁচটা স্বর গুনগুন করি, সেগুলো শুনে তুমি বুঝতে পারবে, প্রতিটা স্বর এক থেকে নয় পর্যন্ত কোন্ কোন্ সংখ্যা বোঝাচ্ছে?'

'হয়তো পারব। কড়ি ও কোমল মিলিয়ে মোট বারোটা নোট আছে—পারা তো উচিত।'

'আমার কাঁধে মাথা রাখো।'

দরজা খোলার সময় প্রতিটি বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে যে সুর বেজেছিল, গুনগুন করে সেগুলো নোভাকে গেয়ে শোনাল রানা। কান পেতে শুনল নোভা, নিজেও গুনগুন করল। প্রতিটি সুর কয়েকবার গুনগুন করার পর বলল, 'মোটামুটি বুঝেছি, রানা, তবে কোথায় যেন একটা ভুল রয়ে গেছে...' কয়েক সেকেণ্ড ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করল ও, তারপর হঠাৎ হেসে উঠল ও। 'এহ্‌হে, রানা, আসল জিনিসটাই তুমি বাদ দিয়ে বসে আছো।'

'আস্তে!' বলল রানা।

গলা নামিয়ে আবার বলল নোভা কথাটা।

'মানে?'

'*শূন্য*-কে তুমি ধর্তব্যের মধ্যে নাওনি। ওটাকেও ধরতে হবে।' স্বরগুলো আবার গুনগুন করল নোভা। 'এ রকম না?'

'হ্যাঁ, ঠিক এ রকমই তো শুনলাম। নম্বরগুলো কী হবে?'

'এক, শূন্য, ছয়, ছয়, নয়। এর কী মানে, তুমিই জানো।'

'জানি,' হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'দরজা খোলার জন্যে বোতামের এই নম্বরগুলোই টিপতে হবে। শোনো, এখান থেকে বেরিয়ে—যদি বেরোতে পারো—সোজা ডিসি-১৫-য় গিয়ে উঠতে হবে তোমাকে। এখন বিকেল। মাঝরাতের পর কোনও এক সময়, এই ধরো, একটা থেকে দুটোর মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে তোমাকে। ওই সময়ে সাধারণত পাহারায় ঢিল পড়ে প্রহরীদের।'

রানার দড়িটাও কাটা হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইল দুজনে। তারপর নোভা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খিদে পেয়েছে?'

'রাক্ষুসে খিদে।'

'কী খেতে চাও এখন?'

'কাবাব বানিয়ে দিলে তো একটা আস্ত গরুই খেয়ে ফেলতে পারব।' সিরিয়াসলি ভাবার ভান করল রানা। 'তবে খালি পেটে এত গরু খাওয়াটা ঠিক হবে না। তাই, প্রথমে সহজপাচ্য কিছু দিয়ে শুরু করতে হবে। আমাদের দেশি খাবারের কথা বলব না, কারণ তুমি বুঝবে না। তারচেয়ে অন্য কিছু বলি, এই ধরো, এগ বেনেডিক্ট। তারপর, ক্যাভিয়ার—আবু হাশিমের বাগানে যেটা দিয়েছিল, আঁশটে গন্ধ লাগায় খেতে পারিনি। রোস্ট করা হাঁসের মাংস, কবুতর হলেও চলবে। আর এক বোতল বোলিঞ্জার গ্রান্দে অ্যানি ১৯৫৩, আর খানিকটা রেড ওয়াইন—শ্যাতো ব্যাটাইলি প্যারিসে এক বন্ধু আমাকে খাইয়েছিল।'

'আর কিছু?'

'এগুলো খেতে চাই ফার্স্ট ক্লাস কোনও রেস্টুরেন্টে, তোমার সঙ্গে বসে। এখন, ভবিষ্যতের সেই দিনটির কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমানোর চেষ্টা করো। সময় হলে জাগিয়ে দেব।'

'হুঁ। খাওয়া শেষ করে তোমার সঙ্গে হোটেল কামরায় পৌঁছে গেছি,' নোভা বলল। 'জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে গার্ডেনিয়ার গন্ধ। তুমি এগিয়ে এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলে...'

নোভা ঘুমিয়ে পড়লে, ছাতের দিকে তাকিয়ে ক্যামেরার লেন্স খুঁজল রানার চোখ। অন্ধকার সেল, বাইরের করিডোর থেকে দরজার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে ঢুকছে সোডিয়াম ল্যাম্পের আলো। নোভার উপর ভরসা রাখা যাবে কি না ভাবছে ও। যাবে, কেন যেন মনে হলো ওর।

অবশেষে, রাত দুটো বেজেছে অনুমান করে আস্তে করে ঠেলা দিয়ে নোভার ঘুম ভাঙাল রানা। উঠে দাঁড়াল দুজনে। রানার কাঁধের ব্যথা বেশ কিছুটা কমেছে, ভোঁতা দপদপে ব্যথা এখন, জায়গাটা ম্যাসাজ করে দিল নোভা। রানার গালের কাঁচ ঢোকার গভীর কাটাটায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিল, ওখানে চুমু খেল। তারপর বলল, 'বাড়ি ফিরেই ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে তোমাকে, তাই না, সোনা? মাড়িতেও নিশ্চয় ক্ষত হয়ে গেছে।'

মুখ বাঁকাল রানা।

'আরেকটা কথা,' নোভা বলল, 'নিনার কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি? এখান থেকে বেরোতে পারলে ওকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'না, ভুলিনি।' নোভার ঠোঁটে চুমু খেল রানা। ওর কাঁধ ধরে দরজার দিকে ঘুরিয়ে দিল। ব্যথায় জর্জরিত শরীর নিয়ে পাথর বেয়ে উঠে গেল দরজার মাথায়, একটা খাঁজের কাছে। ওখান থেকে বলল, 'হ্যাঁ, শুরু করো।'

গ্রিলের কাছে মুখ এনে ফিসফিসে স্বরে প্রহরীকে ডাকল নোভা। অন্যপাশ

থেকে কোনও জবাব এল না। কিন্তু প্রহরী আছেই, রানা নিশ্চিত, কারণ কারখানায় কাজ চলছে।

'আবার ডাকো,' ওপর থেকে বলল ও।

'শ্‌শ্‌! আসছে!'

পায়ের শব্দ কানে এল রানারও। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো পড়ল ভিতরে।

ধূসর ওঅর্কশার্টের ওপরের দিকের দুটো বোতাম খুলে সামান্য ফাঁক করে দিল নোভা। 'চাও আমাকে?'

'বিনিময়ে তুমি কী চাও?' পাল্টা প্রশ্ন করল প্রহরী।

'তোমাকে!' ওর কানের কাছে ফিসফিস করল নোভা।

'ও কোথায়?' জিজ্ঞেস করল গার্ড। ঝিক করে উঠল ওর চোখ টর্চের আলোয়।

'ঘুমোচ্ছে। কাঁধে ব্যথা পেয়েছে। বাদ দাও ওর কথা। ও বাতিল হয়ে গেছে।' ওঅর্ক ট্রাউজারের বেল্টে হাত দিল নোভা। 'জলদি এসো।'

তবু দ্বিধা করছে লোকটা।

শার্টের আরেকটা বোতাম খুলে ওপর দিকটা পুরো ফাঁক করে দেখাল নোভা বুক ঠেলে দিল টর্চের আলোর সামনে।

তালা খোলার শব্দ শুনল রানা। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে দেখল গার্ডকে। পাল্লাটা আবার লাগাতে যাচ্ছে, এ সময় লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল ও। এক হাতে মুখ চেপে ধরে আরেক বাহু দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরল। লোকটার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিল নোভা।

ছটফট, ধস্তাধস্তি করতে লাগল লোকটা। কিন্তু সামান্যতম চাপ কমাল না রানা। অবশেষে নিথর হয়ে গেল গার্ড। লাশটা একপাশের বালিতে পুঁতে পা দিয়ে উপরটা সমান করল রানা। তারপর নোভাকে নিয়ে অনেকগুলো প্যাসেজের গোলকধাঁধায় বেরিয়ে এল ও। একটা করিডোর ধরে দৌড়ে সরে যেতে থাকল সেল থেকে দূরে, এলিভেটরের দিকে। এলিভেটরের কাছে পৌঁছে দরজাটা দেখিয়ে নোভাকে টপ লেভেলে চলে যেতে বলল রানা। নোভা এলিভেটরে উঠলে বোতাম টিপে দিল। দেখল সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে নোভা, উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে, ট্রাউজারের কোমরে গোঁজা মৃত গার্ডের পিস্তলটা।

অপেক্ষা করছে ও। অনুমানে যখন বুঝল, দরজার কাছে পৌঁছে গেছে নোভা, ঘুরে পিটসেনের অফিসের দিকে ছুটল ও। ইচ্ছে করেই পিটসনের অফিসের দরজায় সিকিউরিটি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে এন্ট্রিপ্যাডের বোতাম টিপতে লাগল এলোমেলো ভাবে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দরজার মাথার একটা লাল বাতি

টিপটিপ করে জ্বলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল সাদা আলোর বন্যায় ভেসে গেল করিডোরটা, তীক্ষ্ণ শব্দে সাইরেন বাজতে লাগল, কানে এল অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ডাক। করিডোর ধরে অসংখ্য বুটের শব্দ ছুটে আসছে ওর দিকে।

যাক, ওর পরিকল্পনা সফল হয়েছে, নোভাকে পার করে দিতে পেরেছে। এখন নিজের বাঁচতে হবে। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল ও।

ষোলো

মুহূর্তে ঘিরে ফেলা হলো রানাকে। ছয়টা সেমি-অটোম্যাটিক রাইফেলের নলের মুখ তাকিয়ে আছে ওর মাথার দিকে, আর তিনটে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের তিন জোড়া চোখ চেয়ে রয়েছে ওর কণ্ঠনালীর দিকে। খুনে চেহারা ওগুলোর। ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি কামড়ে ছেঁড়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। শিকল ধরে টেনে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে প্রহরীরা। পিটসেনের অফিসের দরজার দিকে পিঠ দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রানা। দুই হাত তুলে রেখেছে মাথার উপর। মনে মনে হিসেব কষছে, নোভার বেরোতে ঠিক কতক্ষণ লাগবে।

রানার ধারণা, পিটসেনের লোকরা ওকে এখনই মারবে না। কারণ, ওকে দিয়ে বিমান চালানোর পরিকল্পনা করেছে পিটসেন। তবু, বলা যায় না কিছুই—এখন বেশি নড়াচড়া না করাই ভাল।

করিডোরের শেষ মাথায় একটা মূর্তি দেখা গেল। এগিয়ে আসছে এদিকে। মাথায় ফরাসি সামরিক বাহিনীর ক্যাপ। লিকে একা দেখে অদ্ভুত এক ধরনের স্বস্তি বোধ করল রানা। নিশ্চয় নোভাকে পায়নি।

ফারসিতে ধমকে উঠল লি। গার্ডেরা সরে গিয়ে ওকে আসার জায়গা করে দিল।

'মেয়েটা কোথায়?' রানাকে জিজ্ঞেস করল লি।

'জানি না,' জবাব দিল রানা। 'ঘুম ভেঙে যেতে দেখলাম গার্ডও নেই, নোভাও নেই কোথাও। দরজাটা খোলা পেয়ে বেরিয়ে এসেছি।'

'হাতের বাঁধন খুলল কী করে?'

'জানি না। ঘুম থেকে জেগে দেখছি, খোলা।'

সেলের দরজা খোলা নিশ্চয় দেখতে পাবে ওরা। বিল্ডিঙের আশপাশে খুঁজবে। পরদিনই ধ্বংস করে দেয়া হবে জেনেশুনে এমন একটা প্লেনে উঠে বসে

থাকবে মেয়েটা, একথা হয়তো কল্পনা করবে না। সেই জুয়াটাই খেলছে ওদের সঙ্গে রানা।

মাথা ঝাঁকি দিয়ে সেলের দিকে ইঙ্গিত করল লি। হুকুম দিল গার্ডদের। পিঠে অস্ত্র ঠেকিয়ে সেদিকে রানাকে নিয়ে চলল ওরা। নরক গুলজার শুরু হয়েছে যেন বিল্ডিঙের ভিতরে। এখনও তীক্ষ্ণস্বরে সাইরেন বাজছে। বুট পরা অসংখ্য পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছোটাছুটি করছে দিশেহারার মত। সবাই এদিকে ব্যস্ত। এই সুযোগে অন্ধকারে, নিঃশব্দে নোভার ছিপছিপে দেহটা প্লেনের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে কল্পনা করতে ভাল লাগল রানার।

সেলে ঢোকানো হলো ওকে। দুজন রইল ওর সঙ্গে, দুজন পাহারা দিচ্ছে বাইরে। কয়েক মিনিট পর সাইরেন আর পদশব্দ থেমে গেলে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল লি।

রানাকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল ও। বালিতে যেখানে কাঁচের টুকরো দুটো লুকানো রয়েছে, ঠিক তার কাছেই হাঁটু রাখল রানা।

'মেয়েটা কোথায়?' আবার রানাকে জিজ্ঞেস করল লি।

'জানি না,' আবারও একই জবাব দিল রানা।

ওর বুকে লাথি মারল লি। বুট পরা পায়ের প্রচণ্ড আঘাতে পাঁজরের হাড় এমন ভাবে ফুটল, রানার মনে হলো অন্তত তিনটে হাড় দু'টুকরো হয়ে গেছে। গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

পকেট থেকে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগ বের করল লি। সেটা থেকে বের করল হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি দুটো চপস্টিক, লাল রঙ দিয়ে চিনা ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে ওগুলোতে।

রানার দুই হাত আবার বেঁধে ফেলা হলো। চুল খামচে ধরে মাথাটা সোজা করে ধরে রাখল একজন গার্ড, আরেকজন চিবুকের নীচে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে আটকাল, যাতে মাথা নড়াতে না পারে রানা। এক এক করে ওর দুই কানে দুটো চপস্টিক ঢুকিয়ে দিল লি। ধীরে ধীরে কানের পর্দায় গিয়ে ঠেকল ওগুলো। কানের ভিতরে চোখা মাথা দুটোর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে রানা।

'খারাপ খারাপ কথা শোনো তুমি,' শান্তকণ্ঠে বলল লি। 'আমার ওস্তাদ বলতেন, খারাপ কথা শোনা মোটেই উচিত না মানুষের।'

মাথা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। ওর পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল লি। আরও দুজন গার্ড এসে দুদিক থেকে ধরল রানাকে। কানের ভিতর থেকে বেরিয়ে থাকা চপস্টিকের ফুটখানেক দূরে ঝুলছে লির দুই হাত মোটা মোটা আঙুলওয়ালা হাত দুটো আরও খানিক ছড়াল সে।

চোখ বুজল রানা। ব্যথাটা সহ্য করার প্রস্তুতি নিল। সজোরে চপস্টিকের

পিছনে থাবা মারতে যাবে লি, এই সময় একটিমাত্র শব্দ শোনা গেল, 'থামো।'

চোখ মেলে রানা দেখল, সেলের গ্রিল চেপে ধরে রেখেছে সাদা দস্তানা পরা একটা হাত। টান দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল পিটসেন। পপি রঙের একটা সিল্কের গাউন পরা।

'থ্যাংক ইউ, লি। এখন তুমি যেতে পারো। প্লেন ওড়ানোর সময় পাইলটের কথা শোনার জন্যে ওর কান দুটো দরকার হবে। এই, ছাড়ো ওকে। উঠুন, রানা।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'কুস্তিটা তা হলে পালিয়েছে। শ্রমিকরা শুনলে খুব হতাশ হবে। তবে ওদের খুশি করার উপকরণের অভাব নেই আমার কাছে।'

নিশ্চয় নিনার কথা বলছে ও, ভাবল রানা। নোভার বদলে ওর বোনকে ছুঁড়ে দেবে শ্রমিকদের সামনে। শ্রমিকরা বুঝতেই পারবে না তফাৎটা।

নোভার প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার জন্য রানা জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কখন উড়ব আমরা?'

'আমার প্ল্যান থেকে সরে যেতে হবে এমন কিছুই ঘটেনি এখনও,' পিটসেন বলল। 'ওই মেয়েটাকে আমার লোক ঠিকই খুঁজে বের করবে, মরুভূমিতে লুকাবার জায়গা নেই। ওকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। ঠিক সময়েই উড়বে প্লেন। তেহরানের এক নোংরা বাজার থেকে একজন পালোয়ান জোগাড় করেছি আমি, ওর নাম হুমান। প্রথমে বাজারে দেহ কসরতের খেলা দেখাত, অন্য পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়ার বাজি ধরত। তারপর অপরাধীদের সর্দার হলো। হেন কুকর্ম নেই, যা ও করতে পারে না। আট-দশটা খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, পুলিশ ধরতে পারলে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাত। ওকে এনে আশ্রয় দিয়েছি আমি। ট্রেনিং দিয়েছি। ইংরেজি বলা শিখিয়েছি। এখন আমার গোলাম। প্লেনে আপনাকে ওর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। আগেই বলেছি, প্লেনে যা তেল আছে, তাতে জাখারভ-১৭ পর্যন্ত যেতে পারবে, তার বেশি না। হুমানের নির্দেশে প্লেনটা নীচে নামবে, বোমাটা ফেলা হবে, তারপর আরও নীচে নামবে প্লেন, তখন প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দেবে ও। আপনি উড়তে থাকবেন, যতক্ষণ না তেলের শেষ বিন্দুটুকুও ফুরিয়ে যায়, আর তারপর...' দুই হাত ছড়িয়ে এক বিশেষ ভঙ্গি করল পিটসেন।

'বুঝলাম।'

'হুমান ঝাঁপ দেয়ার পর হিরোইক কিছু করার কথা ভেবে থাকলে ভুল করবেন। তিনজন সশস্ত্র গার্ড থাকবে প্লেনের ভিতর। হুমানের বেরিয়ে যাওয়ার কথা জানতে পারবে না ওরা। জানবে না তেল ফুরানোর কথাও। ওরা আমাকে বিরক্ত করেছে। আমার কাছে ভাল হওয়ার চেষ্টায় ওরা এখন মরিয়া। ওরা ভাবছে, এটা ওদের শেষ সুযোগ। ওরা জানে, বোমা ফেলার পর প্লেন ঘুরিয়ে আবার এখানে ফিরে আসবে হুমান।' নিষ্ঠুর হাসি ফুটল পিটসেনের ঠোঁটে। 'ওরা এটাও

জানে না যে, ওদের কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকবে। আপনার সঙ্গেই প্লেন নিয়ে আছড়ে পড়বে ওরা। অলৌকিকভাবে কেউ যদি বেঁচে যায়ও—যদিও সেরকম কোনও সম্ভাবনাই দেখছি না আমি—হাইওয়েতে ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিঙের কোন গল্প বানিয়ে বলে লাভ হবে না রাশান পুলিশকে।'

ঘড়ি দেখল পিটসেন। 'প্রায় চারটে বাজে। বিছানায় ফিরে যাচ্ছি আমি। ঠিক ছটায় উঠে পোচ ডিম, মাংস ভাজা আর কফি দিয়ে নাস্তা খাব।'

'আমার ডিমে গোলমরিচের গুঁড়ো দিতে বলবেন,' রানা বলল।

'আটটার সময় শুধু এক কাপ পানি পাবেন,' পিটসেন জবাব দিল। 'আর কিছু নয়। এখন ঘুমান। আগামীকালটা হবে আপনার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য দিন।'

বেরিয়ে গেল পিটসেন। ঝনঝন করে বন্ধ হয়ে গেল সেলের লোহার দরজা। বালিতে শুয়ে পড়ে জিভ দিয়ে কাঁচের টুকরো দুটো খুঁজতে শুরু করল রানা।

সকাল আটটার কয়েক মিনিট আগে সেল থেকে বের করা হলো রানাকে। এখনও পায়ে জুতো নেই ওর, পরনে সেই ছেঁড়া ওঅর্কশার্ট। প্রথমে ওয়াশরুমে নেয়া হলো ওকে, তারপর পিটসেনের অফিসে।

লিনেনের সুট পরে আছে পিটসেন। উত্তেজনা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে লোকটার ভিতর থেকে। কোটের বাটনহোলে একটা নতুন পপি ফুল গোঁজা, শার্টটা আনকোরা নতুন, গলার লাল টাই জ্বলছে আগুনের মত। উঁচু কপাল থেকে ক্রিম দেয়া চুলগুলো টেনে পিছন দিকে আঁচড়ানো। এমনকী হাতের সাদা দস্তানাটাও ধুয়ে ইস্ত্রি করা হয়েছে।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ইনসিগনিয়া আঁটা ক্যাপটেনের একটা ইউনিফর্ম তুলে ধরল ও। রানাকে বলল, 'বিমানটা খসে পড়ার পাঁচ মিনিট আগে এটা পরবেন আপনি। প্লেনে রেখে দেয়া হবে এটা। ক্যাপ্টেনের পোশাকে দারুণ মানাবে আপনাকে, রানা। আপনি নিশ্চয় খুব এনজয় করছেন, তাই না?'

জবাব দিল না রানা।

ডেস্ক ঘুরে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল পিটসেন। 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই উড়তে দেখব আপনাদের। তারপর মহা অঘটনের অপেক্ষায় থাকব। আপনার দেশের কাউকে একটা ফেয়ারওয়েল মেসেজ পাঠাতে চান? আপনার বসের কাছে? কিংবা কোনও আত্মীয়া...'

'চাই।'

'কার কাছে?'

'আমার বস মেজর জেনারেল রাহাত খান।'

'কী মেসেজ?'

নিনার কথাগুলো কানে বেজে উঠল যেন রানার: *খুন করুন ওকে।* শীতল দৃষ্টিতে পিটসেনের দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'তাঁকে জানাবেন, আমার মেসেজটা পাওয়ামাত্র যেন লোক পাঠান তিনি, ড. অ্যালফ্রেড পিটসেন নামের একটা পাগলা কুত্তাকে যেন তারা দেখামাত্র গুলি করে মারে।'

রাগে জ্বলে উঠল পিটসেনের মুখ। দস্তানা পরা বাঁ হাতটা চড় মারার জন্য উঠতে গিয়েও উঠল না। সামলে নিয়ে কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিল গার্ডদের।

কানে, ঘাড়ে, পিঠে সাবমেশিনগানের নল ঠেকিয়ে করিডোর ধরে নিয়ে গিয়ে টেলিস্কোপিক এলিভেটরে তোলা হলো রানাকে। তারপর ইলেকট্রিক কার্টে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো প্রধান দরজার কাছে। বোতাম টিপে দরজা খুলল ড্রাইভার।

ন'টাও বাজেনি, ইতিমধ্যেই আগুন হয়ে উঠেছে মরুভূমি রোদের তাপে। কড়া রোদ লাগায় চোখ ঝলসে দিচ্ছে বিমানের চকচকে সাদা দেহ।

বিমানে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখার আগে লম্বা দম নিল রানা। মেইন প্যাসেঞ্জার ডোর দিয়ে ভিতরে ঢোকানো হলো, গ্যাংওয়ে ধরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফার্স্ট-ক্লাস সেকশনের একটা জানালার পাশের সিটে বসানো হলো ওকে। গার্ডের অলক্ষে মুখে লুকিয়ে রাখা কাঁচের টুকরো দুটো ব্যাকরেস্ট ও সিটের ভাঁজে ঢুকিয়ে দিল ও। ওর পাশের সিটে বসল একজন গার্ড, সামনে ও পিছনে আর দুজন। স্টার্ট নিয়েছে ইঞ্জিন।

কমব্যাট ট্রাউজার আর সাদা টি-শার্ট পরা কুস্তিগীরের মত বিশালদেহী এক লোক এসে দাঁড়াল দু'সারি সিটের মাঝখানের আয়েলে। পাশ থেকে রানার দিকে ঝুঁকল। 'আমি হুমান। আধঘণ্টার মধ্যেই রওনা হচ্ছি আমরা। যেখানে আছো, বসে থাকো। নড়লেই গুলি খাবে।'

'কেমন স্টুয়ার্ড হে, তুমি?' রানা বলল। 'খালি হাতে এসেছ! এক কাপ চা তো অন্তত দিতে পারতে।'

'চুপ! কোন কথা নয়। সিট-বেল্ট বাঁধো।'

'কী করে? হাত বাঁধা দেখতে পাচ্ছ না?'

পাশে বসা গার্ড বেঁধে দিল ওর সিট-বেল্ট। গলিপথে নড়াচড়া দেখে পাশ ফিরে তাকাল রানা। আরেকজনকে দেখতে পেল। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ময়লা একটা ইউনিফর্ম পরা। দেখে ইংরেজ মনে হচ্ছে। ভীতকণ্ঠে পরিচয় দিল, 'আমি ড্যান স্মিথ। এই প্লেনের হতভাগা পাইলট। আমি আপনাকে বলতে এলাম, দয়া করে উল্টোপাল্টা কিছু করবেন না। ওদের কথা শুনলেই শুধু বাঁচতে পারব আমরা। ফ্লাইটের অর্ধেকের বেশি পথ আমি চালাব। বাকিটুকু আপনি। আমাকে ওরা কথা দিয়েছে, ওদের কথামত চললে, ছেড়ে দেবে। সব ভজকট করে দেবেন

না, মিস্টার রানা, প্লিজ। আগামী কাল আমার মেয়েটার জন্মদিন।'

'করব না,' রানা বলল।

'থ্যাংক ইউ, মিস্টার রানা।'

হাত চেপে ধরে লোকটাকে ককপিটের দিকে ফেরত নিয়ে গেল হুমান। রানা বুঝল, এই কথাগুলো বলানোর জন্যেই পাইলটকে ওর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল।

কয়েক মিনিট পর ট্যাক্সিইং করে চলতে শুরু করল প্লেন। জানালা দিয়ে আধ মাইল দূরের অতি সাধারণ কন্ট্রোল টাওয়ারের মাথায় সবুজ আলো জ্বলতে-নিভতে দেখল ও। রানওয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল বিমান। নাক ঘোরাল, পুরো একশো আশি ডিগ্রি।

ফিউযেলাজের কাছে বসানো রোলস-রয়েস ইঞ্জিনগুলো এখন কানফাটা গর্জন করছে। সামনে ছুটছে বিমান। গতি বাড়ছে দ্রুত। সিটের পিছনের গদিতে মৃদু ধাক্কা খেল রানার পিঠ। বুঝল, নাক উঁচু করেছে বিমান। অল্পক্ষণের মধ্যেই মরুভূমির তপ্ত আকাশে উড়াল দিল ওটা।

নশাহ্‌রের ইস্পাতের তৈরি হ্যাঙারে ভোর হওয়ার আগেই শেষ ক্যামোফ্লাজটাও সরিয়ে দেয়া হয়েছে একরানোপ্লেনের নাক থেকে। স্টার্ট নিয়েছে ইঞ্জিন। ক্রু আছে মোট চোদ্দোজন। ওদের মধ্যে রাশান আছে মাত্র একজন—রেডিও কনসোলে বসে মাইক্রোফোনে কথা বলছে লোকটা—বাকি তেরোজনের আটজন ইরানি, দুজন আফগানিস্তানের লোক, একজন সৌদি ও দুজন তুর্কি। যদিও সবার কাছেই রাশান পাসপোর্ট।

রাশান এই লোকটা এই প্রথম উঠেছে একরানোপ্লেনে, রেডিও অপারেটর হিসেবে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাকে। বাকি তেরোজন আগেও উঠেছে, মাদক পাচারের সময়। তবে এবার কোন মাদকের বাক্স নেই, তার জায়গায় যুক্ত হয়েছে চারটে বাড়তি ফিউল ট্যাংক, ছয়টা রকেট লঞ্চার, একটা সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল। দেখে অবাক হলেও কোনও কথা বলেনি কেউ, কোনরকম কৌতূহল পছন্দ করে না লি; শুধু দেখতে চায়, যা আদেশ করা হয়েছে সেটা পালন হচ্ছে।

হ্যাঙার থেকে বেরিয়ে এল একরানোপ্লেন। ভীষণ আলোড়ন তুলেছে ক্যাস্পিয়ানের শান্ত পানিতে। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ইঞ্জিনগুলো গর্জন করছে খ্যাপা দানবের মত। নাবিকদের সবার মাঝেই উত্তেজনা।

উত্তর দিকে যখন রওনা হলো একরানোপ্লেন, ইঞ্জিনের গর্জন আরও বাড়ল, চারপাশের উদ্বিগ্ন মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ফার্সিতে সান্ত্বনা দিল ক্যাপটেন, 'ভয়

নেই।’

সামনে ঝুঁকে একটা সুইচ টিপল পাইলট। হঠাৎ করেই পানি থেকে লাফিয়ে উঠল উভচর যানটা, পানির কয়েক ফুট উপরে বাতাসে ভেসে পানির সমান্তরালে উড়ে চলল।

নশাহ্‌র্‌ বন্দরের রাস্তায় পথিকেরা থমকে দাঁড়াল। কাজ ফেলে ডেকের কিনারে রেলিঙের ধারে হুড়োহুড়ি শুরু করল মাছধরা বোটের জেলেরা। হাঁ করে তাকিয়ে দেখল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

কোনও অঘটন ঘটতে না দেখে ধীরে ধীরে স্বস্তি ফিরে এল একরানোপ্লেনের যাত্রীদের মধ্যে। যে-যার কাজে গেল ওরা।

রেডিও কনসোলে একা হয়ে গেল রাশান লোকটা। মুখ নামিয়ে মাইক্রোফোনে একটা বিশেষ ওয়েভলেংথে সাঙ্কেতিক মেসেজ পাঠাতে শুরু করল ও।

তেহরানে নিজের অফিসে আরেকটা রেডিও কনসোলের সামনে বসা তখন আবু হাশিম। উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে রেডিওর দিকে। স্পিকার খড়খড় করে উঠতেই খাড়া হয়ে গেল পিঠ। সতর্ক দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল। পাশে দাঁড়ানো ওর তরুণ কর্মচারী হাবিব নির্দেশের অপেক্ষায়।

স্পিকারের ঝড় কমে গেল অনেকটা। ভেসে এল একটা কণ্ঠ। সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলছে। বলপেন দিয়ে দ্রুত একটা প্যাডে সেটা নোট করে নিল হাশিম। সবশেষে লিখল: ল্যাটিটিউড ৪৬.০৪৯১৭। লনজিটিউড ৪৮.৮০৪৭২২২। হাসি ফুটল মুখে।

‘মেসেজ অ্যাকনলেজ্‌ড্‌!’ বলল আবু হাশিম। ‘এবার ওটা থেকে বেরিয়ে গা ঢাকা দাও।’

কথা শেষ করেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। ফড়াৎ করে প্যাড থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে এসে কম্পিউটারের সামনে বসল। হাবিবের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘দেখলে, টাকার জাদু? একরানোপ্লেনের পজিশন এখন হাতের মুঠোয়।’

কোনও ভাবান্তর নেই হাবিবের মুখে। শুধু বলল, ‘ইয়েস, বস।’

‘নাহ্‌, তুমি একেবারেই বেরসিক। কবিতা বোঝো না, উত্তেজনা বোঝো না... যাও, এক কাপ কড়া কফি নিয়ে এসো।’

‘ইয়েস, বস,’ বলে নির্বিকার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল হাবিব।

সেদিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল হাশিম। আবার ফিরল কম্পিউটারের দিকে। দ্রুত কি-বোর্ডের বোতাম টিপে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল রিজেণ্টস্‌ পার্কের ধারে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হেড অফিসে।

সতেরো

তিরিশ হাজার ফুট ওপরে উঠে নাক সোজা করল ভিসি-১৫। তেহরানের পুব দিক থেকে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে, ক্যাস্পিয়ান পেরিয়ে চলে যাবে ভলগোগ্র্যাডের দিকে। জানালা দিয়ে এলবুর্জ পর্বতের চূড়ার দিকে তাকিয়ে ভাবছে রানা, এই পরিস্থিতিতে না হয়ে ভাল কোনও সময়ে হলে ওড়ার জন্য অতি চমৎকার একটা দিন। ডান হাতের দুই আঙুলে ভাঙা কাঁচটা টিপে ধরে বাঁ কব্জির উপর দড়িতে অনবরত ঘষে চলেছে। ভাগ্যিস, ফার্স্ট-ক্লাসে বসিয়েছে, দুটো সিটের মাঝে বেশ দূরত্ব। ইকনোমির সাধারণ সিট হলে ওর সামান্যতম নড়াচড়াও টের পেয়ে যেত বাঁ পাশে আয়েলের কিনারে বসা গার্ড।

সিটে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল রানা, যেন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে, মেনে নিয়েছে ভবিতব্যকে। আসলে মনে মনে হিসেব কষছে ও। আকাশে যে উড়েছে, এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। পরের ষাট মিনিটের মধ্যে যদি নোভা বেরিয়ে না আসে, তা হলে হয়তো চারজন সশস্ত্র গার্ডের বিরুদ্ধে একা লড়েই কাবু করার চেষ্টা করতে হবে ওদের। ড্যান স্মিথের সহযোগিতা পেলে ভাল হতো। কিন্তু হবে না। ওরকম একটা ভীতু লোকের দ্বারা কোনও উপকার হবে না।

ভাবছে, কিন্তু থেমে নেই রানার হাত। কাঁচের টুকরো দিয়ে দড়ির গায়ে ঘষেই চলেছে। ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে দড়ি, তবে সময় লাগছে অনেক।

রানা জানে না, কখন ওকে পাইলটের আসনে নিয়ে গিয়ে বসানো হবে। তার আগেই যদি দড়িটা কাটতে না পারে, তা হলে সব পরিশ্রম বৃথা যাবে।

আড়চোখে পাশে বসা গার্ডের দিকে তাকাল ও। শূন্য দৃষ্টিতে সোজা সামনে তাকিয়ে আছে লোকটা। কোনও ভাবান্তর নেই চেহারায়। দড়িতে ঘষাঘষি বাড়িয়ে দিল রানা। কেটে গেল ওটা এক সময়। হাঁপ ছাড়ল ও। এখনও পাইলটের আসনে গিয়ে বসার ডাক পড়েনি ওর।

ওড়ার পর প্রায় তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। রোদে জ্বলতে থাকা ইউরাল পর্বতমালা চোখে পড়ছে এখন।

পাশে বসা গার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'পাইলটের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

মাথা নাড়ল লোকটা।

'তা হলে হুমানকে ডেকে আনো।'

আবার মাথা নাড়ল লোকটা।

'প্লেনটা কী করে চালায়, আমার বোঝা দরকার,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'হুমানকে ডাকবে, না কি?'

সামনের সিটে বসা গার্ডকে ডেকে ফার্সিতে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কিছু বলল গার্ড। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল লোকটা, মাথায় আলগা করে রাখা আমেরিকান ক্যাপটা টেনে বসাল। চলে গেল আয়েল ধরে। মিনিটখানেক পরেই ফিরে এল, তবে হুমানকে নিয়ে নয়, ড্যান স্মিথকে নিয়ে।

'আপনাকে কন্ট্রোলে গিয়ে বসতে বলেছে ওরা,' পাইলট বলল। 'প্লিজ, কোন গোলমাল করবেন না।'

'এখন প্লেন চালাচ্ছে কে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'অটোপাইলটে আছে। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর নীচে নামাতে শুরু করব।'

'কেন, জানতে পারি?'

'না। তবে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রাখলে যা বলবে তা-ই তো করতে বাধ্য আমি, তাই না?'

'মনে হয় এখন জানার সময় হয়েছে আপনার,' রানা বলল। 'এই প্লেনের কার্গো হোল্ডে গোটাকয়েক প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী বোমা রাখা আছে। রাশার সবচেয়ে বড় পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ওপর ওই বোমাগুলো ফেলতে যাচ্ছি আমরা।'

'ডিয়ার গড!' রানার সামনের সিটটায় বসে পড়ল ড্যান।

'এখনও কি গোলমাল করতে নিষেধ করবেন আমাকে, স্মিথ?' রানা জিজ্ঞেস করল।

রানার নাকেমুখে জোরে চড় মারল ওর পাশে দাঁড়ানো গার্ড।

'অ্যাই, কী হচ্ছে?' নির্জন ফ্লাইট ডেকের দিক থেকে গলিপথ ধরে এগিয়ে এল হুমান।

ওয়েইস্টব্যাণ্ড থেকে টেনে বের করল একটা কোল্ট .৪৫ রিভলভার। ওটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ভাবছে, অস্ত্রটা এই উচ্চতায় ভীষণ বিপজ্জনক।

'ওঠো,' রানার দিকে রিভলভার তাক করল হুমান।

'আমি নড়তে পারছি না,' রানা বলল।

'ওঠো বলছি!' চেঁচিয়ে উঠল হুমান। গার্ডের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এসে রানার গলা টিপে ধরল। অপরাধীদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করত এই পালোয়ান, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ওর সিট-বেল্ট খুলে দিল গার্ড। পিছনেই হাত রেখে দিয়েছে রানা, কাটা দড়িটা দেখতে দিচ্ছে না।

কিন্তু বেশিক্ষণ ওভাবে রাখতে পারবে না, জানে। তাই গার্ড সিট-বেল্ট

খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে গার্ডের ঘাড় চেপে ধরে ডান হাতের কাঁচের টুকরো দিয়ে জোরে পোঁচ মারল লোকটার গলার শিরায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ওকে সামনের সিটের পিছনে ফেলে দিল রানা। একইসঙ্গে ওর কোমরের হোলস্টার থেকে টান দিয়ে বের করে নিল পিস্তল। পরক্ষণে পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল হুমানের নাক-মুখে। পিছিয়ে গেল হুমান। উল্টে পড়ল একটা খালি সিটের ওপর। ক্ষণিকের জন্য বিমূঢ়, স্তব্ধ হয়ে গেছে। গলিপথের মেঝেতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল রানা।

ঠিক এই সময় আরেকটা পিস্তলের শব্দ কানে এল ওর। গড়িয়ে সোজা হতেই দেখল, দ্বিতীয় গার্ডের অর্ধেকটা মুখ উড়ে গেছে। চোখের কোটরের ভিতর দিয়ে গুলি ঢুকেছে মগজে। আমেরিকান ক্যাপটা উড়ে গিয়ে পড়েছে দূরে।

মেঝেতে পড়ে থেকে গলিপথের পিছন দিকে তাকাল রানা। ইকোনোমি সেকশনের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল নোভাকে। হাতে উদ্যত পিস্তল। মাথায় ক্যাপ। পরনে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ হোস্টেসের একটা আনকোরা নতুন ইউনিফর্ম।

রানার পিছনে বসা গার্ড সিটের আড়াল থেকে গলিপথে মাথা বের করে গুলি করতে গেল নোভাকে। রানার জন্য চমৎকার নিশানা। ট্রিগার টিপতে এক মুহূর্ত দেরি করল না ও। সিটের ওপর নেতিয়ে পড়ল গার্ডের প্রাণহীন দেহ।

সামলে নেয়ার প্রচুর সময় পেয়েছে হুমান। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ওকে লক্ষ্য করে গুলি করল নোভা। লাগাতে পারল না। কারণ একই সময়ে হুমানের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা। গোড়ালি চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ফেলে দিল মেঝেতে। ওর বুকের উপর চেপে বসে গলা টিপে ধরতে গেল। কিন্তু হুমানের গায়ে দৈত্যের শক্তি। ঝাড়া দিয়ে রানাকে সরিয়ে দিল। পরক্ষণে গর্জে উঠল ওর কোল্ট রিভলভারটা।

বুলেট কারও কোন ক্ষতি না করে রানার গুলিতে মৃত গার্ডের দেহের ওপর দিয়ে গিয়ে, পার্সপেক্সের জানালা ফুটো করে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বাতাসের ভয়ানক টান ছোট্ট ফুটো দিয়েই টেনে নিল মৃত গার্ডকে, ফুটোর গায়ে ছিপির মত আটকে গেল লাশটা। আপাতত রক্ষা।

চেঁচিয়ে উঠল ড্যান, 'আরে করছেন কী! গোলাগুলি থামান আপনারা। অটোপাইলটের কী যেন হয়েছে!'

বিমানটা এতক্ষণ মসৃণ গতিতে চলছিল, হঠাৎ দুলে উঠে খসে পড়ল একশো ফুট নীচে, তারপর যেন কঠিন মেঝেতে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল পতন, থরথর করে কেঁপে উঠল কাঠামো থেকে শুরু করে দেহের প্রতিটি ইঞ্চি। মুহূর্ত পরেই গর্জন করে ডাইভ দিয়ে নীচে নামতে শুরু করল।

মেঝেতে পড়ে গেল রানা, হুমান আর নোভা।

'ফ্লাইট ডেকে চলে যান, স্মিথ,' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'এই নীচে পড়া থামান।'

শিরা কেটে দেয়া গার্ডের রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে রানার মুখ। ওর আশপাশে ফার্স্ট-ক্লাসের কয়েকটা সিটে রক্ত আর মগজ ছিটিয়ে পড়েছে, অন্য দুটো গার্ডের। স্মিথের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে চলেছে রানা, কিন্তু আতঙ্ক অনড় করে দিয়েছে পাইলটকে, একটা সিটের কিনার খামচে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ওর কানে পিস্তলের নল চেপে ধরল রানা। 'এখুনি যদি ফ্লাইট ডেকে না যান, গুলি করে আপনার খুলি উড়িয়ে দেব। যান! যান!'

অবশেষে নড়ে উঠল ড্যান। টলতে টলতে এগোতে গিয়ে ঢালু হয়ে থাকা গলিপথে বার বার পা পিছলাল। চোখ থেকে দরদর করে পানি গড়াচ্ছে।

'জলদি যান!' গর্জে উঠল রানা।

সিটে পা ঠেকিয়ে গুলি করার মত সময় পেল হুমান। কিন্তু প্লেনের দুলুনি আর প্রবল ঢেউয়ে ভাসমান নৌকার মত ক্রমাগত উঁচু-নিচু হওয়ার কারণে লক্ষ্য স্থির রাখতে পারল না, ছাতের দিকে চলে গেল বুলেট।

প্লেনের পিছন দিকে, গলিপথের পাশের একটা সিটের পা আঁকড়ে ধরে নিজেকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে নোভা। হুমানকে ভালমত দেখতে পাচ্ছে না, তাই গুলিও করতে পারছে না।

ফ্লাইট ডেকের দিকে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে ড্যানি, বাকি তিনজন তখন সিটের পা আঁকড়ে ধরে নিজেদের আটকে রেখেছে। পাঁচ সারি সিটের পিছনে হুমানের পা চোখে পড়ছে রানার। গুলি করতে ভয় পাচ্ছে—আবার কোথাও জানালা ফুটো হয়ে গিয়ে ডিকম্প্রেশন হতে পারে—যদিও ওর পিস্তলটার শক্তি কোল্টের চেয়ে কম।

ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠল বিমান আরেকবার। সামনের দিকে নাক আরও নিচু করে ফেলেছে। বাল্কহেডে বাড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল হুমান। নোভার চিৎকার শুনে ফিরে তাকিয়ে রানা দেখল গলিপথ ধরে গড়াতে শুরু করেছে ও। হুমানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওকে ধরে ফেলল পালোয়ান। রানা দেখছে, নোভার গলা এক হাতে পেঁচিয়ে ধরে ওকে নিজের সিটের সারির ভিতরে টেনে নিতে চাইছে লোকটা। নোভার হাত থেকে পিস্তলটা ছুটে কোনদিকে চলে গেছে।

নাক ওপরে-নীচে করতে থাকা দুলন্ত বিমানের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়েছে হুমান। নোভাকে সামনে ধরে নিজেকে আড়াল করেছে, যাতে গুলি করতে না পারে রানা। দানবীয় শক্তি লোকটার গায়ে, আরেকবার ভাবল ও। দেখে মনে হচ্ছে যেন চুল ধরে নিজের মেয়েমানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে

মহাপরাক্রমশালী কোনও গুহামানব। এক হাতে নোভাকে ধরে, আরেক হাতে সিট ধরে ধরে ওকে নিয়ে প্লেনের সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে ও। রানার পাশ কাটানোর সময় চোখাচোখি হলো দুজনের, নোভার কানের ওপর রিভলভার চেপে ধরে রেখেছে হুমান। ইশারায় রানাকে ফ্লাইট ডেকে যেতে বলল। না গিয়ে উপায় নেই। থামল না হুমান, রক্তের ওপর পা পড়তেই প্রায় পিছলে চলে গেল ফ্লাইট ডেকের কাছে। ঢুকে পড়ল ভিতরে।

সোজা হয়ে গেল বিমানের নাক। দ্রুত চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা, কতখানি ক্ষতি হয়েছে। জানালার ফুটো দিয়ে চুইয়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার কারণে এখনও ডিকম্প্রেশন হচ্ছে প্লেনের ভিতর। এই অবস্থায় হাঁটাও কঠিন। বাতাসের প্রবল, ভয়ানক আকর্ষণ ইতিমধ্যেই কয়েকটা সিটের পা উপড়ে ফেলেছে। যদি এখন জানালা ভেঙে গার্ডের দেহটা উড়ে চলে যায়, আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ভিতরের অবস্থা। দ্রুত, নাটকীয় পরিবর্তন ঘটতে থাকবে।

ফ্লাইট ডেকের কাছে গলিপথের মুখে পড়ে আছে ড্যান, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বোধহয়। ওকে ডিঙিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা।

কন্ট্রোলে বসেছে নোভা। ওর মাথায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে রেখেছে হুমান।

রানাকে দেখে শান্তকণ্ঠে বলল ও, 'পিস্তলটা ফেলো, নইলে ওকে গুলি করব।'

'আবার গুলি করার সাহস হবে না তোমার, হুমান,' রানা বলল। 'বিশেষ করে তোমার ওই কামানটা দিয়ে।'

পিস্তল নিচু করল হুমান, নোভার গলা টিপে ধরল অন্য হাতে। 'বাজারের দোকানদার যারা চাঁদা দিতে চাইত না, তাদের এভাবে টাকা দিতে বাধ্য করতাম। গুলি করার প্রয়োজন পড়ত না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' রানা বলল।

'বসো।' কো-পাইলটের সিটটা দেখাল হুমান। 'পিস্তলটা দাও।'

নোভার ভীত চোখে অনুনয় দেখল রানা। নীরবে যেন বলতে চাইছে, লোকটা যা করতে বলছে করো।

সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে রাখা একটা চার্ট দেখল হুমান। তারপর সতর্কভাবে তাকাল নোভার সামনে অসংখ্য ডায়ালের *জঙ্গলের* দিকে। 'ছয় মিনিট বাকি। প্লেন নামাও।' তারপর নোভাকে বোঝাল, কন্ট্রোল আর্মকে সামনে ঠেলে দিয়ে কীভাবে প্লেনকে নীচে নামাতে হয়।

ওর পাশে, ডান হাতের নীচে, একটা সুইচ লাগিয়ে দিয়েছে পিটসেনের ইঞ্জিনিয়াররা। বোমার র‍্যাকের সঙ্গে কানেকশন করে দেয়া হয়েছে সুইচটার। অধৈর্য ভঙ্গিতে বার বার ওটায় আঙুল রাখছে হুমান।

ঠিক একই সময়ে, আজারবাইজানের কাছে খোলা সাগরে আগে থেকেই ঠিক করে রাখা একটা ট্যাংক থেকে তেল নিচ্ছে একরানোপ্লেন।

ওটার পাঁচ হাজার ফুট ওপরে চক্কর দিচ্ছে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের তিনটে জেট ফাইটার প্লেন। একটাতে লোড করা হয়েছে ব্লু স্টিল মিসাইল—রকেট-পাওয়ারড ১.১ মেগাটন বোমা। অন্য দুটো প্লেন বহন করছে একুশটা করে এক হাজার পাউণ্ডের কনভেশনাল বোমা।

এই দুটো প্লেন যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে পারমাণবিক বোমা বহনকারী প্লেনটাকে আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম দুটোকে বিশ মাইল দূর থেকে অনুসরণ করছে ওটা। একরানোপ্লেনটাকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ফাইটারগুলো। ভয়ানক কানফাটা শব্দের পিছনে রেখে যাচ্ছে ধোঁয়ার লম্বা লেজ।

হঠাৎ নাক নিচু করে ডাইভ দিল। হাজারখানেক ফুট নেমে এসে একরানোপ্লেনের দুই পাশে সারি দিয়ে দশটা করে বোমা ফেলল। স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে দুই পাশে লাফিয়ে উঠল সাগরের পানি। তার নীচে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চাপা পড়ল ট্যাংকারটা। উভচর যানটাও ঢেকে গেল পানিতে। কেঁপে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। তবে কোন ক্ষতি হলো না ওটার।

রেডিওতে বেজ ক্যাম্পের সঙ্গে কথা বলল তিনটে ফাইটারের পাইলট। আবার আক্রমণ করতে ফিরে এল। তবে এবার একরানোপ্লেনের গানারও তৈরি। মিসাইল ছুঁড়ল প্লেন লক্ষ্য করে। প্রথম প্লেনের পাইলট ক্ষিপ্র বাঁক নিয়ে কোনাকুনি উড়ে উপরে উঠে গেল। দ্বিতীয়টার পাইলট সরতে সামান্য দেরি করে ফেলল। আঘাতটা সরাসরি না লাগলেও মিসাইল আক্রমণ থেকে পুরোপুরি বাঁচতে পারল না প্লেনটা, একপাশের ডানা ছিঁড়ে গেল। নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে যতটা সম্ভব ওপরে উঠে গেল পাইলট। তারপর সে আর কো-পাইলট একই সঙ্গে ইজেক্ট বাটন টিপে বেরিয়ে গেল উপর দিকে। প্যারাশুট খুলে গেল। দুলতে দুলতে নীচে নামার সময় দেখতে পেল, ঘুড়ির মত গোঁত্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সাগরে পড়ছে প্লেনটা।

পারমাণবিক বোমা বহনকারী প্লেনের পাইলট বুঝল, ওকেই এবার আক্রমণে যেতে হবে। তীব্র গতিতে নীচে নেমে এল ও, উভচর যানের মিসাইল আক্রমণের নাগালের বাইরে—এত নীচে টার্গেট করতে পারবে না একরানোপ্লেনের গানার। নীচে নেমে এক মুহূর্ত দেরি করল না প্লেনের পাইলট, কোন সুযোগ দিল না উভচর যানটাকে, প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকা ফিউয়েল ট্যাংকার আর একরানোপ্লেনের ঠিক মাঝখানে বোমাটা ফেলে উড়ে চলে গেল। এমনভাবে সেট করা রয়েছে বোমার ডেটোনেটার, প্লেনটা উড়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার পর

ফাটবে। আর ঘটলও তাই।

বহু ওপর থেকে নীচে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখল পাইলট, পানি থেকে খাড়া শূন্যে উঠে পড়েছে একরানোপ্লেন, তারপর লক্ষ টুকরো হয়ে পানিতে পড়ল আবার। নিশ্চয় সাগরতল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ।

আঠারো

'এক মিনিট বাকি,' ঘোষণা করল হুমান।

ওদের নীচে বিশাল ভলগা নদী। বাঁয়ে এগোলে পড়বে ভলগোগ্র্যাড, ডানে বিছিয়ে রয়েছে ইউরাল পর্বতমালা। উজ্জ্বল রোদে ঝিকমিক করছে বরফে ঢাকা চূড়াগুলো। চমৎকার আলো। এই আলোতে বিমান ওড়ানো একেবারেই সহজ।

হুমানের নির্দেশে, কণ্ট্রোল আর্মটা সামনে ঠেলে দিল নোভা। নাক নিচু করে জাখারভ-১৭'র দিকে উড়ে চলল বিমান।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ফ্লাইট ডেকের দরজা। দুই হাতে চেপে ধরা একটা লুগার পিস্তল দেখা গেল হুমানের মাথা বরাবর তাক করা। নোভার মাথা থেকে রিভলভার সরিয়ে ড্যানের দিকে ঘোরাতে গেল হুমান। ব্যস, রানার জন্য এটুকু সুযোগই যথেষ্ট। হুমানকে লক্ষ্য করে লাফ দিল। চেপে ধরল ওর পিস্তল ধরা হাতটা।

কেবিনের ছোট্ট বদ্ধ পরিসরে গুলির আওয়াজটা কামানের গর্জনের মত মনে হলো। টলে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ড্যান। লুগারটা খসে পড়ল হাত থেকে। মৃত্যু আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো যেন রানা আর হুমান, ওদের মাঝখানে জট পাকিয়ে গেল নোভা।

তিনটে শরীরের চাপ পড়ল গিয়ে কণ্ট্রোল আর্মে, নাক নিচু করে ডাইভ দিল প্লেন। তার ওপর, থ্রটল লিভারে রানার হাঁটুর চাপ লেগে কানফাটা গর্জন করে উঠল রোলস-রয়েস ইঞ্জিনগুলো। গতি বেড়ে গেল বিমানের।

ঘাড়ে হুমানের আঙুলের কঠিন চাপ অনুভব করল রানা, ওর শিরা খুঁজে বেড়াচ্ছে আঙুলগুলো। পিটসেনের কারখানার অসহায় শ্রমিক আর মেয়েগুলোর কথা ভাবল ও। প্রচণ্ড রাগে কপাল ঠুকল হুমানের নাকে। ককপিটের পিছনে দানবের দেহটা চিত হয়ে যেতেই হাঁটু দিয়ে গুঁতো লাগাল ওর দুই উরুর মাঝখানে।

সিট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল নোভা। কো-পাইলটের সিটের নীচে চলে

যাওয়া লুগার পিস্তলটা তুলে নিয়ে রানার হাতে দিল। ধাঁ করে হুমানের চাঁদিতে পিস্তলের বাট দিয়ে বাড়ি মারল রানা। ওর পা লক্ষ্য করে লাথি মারল হুমান। কিন্তু সরিয়ে নিল রানা। উঁচু হয়ে আছে পা'টা। দুই হাতে গোড়ালিসহ ওর পা-টা চেপে ধরে, এক পা হুমানের ওর দুই উরুর ফাঁকে রেখে, আচমকা ভয়ঙ্কর এক মোচড় দিল। হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দ আর একইসঙ্গে হুমানের কান ফাটানো আর্তচিৎকার শোনা গেল।

'কন্ট্রোলে যাও!' নোভাকে সামনে ঠেলে দিল রানা।

প্লেনের নাক উঁচু সোজা করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল নোভা।

খোঁড়া হয়ে মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে হুমান। কোল্ট রিভলভারটার জন্য হাতড়াচ্ছে। আবারও নগ্ন মেয়েগুলোকে কাঁচের ওঅকওয়ে ধরে হাঁটানোর দৃশ্যটা কল্পনায় দেখল রানা। রাগ দমন করতে না পেরে হুমানের চুল ধরে, মুখটা নীচের দিকে করে মেঝেতে ঠুকতে লাগল। একসময় অনড় হয়ে এল দৈত্যটার দেহ, বন্ধ হলো ছটফটানি।

প্লেন নিয়ন্ত্রণে নোভাকে সাহায্য করল রানা। থ্রটল লিভার ধরে টেনে পিছিয়ে আনল, কমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। যে লোকটা আরও সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, ড্যান স্মিথ, সে মরে পড়ে আছে ওদের পায়ের কাছে।

'নাহ্, পারছি না, রানা!' ককিয়ে উঠল নোভা। 'অনেক বেশি ভারি লাগছে। সাড়া দিচ্ছে না।'

'জাহান্নামে যাক কন্ট্রোল,' রানা বলল। গালে লেগে যাওয়া রক্ত মুছল। 'ডিকম্প্রেশন বেড়ে গেছে। জানালা ভেঙে বোধহয় বেরিয়ে গেছে গার্ডের লাশটা। চলো, ভাগি। প্যারাশুট কোথায়?'

টান দিয়ে ক্রু লকারের দরজা খুলে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

'পরে নাও!' প্যারাশুটটা নোভার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

'তুমি কী করবে?'

'আহ্, পরো!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

আর তর্ক করল না নোভা। রানা যা করতে বলছে, করল। দ্রুত প্যারাশুটের স্ট্র্যাপগুলো আটকে নিল শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। পিঠে বেঁধে নিল বাণ্ডিল করা জিনিসটা।

ঢালু আয়েল বেয়ে উঠে প্যাসেঞ্জার ডোরের কাছে চলে এল রানা, পিছনে ওকে আঁকড়ে ধরে রেখে উঠল নোভা।

কাঁপা হাতে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করল দরজাটা খোলার জন্য।

'এখনও অনেক ওপরে রয়েছি আমরা,' রানা বলল। 'অনেক বেশি প্রেশার।'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে নোভা। চোখে মরিয়া দৃষ্টি।

'পানিতে ঝাঁপ দিতে হবে আমাদের,' রানা বলল। 'এখানেই থাকো।'

ফ্লাইট ডেকে ফিরে গিয়ে থ্রটল সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনল ও। ইঞ্জিনের গতি এখন ধরতে গেলে শূন্যের কোঠায়। মেঝে থেকে লুগারটা তুলে নিয়ে, সেফটি ক্যাচ অন করে কোমরে গুঁজল। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ড্যানের জুতোজোড়া খুলে শার্টের ভিতরে ঢুকিয়ে বোতাম লাগিয়ে দিল। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় প্লেনের নাক ঘোরাল পশ্চিমের পানির দিকে। পুরোটা না হলেও অনেকখানি সোজা হয়েছে এখন ওটার নাক, আয়েলের ঢাল কমে গেছে, আগের চেয়ে কম পরিশ্রমে এখন নোভার কাছে উঠে এল ও। দরজার হাতল ধরে প্রায় ঝুলে রয়েছে নোভা।

'আবার চেষ্টা করি,' চেঁচিয়ে বলল রানা।

দরজা খোলার জন্য রীতিমত যুদ্ধ শুরু করল দুজনে। অবশেষে খুলে গেল দরজার রিলিজ ক্যাচ।

রানা বলল, 'আমি তোমার কোমর জড়িয়ে ধরছি। ভার রাখতে পারবে তো?'

'পারব।'

'তুমি কিছু করবে না। শুধু ঝুলে থাকবে। প্যারাশুটের কর্ড আমি খুলব।' কথাটা বলেই পা দিয়ে ঠেলা দিল দরজার পাল্লায়।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বাতাসের স্রোত যেন টেনে নিল ওদের। নীচে ঝুলে পড়ল নোভা, ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ঝুলছে রানা। প্লেনটা পার হয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

বাতাসে ভেসে পাথরের মত নীচে পড়ছে দুজন। নোভার মনে হচ্ছে, রানার হাতের চাপে ওর কোমরের হাড় ভেঙে যাবে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে কোনও মতে। রানার কব্জিতে ওর দুই হাতের আঙুলের নখগুলো বসিয়ে দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখল, যাতে ছুটে না যায় রানার দেহটা।

হাত সরিয়ে আনার ভয়ে যতক্ষণ পারল নোভার কোমর জড়িয়ে ধরে ঝুলে রইল রানা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্ড খোলার জন্য এক হাত বাড়াতেই হলো ওকে, বাঁ হাত কোমরে রেখে, ডান হাতটা সাবধানে বাড়িয়ে টেনে দিল কর্ড। হঠাৎ শব্দ করে খুলে গেল প্যারাশুট, ছাতার মত ছড়াল মাথার উপর, এমন এক ঝাঁকি লাগল, আরেকটু হলেই রানার হাত ছুটে যাচ্ছিল নোভার কোমর থেকে। রানার হাত পিছলে সরে যাচ্ছে দেখে চিৎকার করে উঠল নোভা, আরও জোরে চেপে ধরল ওর কব্জি। তাতেও হয়তো শেষ রক্ষা হতো না, কিন্তু প্যারাশুটের ফিতেয় কনুই আটকে যাওয়াতে বাঁচল।

প্রায় দুই হাজার ফুট নীচে পানি। এ-ধরনের প্যারাশুট সর্বোচ্চ দুশো পাউণ্ড ওজন বহন করতে পারে। সে জায়গায়, হিসেব করল রানা, নোভা যতই ছিপছিপে

দেহের হোক না কেন, ওদের দুজনের ওজন হয়ে যাবে কম করে হলেও তিনশো পাউণ্ডের কাছাকাছি। যাই হোক, নীচে পানি আছে, পতনের ধাক্কাটা হয়তো সামলানো যাবে। বাতাসে দুলে দুলে নীচে নামছে ওরা। হঠাৎ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল, ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে যেন, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দুজনে।

ভিসি-১৫ বিমানটা সোজা না গিয়ে যে কোন কারণেই হোক ডানে ঘুরে গিয়ে গুঁতো মেরেছে পর্বতে।

'একটা চূড়ো হারাল ইউরাল পর্বতমালা,' কানের কাছে শোঁ-শোঁ বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে বলল রানা।

নীচে তাকাল ও। পানি এখন আর মাত্র পাঁচশো ফুট নীচে।

'পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিলিজ খুলে দেবে. বুঝেছ? প্যারাশুটের কাপড়ে আটকে গেলে কিন্তু দম বন্ধ হয়ে মরবে।'

'বুঝেছি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল নোভা।

দূর থেকে লেক মনে হলেও এখন বোঝা যাচ্ছে চওড়া একটা নদী, ভলগা নদী। তাতে কিছু এসে যায় না, রানা ভাবল, গভীর হলেই হলো।

পঞ্চাশ ফুট ওপরে থাকতে ফিতে থেকে কনুই ছাড়িয়ে নিল ও। নোভার কানের কাছে চুমু খেল। বিশ ফুট ওপরে থাকতে ওর কোমর ছেড়ে দিল।

খাড়া পানিতে পড়ল রানা। দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে ভলগার ঠাণ্ডা পানিতে। কয়েকটা মুহূর্ত জলজ আগাছা উঠে যেতে দেখল চারপাশ দিয়ে। তারপর মাটি ঠেকল পায়ে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি যেন থরথর করে মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে গেল ঘাড়ের কাছে। হাঁটু ভাঁজ করে আর হাত ঝাপটে আঘাতটা সামলে নিল। তারপর পা দিয়ে ধাক্কা মেরে উঠতে শুরু করল আবার। জলজ উদ্ভিদ আর মাছ দেখতে পাচ্ছে পানিতে। ভুস করে ভেসে উঠল মাথাটা, পানির উপর উজ্জ্বল রোদে।

ভাসমান পেটফোলা প্যারাশুটের কাপড়টাকে শামিয়ানার মত লাগছে। ভেজা চুলওয়ালা একটা মাথা সাঁতরে আসছে ওর দিকে।

কাছে এসে রানার গলা জড়িয়ে ধরে ওকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল নোভা। 'সত্যি, রানা,' বাচ্চা মেয়ের মত খলবল করে হেসে উঠতে গিয়ে পানি ঢুকে গেল মুখে, কাশতে শুরু করল। 'সত্যিই, তোমার তুলনা হয় না।'

'প্যারাশুটে করে লিফট দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' তরলকণ্ঠে বলল রানা।

নদীর পাড়ে পাশাপাশি কিছুক্ষণ বসে রইল ওরা। বিশ্রাম নিল। কোথায় কোথায় ব্যথা পেয়েছে দেখল।

'বেচারা ড্যান,' নোভা বলল।

'প্রথমে যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক বেশি সাহসী লোক,' রানা বলল।

'যাকগে। এখন বলো তো, তুমি সেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কী করলে?'

'দরজার কোড ঠিকঠাকই মুখস্থ করেছিলে। বোতাম টিপতেই দেখি নিঃশব্দে খুলে গেল। অনেক গার্ডের পায়ের শব্দ শুনেছি, তবে সবাই ছুটছিল পিটসেনের অফিসের দিকে।'

'আর দরজার বাইরে?'

'তেমন পাহারা ছিল না। মরুভূমিতে স্রেফ একটা আবর্জনার স্তূপের মত লাগছিল পিটসেনের আস্তানাটা। দিনের বেলা প্লেনে করে যেতে ওপর থেকে দেখেও সাধারণ একটা টিবি ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। এই কারণেই কারও নজরে পড়েনি এতদিন। আমি বেরিয়ে একটা আলোও দেখলাম না, পুরোপুরি অন্ধকার। তবে প্লেনটা কোথায় আছে জানতাম। গার্ডরা তোমার দিকে নজর রাখবে, সেই সুযোগে আমাকে লুকিয়ে পড়তে হবে বুঝতে পারছিলাম। প্লেনটার কাছে পৌঁছলাম। কার্গো সেকশনের দরজাটা খোলাই ছিল, মেকানিকদের কাজ শেষ হয়নি তখনও। তবে কোন পাহারা ছিল না ওখানে, রাখার প্রয়োজনই মনে করেনি হয়তো। একটা ট্রাকে বসানো সিঁড়ি লাগানো ছিল। সেটা বেয়ে উঠে ঢুকে পড়লাম প্লেনে। ভিতরেও কোনও লোকজন ছিল না। এই ইউনিফর্মটা ক্রু লকারে পেয়েছি। এটা পরে নিয়ে ফার্স্ট-ক্লাস আর ইকোনোমি ক্লাসের মাঝখানের ল্যাভেটরিতে ঢুকে বসে থেকেছি তোমার আসার অপেক্ষায়। সারাক্ষণ ভয় পাচ্ছিলাম কে কখন এসে দেখে ফেলে। ভয়ঙ্কর একটা রাত কেটেছে।'

'প্লেনে তোমাকে খুঁজতে আসেনি কেউ?'

'হোল্ডের মধ্যে শব্দ শুনেছি। তবে বোমাগুলো ঠিকঠাক আছে দেখেই বোধহয় ওরা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে, প্লেনে আমাকে খোঁজার কথা ভাবেইনি। তোমার ধারণাই ঠিক, রানা, আমি এখানে আসতে পারি, কল্পনাই করেনি ওরা।'

'যাক, ঠিকঠাক মতই সব করেছ,' রানা বলল। 'একজন ব্যাংকারের সাহস দেখে অবাকই হচ্ছি!'

প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্যই যেন তাড়াতাড়ি বলল নোভা, 'এখন কী করব আমরা?'

'নিনাকে উদ্ধারের চেষ্টা করব। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা টেলিফোন খুঁজে বের করতে হবে। তুমি গড়গড় করে রাশান বলতে পারো, কোনরকম টান নেই, এখানে বেশির ভাগ কথাবার্তা তাই তুমিই বলবে। তারপর আমি লণ্ডনে বিএসএস-এর অফিসে কথা বলব। আমরা যা যা জানি, সব জানাতে হবে চিফ মিস্টার লংফেলোকে।'

'হুঁ! তারপর?'

'লণ্ডনে যাব।'

'কীভাবে?'

'যতদূর বুঝতে পারছি, মস্কোর পুবদিকে রয়েছি আমরা। মস্কো থেকে সাত-আটশো মাইল দূরে। একটা গাড়ি পেলে ভাল হতো। লিফট নিতে চাইলে, আমাদের যা কাপড়চোপড়, সবাই সন্দেহ করবে।'

'করবে না, একটা গল্প বানিয়ে বলে দেব,' হেসে বলল নোভা। 'মেয়েমানুষের ক্ষমতা অনেক।'

'কোনমতে মস্কো পর্যন্ত যেতে পারলেই হয়, টাকা পেয়ে যাব আমি।'

'কিন্তু তাড়াতাড়ি খাবার না পেলে ততক্ষণ টিকব কি না সন্দেহ আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন খাবার চাই।'

'এক জোড়া জুতোও দরকার তোমার, নইলে হাঁটতে কষ্ট হবে।' শার্টের ভিতর থেকে ড্যানের ভেজা জুতোগুলো বের করে দিল রানা। 'দেখো তো, এগুলো পরে হাঁটতে পারো কি না।'

কিন্তু পুরুষের জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটতে পারল না নোভা। কয়েক মিনিট পরেই খুলে দিয়ে বলল, 'বাপরে বাপ, হবে না, গোড়ালি ভাঙব। তারচেয়ে খালি পায়ে চলাই ভাল।'

'তা হলে আর কী,' রানা বলল, 'আমিই পায়ে দিয়ে নিই।'

রানা জুতো পরছে, নোভা বলল, 'সমস্যাটা হলো, ইউনিফর্মের সঙ্গে জুতো, মোজা কিছুই ছিল না। ওসব জিনিস হোস্টেসরা নিজেরাই কিনে নেয়, নিনা আমাকে বলেছে। আরেকটা কথা, আমার পরনে কোনও আণ্ডারওয়্যার নেই।'

'সত্যিই? দেখি তো!'

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও রানাকে হাসতে দেখে বসে পড়ল নোভা। 'দুষ্টামির জায়গা পাও না, না? এক বক্সিং মেরে তোমা...'

'বাপরে!' ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করল রানা, বলল, 'চলো, দেখি, খাবার কোথায় পাওয়া যায়।'

কিছুদূর এগিয়ে সরু একটা পথ পাওয়া গেল। সেটা ধরে আধঘণ্টা অবসন্নভাবে পা টেনে টেনে এগোনোর পর, একটা গ্রাম। এক চাষীর বাড়ি থেকে পানি, রুটি আর পনির ও দইয়ের মাঝামাঝি একটা খাবার জোগাড় করল নোভা।

বিস্মিত চাষীর বউ নোভার খালি পায়ের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। সাবধান করে দিয়ে বলল, পাকা রাস্তায় উঠতে আধঘণ্টা হাঁটতে হবে। ওদেরকে আরও কিছু রুটি, আর ভাঁড়ার থেকে দুটো শুকনো আপেল এনে দিল। তারপর কী ভেবে একজোড়া পুরানো জুতোও এনে দিল নোভাকে।

মহিলাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে রাস্তায় পৌঁছল ওরা। রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে

একটা সব্জি-বোঝাই লরি দেখে হাত নাড়ল নোভা। ড্রাইভার ভাবল, মেয়েটা একা, গাড়ি থামাল। কিন্তু ওর সঙ্গে আরেকজন আছে শুনে নিতে আপত্তি জানাল। ঠিক এই সময় আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে নিতে হলো, কারণ ওর বেল্টে একটা পিস্তলের অস্তিত্ব টের পেয়েছে সে। পশ্চিমে চলল লরি। একটা বাজার-শহরে গাড়ি পৌঁছল। এখানেই আসছিল ড্রাইভার। একটা চৌরাস্তা দেখাল। বলল, পুব থেকে পশ্চিমে চলে যাওয়া রাস্তাটা ধরে গেলে পাওয়া যাবে কাজান শহর, তারপর তাতার ক্যাপিটাল, এবং তারপর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিটি গোর্কি। গোর্কি থেকে গাড়িতে করে মস্কো যেতে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা লাগে।

ড্রাইভার ওদের নামিয়ে দিল। নোভার কাপড়-চোপড় ঝেড়ে, টেনেটুনে যতটা সম্ভব ঠিক করে দিল রানা। এতক্ষণে কাপড়গুলো শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ছেঁড়া জ্যাকেটের গায়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর ছাপ দেখলে সন্দেহ জাগতে পারে কারও, তাই ওটা খুলে ফেলে দিল নোভা। খোলা পা, নীল স্কার্ট। চুলগুলোকে টেনে নিয়ে পিছনে বাঁধল ও। এখন দেখে মনে হতে পারে, বিপদে পড়া স্কুলমিস্ট্রেস। পুরুষরা ওকে সাহায্য করার জন্য আগ্রহী হবে।

প্রায় আধ ডজন বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ওর পাশে থামল, কিন্তু কোনটাই পছন্দ হলো না রানার। একটা ফার গাছের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ও, কোন গাড়ি থামলে ওর দিকে তাকাচ্ছে নোভা, আড়াল থেকে মুখ বের করে মাথা নাড়ছে রানা।

ভাল কোনও গাড়ি আছে কি না এই অঞ্চলে, সেটা নিয়েই সন্দেহ হতে থাকল রানার। অবশেষে একটা কালো রঙের ভলগা এ-২১ গাড়িকে আসতে দেখা গেল। অনেক পুরনো মডেল, 'রাশান মার্সিডিজ' নামে পরিচিত। একসময় কেজিবি'র পছন্দের এই গাড়িটিকে ভীষণ অপছন্দ করত লোকে, কেউ চাইত না ওটা তার বাড়ির দরজায় থামুক। তবে, এটা দিয়ে কাজ চলবে, ভাবল রানা।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত তুলল নোভা। থামল গাড়িটা। মাত্র একজন লোক, স্টিয়ারিঙে বসা, সিটের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এসে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা খুলতে হাত বাড়াল। লোকটার বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়, ধূসর চুল, মোটাসোটা, সুট পরেছে, গলায় টাই নেই।

সামনের সিটে উঠে বসল নোভা। রানা উঠল পিছনে। পছন্দ হলো না লোকটার। রানাকে ওর ভাই বলে পরিচয় দিল নোভা। মাথায় গণ্ডগোল আছে। কখনও কথা বলে না।

পশ্চিমে কাজানের দিকে এগোল ওরা। ঘণ্টাখানেক চলার পর একেবারে নির্জন একটা জায়গায় পৌঁছে লুগার পিস্তলটা বের করে ড্রাইভারের কানে ঠেকাল

রানা। বলল, 'গাড়ি থামান।'

গাড়ি থেকে নেমে একটা ঝোপের কাছে ওকে নিয়ে এল রানা। বলল, 'কাপড়গুলো খুলে ফেলুন।' ওর পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে কাপড় খুলে দিতে দ্বিধা করল না লোকটা।

পরনের ছেঁড়া, ময়লা কাপড়গুলো ফেলে লোকটার কাপড় পরে নিল রানা। বলল, 'সরি, এগুলো আর আপনার গাড়িটা বাধ্য হয়েই নিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে। মস্কোতে রেখে যাব। তেলের টাকাটাও দেব আমরা। আপনি জাস্ট একটা ঠিকানা বলুন।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটা বলল, 'এসবের কোনও প্রয়োজন ছিল না আসলে। বুঝলাম, খুব বিপদে পড়েছেন। কিন্তু আমিই আপনাদেরকে মস্কোয় পৌঁছে দিতে পারতাম।'

'আসলে, আমাদের সঙ্গে গেলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন, সেজন্যেই নিতে চাইছি না। আপনি ঠিকানা বলুন, আমি গাড়িটা রেখে যাব।'

ঠিকানা বলল লোকটা।

পকেট থেকে লোকটার মানিব্যাগ বের করে দিল রানা। আবার একটা দীর্ঘ মুহূর্ত রানার দিকে চেয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে নিল সে ওটা। ব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বের করে বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'মনে হচ্ছে, টাকা নেই আপনাদের কাছে। কিছু মনে না করলে এগুলো নিয়ে যান। গাড়িটার সঙ্গে ফেরত দিয়ে দেবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' বলে নোটগুলো নিয়ে পকেটে ভরল রানা। 'গাড়িটা নেয়ার জন্যে সত্যি দুঃখিত।'

মাথা দোলাল লোকটা, 'বুঝতে পারছি। আমি কিছু মনে করছি না।'

ওকে আরও একবার ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ির দিকে এগোল রানা।

'মস্কোতে পৌঁছে কি ব্রিটিশ এমব্যাসিতে যাব?' লোকটাকে নামিয়ে দিয়ে আসার মিনিট দশেক পর জিজ্ঞেস করল নোভা।

'সেটাই ভাবছি,' গাড়ি চালাচ্ছে রানা। সামনের রাস্তার দিকে চোখ। 'গিয়ে কী বলব ওদেরকে?'

'কিন্তু পাসপোর্ট ছাড়া তো কোনদিকে যেতে পারব না আমরা। বেরোব কী করে? প্লেনে চড়া তো সম্ভবই না।'

'দেখি, যাই তো আগে। একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

'প্যারিসে একটা ফোন করতে পারলে ভাল হতো।'

দুই ঘণ্টা একটানা গাড়ি চালানোর পর হঠাৎ নোভা বলে উঠল, 'ওই যে একটা টেলিফোন বক্স। থামাও তো।'

গাড়িতে বসে রইল রানা। নোভা গেল ফোন করতে। অন্ধকার হয়ে আসছে। দশ মিনিট পর ফিরে এসে হতাশকণ্ঠে নোভা বলল, 'হলো না। এখান থেকে লং ডিসট্যান্স কলের কোন ব্যবস্থাই নেই।'

'হুঁ, মনে হচ্ছে মস্কোতে ছাড়া হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজানে পৌঁছানো দরকার। যে জায়গা দিয়ে চলেছি—একটা পেট্রল পাম্প দেখছি না, তেল ফুরালে পাওয়া যাবে না। খিদেও লেগেছে। কাজানে থেমে খেতে হবে, তেলও নিতে হবে।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল নোভা।

কাজানে পৌঁছে একটা সাধারণ রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার আর পানি কিনে আনল নোভা। গাড়িতে বসেই খেল দুজনে। এখানকার ফোন বুদ থেকেও প্যারিসে ফোন করার চেষ্টা করল নোভা। পারল না।

আবার রওনা হলো ওরা।

রাত তিনটের দিকে মস্কোতে পৌঁছল। এতরাতে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবে না রানা। সুতরাং গাড়িতেই রাত কাটাল ওরা। এই গাড়িটার বিশেষত্ব হলো, সামনের সিটের হেলান নামিয়ে পিছনের গদিতে ঠেকালে বিছানা হয়ে যায়।

সকালে উঠে নাস্তা সেরে ব্যাংকে চলল রানা। ব্যাংকের বাইরে গাড়ি রেখে ভিতরে ঢুকল। নোভা গেল ফোন করতে।

কিছুক্ষণ পর টাকা নিয়ে হাসিমুখে ফিরে এল রানা। কিছুটা গম্ভীর হয়েই ফিরল নোভা। বলল, 'এমব্যাসিতে যেতে নিষেধ করল। বলল, ট্রেনে করে লেনিনগ্রাদ যেতে।'

'আমি জানতাম,' মাথা দোলাল রানা। 'এমব্যাসিতে গেলেই হাজারটা কৈফিয়ত, কীভাবে ঢুকেছি, কেন ঢুকেছি; আমাদের গোপন কথাগুলো আর গোপন থাকবে না—মিস্টার মারভিন লংফেলো সেটা চান না, তাই না?'

ঝট করে রানার দিকে মুখ ফেরাল নোভা। 'মানে?'

মুচকি হাসল রানা। 'না, কিছু না। বললাম, আমার বসের বন্ধু মারভিন লংফেলো আমার অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়টা গোপনই রাখতে চান।'

গাড়ির ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলল রানা। বুঝতে পারছে, নোভার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি ওকে বিদ্ধ করছে। ফিরে তাকাল না।

কয়েক মিনিট পর রাস্তার পাশে একটা বড় স্টোর দেখে তার সামনে গাড়ি থামাল রানা। নোভাকে টাকা দিয়ে বলল, দুজনের জন্য কাপড় কিনে আনতে।

চলে গেল নোভা। গাড়িতে বসে বসে ভাবতে লাগল রানা, লেনিনগ্রাদেই যেতে হবে। ওখান থেকে বোটে করে ফিনল্যাণ্ড। তারপর সীমান্ত পেরোতে আর কোন অসুবিধে হবে না। পাসপোর্টের সমস্যাটা মিটাতে হবে এখানে-ওখানে ঘুষ

দিয়ে। ও জানে, এদেশেও ঘুষখোর কর্মচারীর অভাব নেই।

রাশান রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে মাঠঘাট, ঝোপঝাড়, জঙ্গল, গ্রাম। ট্রেনের চাকার একটানা ঘটারং-ঘট ঘটারং-ঘট শব্দ কেমন যেন নেশা ধরায়। গত কয়েকটা দিন অমানুষিক পরিশ্রম গেছে। ট্রেনের উষ্ণ কামরায় বসে তাই ঘুম ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করছে ওর—কেবলই মনে হচ্ছে বিপদ এখনও কাটেনি। প্লেন থেকে ঝাঁপ দেয়ার পর সবকিছুই বড় বেশি সহজভাবে ঘটে যাচ্ছে যেন। ও দেখেছে, ঠিক এরকম নিশ্চিন্ত মুহূর্তেই অতর্কিতে হামলা করে চরম বিপদ। অতি সতর্কতা ঠিকমত ঘুমোতে দিচ্ছে না ওকে।

পাশের সিটে ঘুমিয়ে পড়েছে নোভা। ও জানে, পাশে বসে আছে রানা। এই মানুষটির ওপর ভরসা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়া যায়—যে কোন জায়গায়, যে কোন পরিস্থিতিতে।

ছোট কামরাটায় শুধু ওরা দুজন, আর কেউ নেই।

ঘটারং-ঘট! ঘটারং-ঘট! ঘটারং-ঘট!

মাথাটা কেমন ঘোলাটে হয়ে এল রানার। টেনে খুলে রাখতে পারল না চোখের পাতা...

'রানা! রানা!' বহুদূর থেকে যেন ভেসে এল নোভার ডাক।

গলায় প্রচণ্ড চাপ। দম নিতে পারছে না রানা।

চোখ মেলতেই ঠিক সামনে দেখতে পেল কেপি পরা কুৎসিত মুখটা। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে রানার গলা টিপে ধরেছে লি টনকিন।

লির চোখে খোঁচা মারার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু মাথা সরিয়ে নিল লি। পা সোজা করে ওর দুই ঊরুর ফাঁকে লাথি মারল রানা। গুঙিয়ে উঠলেও আঙুলের চাপ কমাল না লি। হয় পিস্তল আনেনি ও, ভাবল রানা, নয়তো শব্দের ভয়ে ব্যবহার করছে না।

শক্তি পাচ্ছে না রানা। গত কয়েক দিনের না খাওয়া, আর নানারকম অত্যাচারে শরীর কাহিল। বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে ফুসফুস।

টের পেল, একটা হাত আলগোছে ওর কোমর থেকে লুগার পিস্তলটা খুলে নিচ্ছে।

রাগে গর্জে উঠে নোভার কব্জিতে থাবা মারল লি। মেঝেতে পড়ে গেল পিস্তল। তবে সুযোগ পেয়ে গেছে রানা। লির বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ডান হাতে চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ভেঙে দিল।

ব্যথায় তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে গেল লি। ডান হাতে ঘুসি মারল রানার

মুখে। মাথা নিচু করে ফেলল রানা। লির ঘুসিটা ওর কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। রানা মারল ওর তলপেট লক্ষ্য করে। মেঝেতে পড়ল লি, তবে চুল খামচে ধরে টেনে সাথে নিয়ে গেল রানাকেও।

পিস্তলটা আবার তুলে নিয়েছে নোভা।

'না! গুলি কোরো না,' রানা সাবধান করল ওকে। 'শব্দ হলে গার্ড চলে আসবে।'

মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি, ধস্তাধস্তি করছে রানা ও লি। সিটে উঠে বসল নোভা। প্রচণ্ড এক ধাক্কায় গায়ের উপর থেকে রানাকে সরিয়ে দিয়ে ওর বুকের উপর চেপে বসল লি, বামহাত ভাঁজ করে নলী দিয়ে আবার টিপে ধরল ওর গলা। পিস্তলের বাঁট দিয়ে গায়ের জোরে লির চাঁদিতে বাড়ি মারল নোভা। ককিয়ে উঠে রানার চুল ছেড়ে নিজের রক্তাক্ত মাথা চেপে ধরল লি। ভাঙা আঙুলটা ধরে আরেক হ্যাঁচকা টান দিল রানা। গলার উপর থেকে চাপ সরে গেল। আঁউ করে বিকট এক চিৎকার ছাড়তে যাচ্ছিল লি, কিন্তু পারল না, রানা কপাল দিয়ে ওর সোলার প্লেক্সাসে গুঁতো মারতেই *খপ্* করে বন্ধ করল মুখ। পরক্ষণে একটা পা বাঁকিয়ে এনে প্রচণ্ড জোরে হাঁটু চালাল রানা লির চোয়ালে। হাড় ও দাঁত ভাঙার *মড়াৎ* শব্দ শোনা গেল। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল লি।

'জানালার কাঁচ নামাও, নোভা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'এটাকে বাইরে ফেলে দিই।'

প্লায়ার্স দিয়ে টেনে মানুষের জিভ ছিঁড়ে ফেলার দৃশ্য দেখতে পেল রানা কল্পনায়, দুই কানে চপস্টিক ঢুকিয়ে মানুষকে চিরতরে কালা করে দেয়ার দৃশ্য দেখতে পেল। প্রচণ্ড রাগ অন্ধ করে দিল ওকে, রক্ত চড়ে গেল মাথায়। নোভার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নলটা সবেগে ঢুকিয়ে দিল লির মুখে। দাঁত ভেঙে, জিভ কেটে ঢুকে গেল নল, ছিঁড়ে গেল কণ্ঠনালীর ওপরের অংশ। অমানবিক গোঙানি বেরোল লির মুখ থেকে। বেহুঁশ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

'নোভা, ধরো,' রানা বলল, 'সাহায্য করো আমাকে।'

দুজনে মিলে টেনেহিঁচড়ে উঁচু করল অজ্ঞান দেহটা। জানালা দিয়ে লির মাথাটা বাইরে ঠেলে দিল রানা। দুজনে দুই পা ধরে ঠেলছে। লির দেহের প্রায় অর্ধেকটা বাইরে চলে গেছে। দুই পায়ে লাথি ছুঁড়তে শুরু করল। জ্ঞান ফিরেছে। ঠিক এই সময় একটা সরু টানেল এসে পড়ল। এখুনি ঢুকবে ট্রেন ওর ভিতর। ব্যাপারটা টের পেয়ে আতঙ্কিত দৃষ্টি ফুটল নিষ্ঠুর লোকটার চোখে, পা ছোঁড়া বন্ধ করে শরীর মুচড়ে কামরার ভিতর ফিরে আসার চেষ্টা করছে এখন। কিন্তু সুড়ঙ্গটা চলে এসেছে কাছে। প্রচণ্ড জোরে সুড়ঙ্গের মুখে বাড়ি খেল ওর মাথা। *ঠাস* করে ফাটল খুলি, পরমুহূর্তে গলা থেকে মাথাটা ছিঁড়ে উড়ে চলে গেল। ধড়টা বাইরে

ঠেলে দিয়ে বাংকের ওপর নেতিয়ে পড়ল রানা।

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে নোভা।

উনিশ

প্যারিসের আরেকটি বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা। ডেস্কে বসে একটা পুলিশ রিপোর্ট পড়ছে ফ্রাঁ থিয়াখি। সবুজ টেলিফোনটার তীক্ষ্ণ শব্দে মনোযোগ নষ্ট হলো ওর, বিরক্ত ভঙ্গিতে থাবা দিয়ে তুলে কানে ঠেকাল। মুহূর্ত পরেই উত্তেজনা ফুটল চোখে। 'আরে, রানা! তুমি কোথায়?'

'হেলসিংকি এয়ারপোর্টে। প্যারিসে আসছি। আধঘণ্টার মধ্যেই রওনা দেবে আমার ফ্লাইট। কাল রাতে ডিনার করব তোমার সাথে।'

'কাল? মানে শুক্রবারে? কিন্তু... শুক্রবারে তো আমার... আসলে সময় দেয়া কঠিন। সারা সপ্তাহ হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই শেষ দিনটির আশায় থাকি। মাটি করবে? অন্য কোনও দিন করো না। কিংবা লাঞ্চ? আসতে পারবে না?'

'দেখি, কী করা যায়। ফ্রাঁ?'

'বলো?'

'ওকে আমার শুভেচ্ছা দিয়ো, শুক্রবার যে তোমার অপেক্ষায় থাকে।'

লাইনটা কেটে গেল। আস্তে করে রিসিভার রেখে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইল থিয়াখি। তারপর জোরে নিঃশ্বাস ফেলে, মাথা নেড়ে, আবার নজর দিল রিপোর্টের দিকে।

প্যারিস এয়ারপোর্ট থেকে আলাদা আলাদা ট্যাক্সি নিল রানা ও নোভা। লির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পর আর নতুন কোনও অঘটন ঘটেনি। লেনিনগ্রাদে পৌঁছে, একটা বোট ভাড়া নিয়ে ফিনল্যাণ্ডের বন্দর শহর হামিনায় পৌঁছেছিল ওরা। ওখান থেকে ট্রেনে গিয়েছিল হেলসিংকিতে। তারপর প্লেনে করে ফ্রান্স।

আগামীকাল নোভার অফিসে ফোন করবে, কথা দিল রানা। বিকেলের দিকে করতে বলল নোভা। দিনে ব্যস্ত থাকবে কাজে। রওনা হয়ে গেল নোভার ট্যাক্সি। বৃষ্টিভেজা রাতের বাতাসে জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল নোভা। রানাও হাত নেড়ে জবাব দিয়ে নিজের ট্যাক্সির দিকে এগোল। ড্রাইভারকে *টার্মিনা নৌর* হোটেলে যেতে বলল।

প্যারিসের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে চলেছে ট্যাক্সি। গত কয়েকটা দিনের ভয়ানক

দৃশ্যগুলো বার বার ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। ভাবতে চাইছে না ও।

হোটেলে ফিরে রুম নিল। অবশিষ্ট দিন ও সারাটা রাতই প্রায় ঘুমিয়ে কাটাল। বয়কে দিয়ে হোটেল রুমেই খাবার আনিয়ে খেল।

পরদিন শুক্রবার। ঝকঝকে রোদ। আগের সন্ধ্যার বৃষ্টি-বাদলার কিছুই অবশিষ্ট নেই। একটানা বিশ্রাম নিয়ে রানার শরীর মনও ঝরঝরে। বেরোবে ঠিক করল ও। প্রথমে মারভিন লংফেলোকে ফোন করবে। তারপর বাজারে যাবে, কিছু কাপড়চোপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হবে।

গোসল সেরে নীচে নামল ও। নিরাপত্তার কারণে হোটেলের পাবলিক বুদ থেকেই ফোন করল লণ্ডনে, বিএসএস-এর অফিসে।

'রানা? কোথায় তুমি?' ভেসে এল মিস্টার লংফেলোর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

'প্যারিসে, সার। কেন, জুলিয়াকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি তো আমি কোথায় আছি। ও বলেনি আপনাকে?'

'বলেছে, কিন্তু লণ্ডনে না এসে প্যারিসে কেন?'

'এখানেই তো ছিলাম ছুটিতে। রিপোর্ট তো গতকাল পেয়েই গেছেন—আমার কি লণ্ডনে আসার প্রয়োজন আছে? আরও কটা দিন ছুটি রয়েছে আমার হাতে, ভাবছি...'

'ও। আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক আছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমার মাধ্যমে তোমাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।'

'থ্যাঙ্কস।' মুচকি হাসল রানা। 'তবে আমার নয়, ধন্যবাদটা প্রাপ্য আপনার বন্ধু মেজর জেনারেল রাহাত খানের।'

'তাঁকে আগেই জানিয়েছি।'

'ভালো কথা, ওই একরানোপ্লেনটার কী ব্যবস্থা নিলেন?'

'আবু হাশিমের রিপোর্ট পেয়েই আমরা ইরান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওদের অনুমতি নিয়ে ক্যাস্পিয়ান সাগরেই বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওটাকে।'

'চমৎকার! আর পিটসেনের ওই মরুভূমির ঘাঁটিটা?'

'ওটাও শেষ। কাজটা ইরান সরকারই করে ফেলেছে।'

'বাহ্!' হাসল রানা। 'সবই দেখছি সুখবর। রাখি তা হলে...'

'ও-কে, রাখো। আর... থ্যাঙ্ক ইউ, মাই বয়।'

কেটে গেল লাইন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। নদীর ধার ধরে এগোল।

উজানের দিকে বেশ কিছুটা সামনে একটা ব্রিজ, নদীর উপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে। ফুরফুরে বাতাসটা উপভোগ করতে করতে ধীর পায়ে হাঁটছে রানা

নদীর কিনার ধরে।

কিছুদূর এগিয়ে একশ' গজ উজানে সেই প্যাডল স্টিমারটা চোখে পড়ল, 'অ্যামাযন', মিসিসিপি থেকে যেটাকে মাসখানেকের জন্য ধার করে আনা হয়েছে। একটা স্টপেজে দাঁড়ানো। ডেকে হাসিখুশি টুরিস্টদের ভিড়। ডোরাকাটা ব্লেজার আর সাদা ট্রাউজার পরা ব্যাণ্ড পার্টি গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে জোরেশোরে বাজনা বাজাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। হাতে অফুরন্ত সময় ওর।

জিনিসপত্র পরেও কেনা যাবে, ভাবল ও। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নদীর পানির কাছে নেমে গেল। একটা টিকিট কিনে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে স্টিমারে উঠল।

গলুইয়ের কাছে খালি সিট আছে। একটা বেঞ্চে বসল ও। গ্রীষ্মকালের চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ দিন, আর প্যারিস যেন প্রাণচাঞ্চল্যে টগবগ করে ফুটছে। কাঠের বেঞ্চে যতটা সম্ভব আরাম করে বসে বিকেলের কথা ভাবছে রানা, যখন নোভার সঙ্গে দেখা হবে। ওর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হবে রানার।

স্টিমার ছাড়ল। জেটি থেকে সরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সামনে। আপাতত বাজনা বাজানো বন্ধ করেছে ব্যাণ্ড পার্টি। দুনিয়ার কোথাও যেন তাড়া নেই কোনও।

একটা ছায়া রোদ আড়াল করে দিতেই রানার দিবাস্বপ্ন টুটে গেল। চোখ মেলে দেখল, দাড়িওয়ালা লম্বা এক লোক সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ ভর্তি কালো চাপ দাড়ি, চামড়ার রঙের সঙ্গে বেমানান। চেহারাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়েই চিনে ফেলল হঠাৎ।

ঠিক একই সময়ে পিছন থেকে শক্ত একটা জিনিস চেপে বসল ওর মেরুদণ্ডে।

'আপনার সঙ্গে বসলে অসুবিধে আছে?' পিটসেন জিজ্ঞেস করল। 'আমার ছেলেমানুষী ছদ্মবেশ দেখে নিশ্চয় হাসি পাচ্ছে আপনার। তবে না নিয়ে উপায় ছিল না—রিপোর্টাররা পিছনে লাগত—আপনার কল্যাণে আমার মুখটা এতই বেশি চেনা হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমাকে খুঁজে বের করলেন কী করে?'

জোরে হাসল পিটসেন, কেমন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ বেরোল। 'আমার দু-চারটে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই রাতারাতি আমি ফকির হয়ে গেছি ভাবার কোনও কারণ নেই, রানা। তা ছাড়া, লোকের অভাব নেই আমার—লণ্ডন, প্যারিস, এমনকী মস্কোতেও আছে। আমি যখন জানলাম, ডিসি-১৫টা জাখারভ-১৭তে আঘাত হানেনি, সঙ্গে সঙ্গে লিকে প্লেনে করে মস্কোতে পাঠালাম নজর রাখতে। আমার কানে এসেছিল, মেয়েটাকে নিয়ে আপনি মস্কোতে যাচ্ছেন। অনুমান করেছিলাম, ওখান থেকে ট্রেনে করে লেনিনগ্রাদ হয়ে ফিনল্যাণ্ডে যাওয়া ছাড়া রাশা

থেকে বেরোনোর আর কোনও সহজ পথ খোলা নেই আপনার জন্যে।

তা ছাড়া, মেয়েটার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা বিজনেস কার্ড পেয়েছিল আমার লোকেরা। আমি ধরেই নিলাম, দুটো জায়গায় যেতে পারেন আপনি: প্যারিস, অথবা লণ্ডন। দুটো জায়গার এয়ারপোর্টেই চোখ রাখতে বললাম আমার লোকদের। ওরা সারাক্ষণ নজর রেখেছে আপনার ওপর। কাজেই, আপনাকে খুঁজে বের করা কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না।'

'তো, এখন কী চান আমার কাছে?'

'আমি আপনাকে খুন করতে চাই, রানা। আর কিছু না। একটু পরেই আবার বাজনা শুরু করবে ব্যাণ্ড পার্টি। তখন হট্টগোলের মধ্যে একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের গুলির আওয়াজ কেউ শুনতে পাবে না।'

রানার পিছনে তাকাল পিটসেন। পিছনের বেঞ্চে সামনে ঝুঁকে বসেছে ওর সহকারী। একবার খোঁচা দিয়েই লম্বা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছে হাতে ঝোলানো রেইনকোটের ভাঁজে।

'ও হচ্ছে মিস্টার মোল্লা,' পিটসেন বলল। 'ওর ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করতাম আমি। কিন্তু বেঈমানির কারণে মরতে হয়েছে বেচারাকে। যাকগে, সে অন্য গল্প।'

'আপনার মরুভূমির কারখানাটার কী হলো?'

'এমনিতেই খোঁজাখুঁজি করছিল তেহরানের পুলিশ, মাদক চোরাচালানের ওপর কড়া নজর রেখেছিল ওরা। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে ইরানিয়ান এয়ার ফোর্স হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

'তারমানে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে?'

'নাহ্। আমার লোকদের বাধা দিতে বারণ করে প্যারিসে চলে এসেছিলাম।'

'শ্রমিকদের কী হলো?'

'ওই নেশাখোরগুলোর? কী করে বলব? আর কেয়ারই বা করে কে? ওরা মরল না বাঁচল তাতে কারও কিছু এসে যায়? নর্দমার কীট আবার নর্দমাতেই ফিরে গেছে হয়তো।'

ব্যাণ্ড পার্টির দিকে তাকাল রানা। অনেকক্ষণ একটানা বাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা। কেউ কেউ তার বেঁধে সুর ঠিকঠাক করছে।

তারপর তাকাল পিটসেনের দস্তানা পরা হাতটার দিকে। দুটো হাতই কোলের ওপর রাখা, একটার ওপর আরেকটা।

'রানা, আপনি বাজনা পছন্দ করেন?' পিটসেন বলল, 'যে কোনও সময় শুরু করবে আবার। কোনও নাটকীয়তার মধ্যে যাব না আমি, কারণ আপনাকে বিশ্বাস নেই, সুযোগ পাওয়ামাত্র গুলি করবে মোল্লা। আপনার মত একজন নোংরা গুপ্তচরের জন্যে একটা বুলেটই যথেষ্ট।'

অপেক্ষা করছে রানা। বারো সদস্যের বাজিয়ে দলের নেতা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ওর লোকদেরকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল। অধৈর্য ভঙ্গিতে সবার তৈরি হয়ে নেয়ার অপেক্ষায় আছে। তারপর যেই হাতের লাঠি তুলে ঝাঁকি দিয়ে নীচে নামাল, শুরু হলো বাজনা। চোখের পলকে পিটসেনের বাঁ হাত ধরে একটানে দস্তানাটা খুলে ফেলল রানা। ওর জানা আছে, নিজের বিকৃতি নিয়ে লজ্জা পায় লোকটা, কেউ দেখে ফেললে বিব্রত বোধ করে, হীনম্মন্যতায় ভোগে।

হাত ঘুরিয়ে দস্তানাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা, যদ্দূর যায়। ব্যাণ্ডমাস্টারের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল ওটা। আরেক হাত দিয়ে পিটসেনের বানুরে হাতটা উঁচু করে ধরল যাতে সবার চোখে পড়ে। মরিয়া হয়ে হাতটা টেনে ছুটানোর চেষ্টা করল পিটসেন। সুযোগটা কাজে লাগাল রানা। হাত মুচড়ে পিটসেনকে নিয়ে ফেলল ওর পিস্তলধারী সহকারীর উপর। পিস্তলটার নল এখন পিটসেনের বুক বরাবর তাক করা। গুলি করার সাহস পেল না মোল্লা। পিটসেনকে বর্মের মত ধরে রেখে আচমকা ডান হাতে প্রচণ্ড এক আপার-কাট চালাল রানা মোল্লার চিবুক লক্ষ্য করে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিভ বেরিয়ে পড়েছিল লোকটার, ঘুসি খেয়ে কাটা পড়ল সেটা দু'পাটি দাঁতের চাপে—ডেকের উপর পড়ে আপনা-আপনি লাফাচ্ছে জিভের টুকরোটা। মুহূর্তে রক্ত গড়াতে শুরু করল হাঁ করা মুখের দুই কশ বেয়ে। ব্যথায় কুঁচকে গেছে গাল। পিটসেনের হাত মুচড়ে ধরে রাখায় কিছু করতে পারছে না সে। মোল্লার চুল খামচে ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে নিজের বেঞ্চের ওপর ফেলল রানা, বেঞ্চের কিনারে ঠুকে নাক-মুখ থেঁতলে দিল। তারপর ডান হাতে পিটসেনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলল ডেকের ওপর। চার হাতপায়ে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে ব্যাণ্ড পার্টির দিকে এগোল পিটসেন, চোখ নামিয়ে ওদের পায়ের কাছে এমন ভঙ্গিতে খুঁজে বেড়াচ্ছে দস্তানাটা, যেন ওটা পাওয়ার ওপরই নির্ভর করছে জীবন-মরণ। মোল্লার চুল ছাড়েনি রানা, বাঁ হাতে চেপে ধরে রেখেছে বেঞ্চের ওপর। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে গুলি বেরোনোর শব্দ হলো। তবে কারও কোন ক্ষতি না করে রানার পায়ের কাছে ডেকে বিঁধল গুলিটা। বেঞ্চের হেলান ডিঙিয়ে মোল্লার পাশে চলে এল রানা, ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে চেপে ধরল ওর পিস্তল ধরা ডান হাত। আবার গুলির শব্দ হলো। এবার ক্যানভাসের চাঁদোয়া ফুটো করে শূন্যে চলে গেল বুলেট।

ইতিমধ্যে গোলমালটা দেখে ফেলেছে দর্শকরা। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। রানার দিকে দৌড়ে এল স্টিমারের দুজন ক্রু। মোল্লার ডান হাত মুচড়ে ওটাকে পিঠের ওপর নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে উপর দিকে ঠেলে দিল রানা। কাঁধের জোড়া ছুটে যাবার শব্দ শুনল। আর্তনাদ করে উঠল মোল্লা। ক্রু-রা ওদের

কাছে পৌঁছে গেছে। অ্যালার্ম বাজিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা থেমে গেল। পিস্তলটা মোল্লার হাত থেকে ছিটকে ডেকে পড়তেই চট্ করে সেটা তুলে নিয়ে পিটসেনের পিছনে ছুটল রানা।

সামনেই ওভারব্রিজ। ওটার নীচ দিয়ে যাবে এখন অ্যামাযন। ওর *মহামূল্যবান* দস্তানাটা খুঁজে পেয়ে আবার হাতে পরে নিয়েছে পিটসেন। বিস্মিত ক্যাপ্টেন ও পাইলটের তোয়াক্কা না করে হুইলহাউসের পাশের মই বেয়ে দ্রুত উঠে গেল সে ছাতে। মেরামতকারীদের ওঠানামার সুবিধের জন্য লোহার আঙটা লাগানো রয়েছে ইঁটের তৈরি ওভারব্রিজে। ক্রমে কাছে চলে আসছে ব্রিজটা। ব্রিজ পেরোবার সময় সবচেয়ে নীচের আংটাটা ধরে ঝুলে পড়ল পিটসেন। বেয়ে উঠে যেতে শুরু করল। রানাও ততক্ষণে হুইলহাউসের ছাতে উঠে পড়েছে। স্টিমারটা ব্রিজের নীচে চলে যাওয়ার আগেই, শেষ মুহূর্তে, সে-ও আংটা ধরে ঝুলে পড়ল। মোল্লার পিস্তল গুঁজে নিয়েছে কোমরে।

ডজনখানেক আংটা বেয়ে ওপরে উঠে এল রানা। রেলিং পেরিয়ে ব্রিজের চার লেনের রাস্তায় নামল। রাস্তা পেরিয়ে ততক্ষণে ওপারে চলে গেছে পিটসেন।

ছুটন্ত গাড়িটাড়ি কিছুরই তোয়াক্কা করল না রানা, সে-ও রাস্তা পেরোনোর জন্য ছুটল। ঘ্যাচ-ঘ্যাচ করে ব্রেক কষছে গাড়িগুলো, পাগলের মত হর্ন বাজাচ্ছে, কেউ কেউ গালিও দিচ্ছে, তবে *খেপা* লোকটাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে সবাই। দুই লেন পেরিয়ে রাস্তার আইল্যাণ্ডে উঠল রানা। দেরি করলে পালিয়ে যাবে পিটসেন। তাই দৌড়ে ধরার ঝুঁকি না নিয়ে ওখানে দাঁড়িয়েই গুলি করল। উরুতে গুলি খেয়ে চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল পিটসেন।

আইল্যাণ্ড থেকে নেমে আবার আগের মতই গাড়ির তোয়াক্কা না করে দৌড়ে রাস্তা পেরোল রানা। দেখল, আবার উঠে দাঁড়িয়েছে পিটসেন।

ব্রিজের অন্যপারে বেরিয়ে এল স্টিমারটা। সেটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল পিটসেন। তারপর রেলিং বেয়ে ওপরে উঠে দাঁড়াল। স্টিমারের ওপর লাফিয়ে নামার ইচ্ছে বোধহয়। ওর বুক লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল রানা।

'আমাকে খুন করার আনন্দ আমি তোমাকে পেতে দেব না, নোংরা ছুঁচো কোথাকার!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পিটসেন। নকল দাড়ির অর্ধেকটা খুলে গিয়ে ঝুলছে।

রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুরে ঝাঁপ দিল পিটসেন। রেলিঙের কাছে দৌড়ে এসে নীচে তাকাল রানা। এখনও বেঁচে আছে পিটসেন। নদীর বাদামি পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাড়াহুড়োয় হিসেব ঠিক রাখতে পারেনি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ও। স্টিমারের ডেকে না পড়ে পড়েছে পানিতে, গলুইয়ের সামান্য পিছনে।

ক্যাপ্টেন বা পাইলট, কেউই ওকে পড়তে দেখেননি। এগিয়ে যাচ্ছে স্টিমার।

প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল পিটসেন। পারল না। শেষ মুহূর্তে হাল ছেড়ে দিয়ে যেন বোধবুদ্ধি হারিয়ে তাকিয়ে রইল স্টিমারের পাশের বিশাল চাকাটার দিকে।

রানাও যেন বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে দেখছে দৃশ্যটা। পানির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল পিটসেন। একটু পর বেরিয়ে এল স্টিমারের মস্ত প্যাডল হুইলের দাঁতে আটকে গিয়ে। চাকা ঘুরছে। দ্বিতীয়বার অদৃশ্য হলো পিটসেন। চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে এল। আবার ডুবল। তৃতীয়বার যখন বেরোল, পপি-রঙের রক্তের দাগ দেখা দিল নদীর পানিতে। প্যাডলের দাঁতে একটা প্রাণহীন পুতুলের মত লটকে রয়েছে পিটসেন। চতুর্থবার ডুবল ও। এবার চাকাটা পুরো ঘুরে এলেও পিটসেন উঠল না, আর দেখা গেল না ওকে। নিশ্চয় দাঁত থেকে ছুটে তলিয়ে গেছে পানিতে। এসবের কোন কিছুই জানতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। ফুল স্পিডে স্টিমার নিয়ে ছুটেছেন উজানের দিকে। পুলিশকে খবর দেয়ার জন্যই বোধহয় তাঁর এই তাড়াহুড়া।

স্টিমারটা সরে গেল। তাকিয়েই আছে রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিটসেনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওর চোখ। কিন্তু আর ভাসল না পিটসেন। স্টিমারের যাত্রাপথে পানিতে রেখে যাওয়া লম্বা চওড়া রেখাটার মধ্যে ভেসে উঠল শুধু একটা সাদা রঙের দস্তানা, ঢেউয়ে ওঠানামা করতে করতে স্রোতের টানে এগোল কিছুদূর, তারপর পানি ভরে যাওয়ায় আবার তলিয়ে গেল।

দুপুর থেকে শুরু করে পুরো বিকেলটাই রানাকে থানায় কাটাতে হলো। নোভাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে, সাড়ে ছ'টার আগে আসতে পারবে না। নোভা বলেছে, অতক্ষণ ও অফিসে থাকবে না। ক্রিলন লবি হোটেলের ৫৪৩ নম্বরে ওর রুমে যেন আসে।

পিটসেনের মৃত্যুটা যে একটা আত্মহত্যার কেস, কোনমতেই পুলিশকে বোঝাতে পারল না রানা। শেষে বিকেল পাঁচটায় ফ্রাঁ থিয়াখিকে ফোন করে ডেকে আনার পর ও যখন রানার জামিন হলো, তখন ছাড়ল পুলিশ। তবে কাগজপত্রের ঝামেলা শেষ করে থানা থেকে বেরোতে বেরোতে সাড়ে ছ'টা বেজে গেল।

'এখন কী? ডিনারে যাবে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'যেতে পারলে তো খুশিই হতাম,' ঘড়ি দেখল থিয়াখি। 'কিন্তু...'

'ঠিক আছে, তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও, আটকাব না,' রানা বলল। 'আমারও কাজ আছে।'

'সোমবারে লাঞ্চ করা যেতে পারে,' থিয়াখি বলল।

'যদি প্যারিসে থাকি।'

দুজনে দুটো ট্যাক্সি ডাকল ওরা। রানার সঙ্গে হাত মিলিয়ে থিয়াখি ট্যাক্সিতে উঠল। রানা উঠল তারটায়। ক্রিলন লবিতে পৌঁছতে পৌঁছতে সাতটা বেজে পাঁচ। ক্লার্ককে বলল, 'রুম ফাইভ ফোর থ্রি, প্লিজ।'

রিসিভার তুলে কথা বলল ক্লার্ক। রানাকে বলল, 'যান, উনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

লিফটে করে পাঁচ তলায় উঠে ৫৪৩ নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দরজায় টোকা দিল।

'এসো,' ভিতর থেকে সাড়া এল।

পাল্লা ঠেলে ঘরে ঢুকল রানা। ঘরের অন্ধকার একটা কোণে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল নোভা। ঘরে একটি মাত্র আলো জ্বলছে, টেবিল ল্যাম্পের। অল্প পাওয়ারের বাল্‌ব্। তাতে অন্ধকার তো কাটেইনি, বরং আরও গাঢ় হয়েছে; আর কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে দূর প্রান্তের অন্ধকার কোণগুলো।

'হ্যালো, রানা,' এগিয়ে এল নোভা। সুইচ টিপে দেয়ালের একটা আলো জ্বেলে দিল। তাতেও অন্ধকার পুরোপুরি কাটল না। তবে এখন দেখা যাচ্ছে সব।

কালো পোশাক পরেছে নোভা, কালো মোজা। গলায় রুপালি নেকলেস। ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক। শ্যাম্পু করা চকচকে চুল কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে।

'রানা, একটা সত্যি কথা বলি, আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি,' হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়াল নোভা।

'তাই নাকি,' হাসল রানা। 'তো, কী বলে ডাকব এখন তোমাকে? নোভা, নাকি নিনা?'

'কখন জানলে?' হাসি চলে গেছে নোভার মুখ থেকে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রানা। তারপর আবার ভারি দম নিল। 'নশাহ্‌রে। একরানোপ্লেনের হ্যাঙারে যখন গুলি করে ইলেকট্রিকের তার কেটে দিয়েছিলে, প্রথম সন্দেহটা তখনই হয়েছিল।'

ঠোঁট গোল করে মৃদু শিস দিল নোভা। 'এত সরু জিনিসে এত নিখুঁত নিশানা করলাম কী করে, তাই তো? এর আগের দুটো হপ্তা দুটো নতুন ওয়ালথার পিস্তল দিয়ে এত বেশি প্র্যাকটিস করেছি, মিস করার উপায় ছিল না। মিথ্যে বলার জন্যে দুঃখিত, রানা। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।'

'ধীরে, নোভা, ধীরে।' সোফার মখমলে মোড়া নরম গদিতে বসল রানা। দুই পা তুলে দিল সামনের কফি টেবিলে। 'তুমি যে কাজ করো বলেছ, তা যে তুমি করো না, বোঝার জন্যে অনেক সূত্র দিয়েছ আমাকে। বোটইয়ার্ডে এমনভাবে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়েছিলে, মাটিতে কোনও ছায়া পড়েনি। নশাহ্‌রে আমার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা করলে, তোমার চুলে তাজা শ্যাম্পুর গন্ধ

পেয়েছি—তেহরান এয়ারপোর্ট থেকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে গাড়িতে করে আসা কারও চুলে ওরকম গন্ধ পাওয়া যাওয়ার কথা নয়, বরং ঘামের গন্ধ থাকত।'

চোখ নামাল নোভা। 'আমি আসলে মিথ্যে বলতে চাইনি, রানা, বিশ্বাস করো। তা ছাড়া...'

'মিস্টার লংফেলো আমার পিছনে কেন লাগিয়েছিলেন তোমাকে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নোভা। 'ডাবল-ও হিসেবে এটাই ছিল আমার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। তাঁর ধারণা, আমি একা একা পারব না—এমন কারও সঙ্গে আমার কাজ করা উচিত, যে আমাকে মরতে দেবে না।'

'নাকি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেননি?'

'রাখতে পারেননি নয়, বরং বেশিই ভরসা করেছেন,' নোভা বলল। 'তিনি জানেন, তুমি একা একা কাজ করতে পছন্দ করো, তাই আমাকে সঙ্গে দেয়ার কথা তোমাকে সরাসরি জানাতে সাহস পাননি। পাছে তুমি বেঁকে বসো, কাজটা করতে না চাও।'

রানার পাশে বসল নোভা। রানার একটা হাত ধরল। 'ভালই করেছি আমরা, কী বলো, রানা?'

'আর প্যারাশুট,' বিড়বিড় করল রানা, নোভার কথায় যেন কান নেই ওর। 'যেভাবে পরে নিলে, ভালমত ট্রেনিং দেয়া না থাকলে কিছুতেই পারতে না।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, রানা। বললাম তো, আমার ওপর অর্ডার ছিল।'

'আর নিনা?'

মাথা নাড়ল নোভা। 'নেই। বানানো গল্প।'

'জন্মদাগটা তৈরি করেছিলে কীভাবে?'

'চা আর ডালিমের রস দিয়ে।'

'আর চোখের রং? নিশ্চয় কণ্ট্যাক্ট লেন্স?'

মাথা ঝাঁকাল নোভা। 'হ্যাঁ। চশমার দোকান থেকে কিনেছি...'

'তুমি একজন সাংঘাতিক অভিনেত্রী।' এতক্ষণে হাসি ফুটল রানার মুখে।

'জানি। দু'বছর স্টেজ স্কুলে পড়েছি, তখন আমার বয়েস একুশ। অভিনয়ের ক্ষমতা, আর ভাল রাশান জানা, আমার বিএসএস-এ চাকরি পাওয়ায় সাহায্য করেছে।' রানার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল নোভা। 'এখন তুমি যদি মিস্টার লংফেলোর কাছে আমার প্রশংসা করো, তা হলে চাকরিটা পাকাপোক্ত হয়। কিছুদিন আগে জার্মানিতে এক অ্যাসাইনমেন্টে মারা গেছে জিরো জিরো ফোর। তার জায়গায় অস্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়েছে আমাকে।'

মুচকি হাসল রানা। 'তার মানে কাজটা তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এত ঝুঁকি আছে জেনেও?'

'হ্যাঁ।'

'মরতে ভয় পাও না?'

'তুমি পাও?'

'আমার তো এটা রক্তে মিশে গেছে। এই বিপদ, এই উদ্বেগের মধ্যে থাকা, এগুলোই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এসব বাদ দিলে জীবনটা পানসে হয়ে যাবে। বেঁচে থাকায় আর কোনও আনন্দই থাকবে না।'

'জানো, আমারও ঠিক এমনই মনে হয়,' উত্তেজনায় কাঁপছে নোভার গলা। 'পানসে জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে লাভটা কী?' রানার দু'হাত জড়িয়ে ধরল ও। 'রানা, প্লিজ, বসের কাছে আমার একটু গুণগান কোরো। আমি জানি, তুমি বললে আমার চাকরিটা হয়ে যাবে।'

'বলব। কারণ, সত্যিই তুমি অসাধারণ। যে ভয়ঙ্কর কাজগুলো করেছ, ঠাণ্ডা মাথায়, নির্বিকার ভাবে, জিরো জিরো লেবেলটা তোমার প্রাপ্য।' হাসল রানা। নোভার চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। 'কিন্তু শুধু শুধু বলতে যাব কেন? ঘুষ ছাড়া?'

নোভাও রানার চোখ থেকে চোখ সরাল না। হাসল কৃতার্থের হাসি। 'ঘুষ দেয়ার জন্যে তো তৈরি হয়েই আছি, রানা! সেই কখন থেকে! সাত কোর্সের ডিনার অর্ডার দিয়েছি... আনতে বলি?'

'এক্ষুণি না। নোংরা লাগছে। আগে গোসল করব, তারপর।'

'বেশ, চলো।'

'মানে?'

'আমিও তো করব।'

ওর ঠোঁটে রহস্যময় আমন্ত্রণের হাসি। উঠে দাঁড়িয়ে চুমো খেল রানা ওর লাল ঠোঁটে।

***